কাসাসুল কুরআন-৪

হযরত মুসা ও হারুন আ.

মূল

মাওলানা হিফযুর রহমান সিওহারবি রহ.

কাসাসুল কুরআন-৪

হযরত মুসা ও হারুন আলাইহিমুস সালাম

রাসুল সিরিজ-৪

কাসাসুল কুরআন-৪

হযরত মুসা ও হারুন আলাইহিমুস সালাম

মূল

মাওলানা হিফযুর রহমান সিওহারবি রহ.

অনুবাদ

মাওলানা আবদুস সাত্তার আইনী

কাসাসুল কুরআন-৪
মাওলানা হিফযুর রহমান সিওহারবি রহ.

অনুবাদ
মাওলানা আবদুস সাত্তার আইনী

সম্পাদনা
মাকতাবাতুল ইসলাম সম্পাদনা বিভাগ

প্রকাশক
হাফেজ কুতুবুদ্দীন আহমাদ

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর, ২০১৫ খ্রি.

প্রচ্ছদ ॥ তকি হাসান

সার্বিক যোগাযোগ
মাকতাবাতুল ইসলাম
[সেরা মুদ্রণ ও প্রকাশনার অগ্রপথিক]

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
৬৬২ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা
ঢাকা-১২১২
০১৯১১৬২০৪৪৭
০১৯১১৪২৫৬১৫

বাংলাবাজার বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামি টাওয়ার (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯১২৩৯৫৩৫১
০১৯১১৪২৫৮৮৬

মূল্য : ২৪০ [দুইশত চল্লিশ] টাকা মাত্র

QASASUL QURAN [4]
Writer : Mawlana Hifjur Rahman RH
Translated by : Abdus Sattar Aini
Published by : Maktabatul Islam
Price : Tk. 240.00
ISBN : 978-984-90976-8-6
www.facebook/Maktabatul Islam
www.maktabatulislam.net

হযরত মুসা ও হারুন আলাইহিমুস সালাম

বনি ইসরাইল মিসরে

কুরআন মাজিদ হযরত ইউসুফ আ.-এর ঘটনায় বনি ইসরাইলের আলোচনা শুধু এতটুকু করেছে যে, হযরত ইয়াকুব আ. ও তাঁর পরিবার পরিজন হযরত ইউসুফ আ.-এর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য মিসরে এসেছেন। কিন্তু তার কয়েকশো বছর পর সংঘটিত হযরত মুসা আ.-এর ঘটনায় কুরআন মাজিদ পুনরায় বনি ইসরাইলের ঘটনাবলি বিস্তারিত বর্ণনা করছে। তা থেকে বুঝা যায়, বনি ইসরাইল হযরত ইউসুফ আ.-এর যুগে মিসরেই বসতি স্থাপন করেছিলো। অতীতের এই কয়েকশো বছরে তাদের ইতিহাস মিসরের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ছিলো। তাওরাতের নিম্নলিখিত বিবরণগুলো এই বক্তব্যেরই সমর্থন করছে :

"ফেরআউন ইউসুফ আ.-কে বললেন, তোমার পিতা ও ভাইয়েরা তোমার কাছে এসেছে। মিসরের ভূমি তোমার সামনে। তোমার পিতা ও ভাইদেরকে এই দেশের কোনো এক স্থানে, যা সবচেয়ে উত্তম হয়, বসতি স্থাপন করতে দাও। আরামদায়ক ভূমিতে তাদেরকে থাকতে দাও। আর যদি তুমি তাদের মধ্য থেকে কাউকেও যোগ্য মনে করো, তবে তাকে তোমার গবাদিপশুগুলোর তত্ত্বধায়ক নিযুক্ত করো।"[১]

"আর ইউসুফ তার পিতা ও ভাইদেরকে মিসরের এক উত্তম ভূখণ্ডে, যা ছিলো রা'আমসীস নামে পরিচিত, ফেরআউনের নির্দেশ অনুসারে বসতি স্থাপন করতে দিলেন এবং তাদেরকে ওই ভূমির মালিক বানিয়ে দিলেন। আর হযরত ইউসুফ আ. তাঁর পিতা ও ভাইদেরকে এবং পিতার গোটা খান্দানকে নিজের সন্তানদের মতো খাদ্য সরবরাহ করলেন এবং তাদের প্রতিপালন করলেন।"[২]

"আর ইসরাইল [ইয়াকুব আ.] মিসর দেশে আরামদায়ক অঞ্চলে বসবাস করেছেন। মিসরে তিনি প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন। সময়ে তা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিলো। তিনি মিসরে সত্তর বছর জীবিত ছিলেন। সুতরাং হযরত ইয়াকুব আ.-এর পূর্ণ বয়স হয়েছিলো ১৪৭ বছর।"[৩]

---

[১] তাওরাত : আবির্ভাব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৪৭, আয়াত ৫-৬।

[২] তাওরাত : আবির্ভাব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৪৭, আয়াত ১১-১২।

[৩] তাওরাত : আবির্ভাব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৪৭, আয়াত ২৭-২৮।

তাওরাতে এ-বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত ইউসুফ আ. তাঁর পিতা ও ভাইদের জন্য 'জাশান' ভূখণ্ডটি চাইলে ফেরআউন আনন্দের সঙ্গে তা তাঁকে দান করেছিলেন।[৪]

মিসরের মানচিত্রে এই এলাকাটি বিলবিসের উত্তর দিকে অবস্থিত। বর্তমান কালে এই অঞ্চলে অবস্থিত শহরের নাম ফালুসাহ (সিফতুল হান্নাহ)।

হযরত ইউসুফ আ.-এর ঘটনায় আমরা বলে এসেছি যে, হযরত ইউসুফ আ. তাঁর পরিবার-পরিজনের জন্য শহুরে বসতি থেকে দূরে এই স্থানটি মনোনীত করেছিলেন খুব সম্ভব এই উদ্দেশ্যে যে, এখানে বসবাস করে তাঁর বংশের গ্রামীণ আগের মতোই অটুট থাকবে। আর এ-কারণে মিসরের মূর্তিপূজকেরা তাদের সংশ্রবে যেতে পারবে না এবং তাদের শিরকি রীতিনীতি এবং মন্দ স্বভাবসমূহ বনি ইসরাইলের মধ্যে প্রবেশ করাতে পারবে না। কেননা, মিসরবাসীরা রাখাল, কৃষক এবং গ্রামীণ শ্রেণির লোকদেরকে নীচু স্তরের ও অচ্ছুৎ বলে মনে করতো । এবং তাদের সঙ্গে মেলামেশা করাটাকেও দূষণীয় ও নিন্দার্হ মনে করতো।

তাওরাতে এটাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত ইয়াকুব আ.-এর ইন্তেকালের সময় নিকটবর্তী হলে তিনি হযরত ইউসুফকে ডেকে ওসিয়ত করলেন, আমাকে যেনো মিসরের মাটিতে দাফন করা না হয়; বরং পূর্বপুরুষদের দেশে ফিলিস্তিনে যেনো দাফন করা হয়। হযরত ইউসুফ আ. পিতাকে এ-ব্যাপারে পূর্ণ আশ্বস্ত করলেন। ইয়াকুব আ.-এর ইন্তেকালের পর তাঁর পবিত্র দেহ মমি করে রাখলেন এবং ফিলিস্তিনে নিয়ে গিয়ে সমাহিত করলেন।

হযরত ইয়াকুব আ. তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে সমস্ত সন্তানকে একত্র করলেন এবং ইউসুফ আ.-এর সন্তান আফরাইম ও মুন্নাসিকেও ডাকলেন। তারপর প্রথমে সবার জন্য বরকতের দোয়া করলেন এবং ভালোবাসা ও স্নেহের সঙ্গে তাদেরকে পরিতুষ্ট করলেন। এরপর তিনি তাদেরকে উপদেশ দিলেন, "দেখো, আমার মৃত্যুর পরে তোমাদের ঈমান ও আকিদাকে কখনো খারাপ করো না। আর আল্লাহ তাআলার যে-পবিত্র সম্পর্ক আমি, আমার পিতা এবং আমার পিতামহ সর্বদা সুদৃঢ় ও

---

[৪] তাওরাত : আবির্ভাব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৪৭, আয়াত ৩০-৩১।

শক্তিশালী রেখেছি, শিরকি প্রথা ও কুসংস্কার এবং রীতিনীতির মিশ্রণে সেটাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ফেলো না।[৫]

কুরআন মাজিদেও হযরত ইয়াকুব আ.-এর এই পবিত্র ওসিয়ত নিম্নলিখিত অলৌকিক বাক্যে প্রকাশ করা হয়েছে—

أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (سورة البقرة)

'(হে মুহাম্মদ,) ইয়াকুবের কাছে যখন মৃত্যু এসেছিলো তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে? সে যখন পুত্রদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলো, "আমার পরে তোমরা কীসের ইবাদত করবে?" (অর্থাৎ তোমরা কোন্ ধর্ম অবলম্বন করবে?) তারা তখন বলেছিলো, "আমরা আপনার ইলাহ-এর এবং আপনার পিতৃপুরুষ ইবরাহিম, ইসমাইল ও ইসহাকের ইলাহ-এরই ইবাদত করবো। তিনি একমাত্র ইলাহ এবং আমরা তাঁর কাছে আত্মসমর্পণকারী।' [সুরা বাকারা : আয়াত ১৩৩]

তাওরাতে হযরত ইউসুফ আ.-এর ওফাতের অবস্থাবলির ওপরও আলোকপাত করা হয়েছে। তাঁর বয়স ও বংশ সম্পর্কেও নিম্নলিখিত আয়াতগুলোয় আলোচনা করা হয়েছে।

"আর ইউসুফ আ. ও তাঁর পিতার পরিবারের সমস্ত লোক মিসরে বসবাস করেছেন। হযরত ইউসুফ আ. একশো দশ বছর জীবিত ছিলেন। আর ইউসুফ আ. তাঁর পুত্র আফরাইমের সন্তানদেরকে দেখেছেন, যারা ছিলো তৃতীয় পুরুষ (প্রজন্ম)। আর তাঁর দ্বিতীয় পুত্র মুন্নাসির পুত্র মাকিরের পুত্রও (নাতির ছেলে পুতি) ইউসুফ আ.-এর কোলেপিঠে প্রতিপালিত হয়েছে। অর্থাৎ ইউসুফ আ. তাঁর প্রপৌত্রকেও দেখেছেন। ইউসুফ আ. তাঁর ভাইদেরকে বললেন, আমার মৃত্যু অতি নিকটে। আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তোমাদেরকে স্মরণ করবেন এবং তোমাদেরকে এই দেশ থেকে বের করে সেই দেশে নিয়ে যাবেন যার ব্যাপারে তিনি হযরত ইবরাহিম আ., হযরত ইসহাক আ. এবং হযরত ইয়াকুব আ.-কে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন।" আর ইউসুফ আ. বনি ইসরাইল থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ

---

[৫] তাওরাত : আবির্ভাব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৪৭, আয়াত ৩০, ৩৬।

করে বললেন, "আল্লাহ নিশ্চয় তোমাদেরকে স্মরণ করবেন। তোমরা আমার হাড়গুলোকে এখান থেকে নিয়ে যেয়ো।" এরপর হযরত ইউসুফ আ. একশো দশ বছরের বৃদ্ধ হয়ে ইন্তেকাল করলেন। বনি ইসরাইল মিসরে তাঁর মৃতদেহের মধ্যে সুগন্ধিদ্রব্য পূর্ণ করে তাকে একটি সিন্দুকের ভেতর রেখে দিলো।"[৬]

"মুসা আ. বনি ইসরাইলকে নিয়ে মিসর থেকে বের হয়ে যাওয়ার সময় ইউসুফ আ.-এর হাড়গুলোকে সঙ্গে নিয়ে নিলেন। কেননা, ইউসুফ আ. বনি ইসরাইলকে দৃঢ়তার সঙ্গে কসম কাটিয়ে বলেছিলেন, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তোমাদের খবর নেবেন। তোমরা আমার হাড়গুলোকে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যেয়ো।"[৭]

হযরত ইউসুফ আ.-এর ওসিয়ত অনুযায়ী তাঁর সন্তানেরা তাঁর পবিত্র দেহকেও মমি করলো এবং সিন্দুকে সংরক্ষিত করে রাখলো। হযরত মুসা আ.-এর যুগে বনি ইসরাইল মিসর থেকে প্রত্যাগমনের সময় হযরত ইউসুফ আ.-এর ওসিয়ত পালন করার জন্য তার দেহ যে-সিন্দুকে সংরক্ষিত ছিলো সেই সিন্দুকটিও নিয়ে গেলো এবং নবীদের দেশে নিয়ে দাফন করলো।—এই স্থানটি কোথায়? এ-ব্যাপারে জাবরুনবাসীরা বলে, তাঁকে জাবরুনে সমাহিত করা হয়েছে। তারা হারমে খলিলিতে মাকফিলার কাছে একটি সংরক্ষিত সিন্দুক সম্পর্কে এই দাবি করে যে, এই তাবুত (কফিন, শাবাধার) হযরত ইউসুফ আ.-এর। কিন্তু আবদুল ওয়াহ্হাব নাজ্জার মিসরি বলেন, এটা নিছক কল্পনা। তিনি বলেন, ফাযেল মুহাম্মদ নামির হাসান নাবলুসি এবং নাবলুসের বিখ্যাত আলেম ফাযেল আমিন বেগ আবদুল হাদি আমাকে বলেছেন যে, হযরত ইউসুফ আ.-এর মাজার মুবারক নাবলুসে রয়েছে এবং এটাই সঠিক তথ্য। কেননা, তাওরাত বলে, হযরত ইউসুফ আ.-এর তাবুত ফারাইম নামক স্থানেই সমাহিত করা হয়েছে। আর ফারাইম নামক ভূখণ্ড নাবলুসের একটি বিখ্যাত শহর। প্রাচীনকালে একে শাকিম বলা হতো।[৮]

---

[৬] তাওরাত : আবির্ভাব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৫, আয়াত ২২-২৬।
[৭] তাওরাত : আত্মপ্রকাশ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১৩, আয়াত ১৯।
[৮] কাসাসুল কুরআন, আল্লামা আবদুল ওয়াহ্হাব নাজ্জার মিসরি, পৃষ্ঠা ১৮৭।

যাইহোক। এসব বিবরণ থেকে এ-বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, বনি ইসরাইল হযরত ইউসুফ আ. ও হযরত মুসা আ.-এর মধ্যবর্তী সময়ে মিসরেই বসবাস করতো।

মুসা আলাইহিস সালাম-এর ফেরআউন

অতীত ইতিহাসের ঘটনাবলি থেকে জানা যায় যে, 'ফেরআউন' মিসরের বাদশাহগণের উপাধি, কোনো বিশেষ বাদশাহর নাম নয়। হযরত ইসা আ.-এর তিন হাজার বছর পূর্ব থেকে শুরু করে সিকান্দারের যুগ পর্যন্ত ফেরআউনের একত্রিশ বংশ মিসরের ওপর রাজত্ব করে এসেছে। সর্বশেষ বংশ পারস্যের রাজাধিরাজ বংশ। হযরত ইসা আ.-এর ৩৩২ বছর পূর্বে সেকান্দার কর্তৃক পারস্য বিজিত হয়। এই ফেরআউনদের মধ্যে হযরত ইউসুফ আ.-এর ফেরআউন হিকসুস আমালিকা বংশোদ্ভূত ছিলেন। যা মূলত আরব বংশগুলোরই একটি শাখা ছিলো। এখন প্রশ্ন হলো এই, হযরত মুসা আ.-এর যুগে ফেরআউন কে ছিলো? সে কোন্ বংশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলো?

সাধারণ আরব ইতিহাসবেত্তাগণ এবং কুরআন মাজিদের মুফাস্সিরগণ এই ফেরআউনকেও আমালিকা বংশোদ্ভূত বলে থাকেন। কেউ তার নাম ওলিদ বিন মুসআব বিন রাইয়ান বলেন আর কেউ বলেন মুসআব বিন রাইয়ান। তাঁদের মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানীদের অভিমত এই যে, তার নাম ছিলো 'রাইয়ান' অথবা 'রাইয়ানে আব্বা'। ইবনে কাসির বলেন, তাঁর উপনাম ছিলো 'আবু মুররাহ'।

প্রাচীনকালে ইতিহাসবেত্তাদের বিশ্লেষণমূলক বর্ণনার ওপর ভিত্তি করেই উপরিউক্ত উক্তিগুলো করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান কালে নতুন মিসরীয় তত্ত্বানুসন্ধানে এবং প্রাপ্ত শিলালিপির ভাষ্যের আলোক এ-সম্পর্কে ভিন্ন ধরনের অভিমত সামনে এসেছে। তা এই যে, মুসা আ.-এর যুগে ফেরআউন (বাদশাহ) ছিলো দ্বিতীয় রিমসিসের[১] পুত্র মিনফাতাহ। তার শাসনকাল খ্রিস্টপূর্ব ১২৯২ সাল থেকে শুরু করে খ্রিস্টপূর্ব ১২২৫ সালে শেষ হয়।

---

[১] বিকৃত উচ্চারণে (رعمسيس) 'রিমসিস'কে 'রামিসাস'ও বলা হয়।

এই গবেষণামূলক বর্ণনা সম্পর্কে আহমদ ইউসুফ আহমদ আফেন্দি একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি মিসরের দারুল আসারের একজন চিত্রশিল্পী ছিলেন এবং প্রত্নতত্ত্ব ও শিলালিপির অনুসন্ধান ও গবেষণায় একজন বড় মাপের পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর ওই প্রবন্ধের সারমর্ম আবদুল ওয়াহ্হাব নাজ্জার মিসরি তাঁর 'কাসাসুল আম্বিয়া' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন।

"তত্ত্বানুসন্ধানের প্রেক্ষিতে এ-কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, হযরত ইউসুফ আ. যখন মিসরে প্রবেশ করেন তখন এই ফেরআউনদের ষোড়শ বংশের যুগ ছিলো। সেই ফেরআউনের নাম ছিলো 'আবাবিউল আওয়াল'। আমি এর প্রমাণ সেই শিলালিপি থেকে উদ্ধার করেছি যা আযিযে মিসর ফুকি-ফারে' (ফুতিকার)-এর সমাধিস্থলে পাওয়া গেছে। আর সপ্তদশ বংশের কোনো কোনো প্রত্নতত্ত্ব থেকে এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, এই বংশের পূর্বে, কিন্তু নিকটতম কালেই মিসরে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়েছিলো। সুতরাং, এসব অনুসন্ধানের পর সহজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, হযরত ইউসুফ আ. 'আবাবিউল আওয়াল'-এর যুগে খ্রিস্টপূর্ব ১৬০০ অব্দে মিসরে প্রবেশ করেছিলেন। আযিযে মিসরের কাছে হযরত ইউসুফ আ.-এর অবস্থান এবং তারপর কারাগারে বন্দি জীবনযাপন—এই দুটি বিষয়ের ওপর অনুমান করে বলা যেতে পারে যে, বনি ইসরাইল হযরত ইউসুফ আ.-এর (প্রবেশের) প্রায় সাতাশ বছর পরে মিসরের ওই চিহ্নের মধ্য দিয়ে মিসরে প্রবেশ করেছিলো, যা কুরআন মাজিদে ও তাওরাতে উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা যদিও মিসরীয় ফেরআউনদের রাজত্ব ও রাজবংশগুলো সম্পর্কে ভালোভাবেই জানতে পারলাম এবং মিসরের প্রাচীন নিদর্শনগুলো ও প্রত্নতত্ত্ব আমাদেরকে এ-ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করেছে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত সেইসব ঘটনাবলির বিস্তারিত বিবরণ আমাদের হস্তগত হয় নি, যা ফেরআউন ও বনি ইসরাইলের মধ্যকার শত্রুতা, হযরত মুসা আ.-এর নবুওতপ্রাপ্তি, সমুদ্রে ফেরআউনের নিমজ্জন এবং বনি ইসরাইলের মুক্তিপ্রাপ্তি সম্পর্কে জানা আবশ্যক।

তাওরাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে-ফেরআউনের সঙ্গে বনি ইসরাইলের শত্রুতা ছিলো, সেই ফেরআউন বনি ইসরাইলকে ভীষণ দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে রেখেছিলো। সে বনি ইসরাইলদের দিয়ে দুটি শহর 'রা'আমসিস' ও 'ফাইসুম'-এর নির্মাণকাজও করিয়ে নিয়েছিলো।

তাদেরকে শ্রমিক নিযুক্ত করেছিলো। প্রাচীন খোদিত চিহ্নসমূহে সেই দুটি শহরের সন্ধান পাওয়া গেছে। একটি শহরের শিলালিপি থেকে জানা গেছে যে, শহরটির নাম 'বরতুম' বা 'ফাইসুম'; এর অর্থ খোদা তুমের ঘর। আর দ্বিতীয় শহরটির নাম 'বাররাআ'মসিস' এবং এর অর্থ রাআ'মসিস প্রাসাদ।

আর পূর্বদিকে এখন যে-স্থানটি 'তিল-মাসখুতা' নামে প্রসিদ্ধ, এখানে ফাইসুম শহরটির অবস্থান ছিলো। আর এখন যে-জায়গায় 'কিনতির', প্রাচীন মিসরীয় ভাষায় 'খানাত-নাফার' অবস্থিত, এ-জায়গাতেই 'রাআ'মসিস' শহরটি বিদ্যমান ছিলো। এই শহরকে দ্বিতীয় 'রাআ'মসিস' এই উদ্দেশে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যাতে তা মিসরের সামুদ্রিক তীরবর্তী প্রান্তের কেন্দ্রস্থলে উত্তম দুর্গ হিসেবে সক্রিয় থাকে। আর ফাইসুম শহরের নির্মাণের উদ্দেশ্যও ছিলো এটিই। এই শহরের চারদিকে প্রাচীরের যে-ভগ্নাবশেষ দেখা যায় এই সাক্ষ্য বহন করছে যে, এই শহর দুটি মিসরের শ্রেষ্ঠ সুরক্ষিত দুর্গ ছিলো; তাওরাতের বর্ণনা অনুযায়ী শস্যের গুদাম ছিলো না।

এসব আলোচনার লক্ষ্যবস্তু হলো এই, যে-ফেরআউন বনি ইসরাইলকে দুঃখ-দুর্দশা ও বিপদ-আপদে নিমজ্জিত রেখেছিলো সে এই দ্বিতীয় রিমসিসই হতে পারে। এটা মিসরের শাসকদের উনবিংশ বংশ ছিলো। হযরত মুসা আ. দ্বিতীয় রিমসিরের যুগেই জন্মগ্রহণ করেন এবং তারই কোলে প্রতিপালিত হন। প্রাচীনকালের শিলালিপিসমূহ থেকে সন্ধান পাওয়া যায় যে, 'আসয়ুইয়াহ' গোত্রগুলো—যারা মিসরের নিকটবর্তী অঞ্চলে বসবাস করতো, তাদের মধ্যে এবং ফেরআউনদের এই বংশের মধ্যে একাধারে নয় বছর ভীষণ যুদ্ধ-বিগ্রহ অব্যাহত ছিলো। সুতরাং এটা অনুমান করা যায় যে, দ্বিতীয় রিমসিস আশঙ্কা করেছিলো, পাছে বনি ইসরাইলের এই বিশাল গোত্র, যাতে লাখ লাখ লোকের সমাগম ছিলো, অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত না হয়ে পড়ে। কাজেই সে বনি ইসরাইলকে ওইসব বিপদ-আপদ ও দুঃখ-দুর্দশায় নিমজ্জিত রাখা জরুরি মনে করেছিলো। কুরআনুল ও তাওরাতে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় বিমসিস একসময় খুব বয়োবৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলো। কাজেই সে নিজেই তার জীবদ্দশায় জ্যেষ্ঠ পুত্র 'মিনফাতাহ'কে রাজকার্যের অংশীদার বানিয়ে নিয়েছিলো। রিমসিসের দেড়শো সন্তানের মধ্যে মিনফাতাহ

ছিলো ত্রয়োদশ সন্তান। সুতরাং মিনফাতাহই সেই ফেরআউন যাকে হযরত মুসা আ. ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেছিলেন এবং বনি ইসরাইলকে মুক্ত করে দেয়ার দাবি জানিয়েছিলেন। এবং এরই শাসনামলে বনি ইসরাইল মিসর থেকে বের হয়েছিলো। আর ফেরআউন মিনফাতাহই সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়েছিলো। সে হযরত মুসা আ.-কে তার ঘরে প্রতিপালিত হতে দেখেছিলো। তাই মুসা আ. যখন তাকে ইসলামের দাওয়াত শুনালেন তখন সে কুরআন মাজিদের নিম্নবর্ণিত ভাষার অনুরূপ তিরস্কার করে বলেছিলো—

أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ (سورة الشعراء)

"আমরা কি তোমাকে শৈশবে আমাদের মধ্যে লালন-পালন করি নি? আর তুমি তো জীবনের বহু বছর আমাদের মধ্যে কাটিয়েছো।" [সুরা শুআরা : আয়াত ১৮]

তাওরাতে বর্ণিত আছে, বনি ইসরাইল মিসর থেকে বের হয়ে আসার পূর্বে ফেরআউনের মৃত্যু হয়েছিলো। এর উদ্দেশ্যেও সেই দ্বিতীয় রিমসিসই যে ছিলো মিনফাতাহর পিতা।

প্রত্নতত্ত্ববিদ ফিলানড্রস একটি শিলালিপির পাঠোদ্ধার করেছেন যাতে কালো অক্ষর খোদাই করে লেখা হয়েছে। এই শিলালিপিটি লিখিত হয়েছে ৫৯৯ মিসরি সনে। শিলালিপিটি মূলত খুব বড় একটি প্রস্তর। এটির উচ্চতা ৩.১৪ মিটার[১০]। এই লিপিটি দুটি উদ্দেশে লেখা হয়েছিলো : ১. অষ্টাদশ বংশের বাদশাহ আমানতাহাব আমুন মন্দিরের সেবায় যা-কিছু করেছিলেন তার সব বিবরণ এই লিপিতে বর্ণিত হবে। ২. উনবিংশ বংশের বাদশাহ মিনফাতাহ বিন দ্বিতীয় রিমসিসের প্রশংসায় কিছু লিখিত হবে। এ-কারণে এই শিলালিপির বাক্যগুলো কবিতার রীতি অনুযায়ী লিখিত হয়েছে। মিনফাতাহ ইউসিনের ওপর যে-বিজয় লাভ করেছিলো, গর্ব ও আড়ম্বরের সঙ্গে সেই বিজয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ফিলিস্তিনি এলাকার বিখ্যাত শহর 'আসকালান', 'জাইরায', 'বানুইম'-এর পতনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ-প্রসঙ্গে বনি ইসরাইল সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত বাক্যে কিছু মন্তব্য করা হয়েছে। এটাই প্রথম প্রাচীন খোদিত

---

[১০] ৩ মিটার ও ১৪ সেন্টিমিটার। ১ মিটার = ৩.২৮ ফুট।

চিহ্ন বা শিলালিপি, যাতে স্পষ্টভাবে বনি ইসরাইলের উল্লেখ বিদ্যমান রয়েছে। তার অনুবাদ এই—

لقد سحق بنی اسرائیل و لم یبق لهم بذر

'বনি ইসরাইলের সবাই ধ্বংস হয়ে গেছে এবং এখন তাদের বংশের সমাপ্তি ঘটেছে।'

একজন সূক্ষ্মদর্শী এই বাক্যটুকু দেখে সহজেই এই জ্ঞান লাভ করতে পারে যে, এই লিপিটি মিনাফাতাহর সময়ে লিখিত হয় নি। অন্যথায় মিসরীয় প্রথা অনুসারে বনি ইসরাইলের মতো বিরাট মর্যাদাশীল গোত্রের ধ্বংসকাহিনি এমন সাদামাঠাভাবে সংক্ষিপ্ত বাক্যে লিপিবদ্ধ হতো না; বরং মিনফাতাহর উদ্দেশে বিরাট জাঁকজমকপূর্ণ কবিতার সঙ্গে বনি ইসরাইলের মতো বিরাট শত্রুদলের ওপর বিজয় লাভের ঘটনাটি জোরেশোরেই প্রকাশ করা হতো। আর এই শিলালিপিতে যেসব ঘটনাবলির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, সেগুলোর গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের দাবি তো এটাই ছিলো যে, বনি ইসরাইলের ধ্বংসের কাহিনি এমনি এমনি প্রাসঙ্গিকরূপে এবং সেটাও পূর্ববর্তী বাদশাহর অবস্থাবলি সম্পর্কিত শিলালিপিতে যেনো অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া না হয়; বরং সেসব উম্মতের (বনি ইসরাইলের) ঘটনাবলির জন্য মিনফাতাহর যুগে স্বতন্ত্র ভিন্ন একটি শিলালিপি শুধু এই উদ্দেশ্যেই লিপিবদ্ধ করা হয়।

কিন্তু এরূপ কেনো করা হলো না? (কেনো মিনফাতাহর যুগে বনি ইসরাইলের ঘটনাবলির জন্য স্বতন্ত্র শিলালিপি লিখিত হলো না?) এর উত্তর অতি সুস্পষ্ট। মিসরীয় জ্যোতিষিগণ এমন ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার সম্ভাবনা দেখে নি যা হযরত মুসা আ.-এর ঘটনায় ফেরআউনের নিমজ্জন আকারে প্রকাশ পেলো। তারা এত শিগগির মিনফাতাহর মৃত্যু আশা করে নি। সেকালের স্বাভাবিক বয়স বা আয়ুর প্রতি লক্ষ করলে তখনো যথেষ্ট সময় হাতে ছিলো, যে-সময়ে মিনফাতাহর জ্যোতিষীরা মিসরীয় প্রথা অনুসারে সেই উনবিংশ বংশের বাদশাহর সমুদয় অবস্থাকে সন্নিবেশ করে শিলালিপি ও ফলকে সুরক্ষিত করে রাখতে পারতো এবং সেগুলোকে বাদশাহর সমাধিতে খোদাই করে লাগিয়ে দেয়া হতো। কিন্তু যখন এই ভয়াবহ ঘটনা ঘটে গেলো তখন আসল সত্যকে গোপন করে রাখার চেষ্টা করা হলো। ভবিষ্যতের কিবতি বংশের লোকেরা যেনো এই লাঞ্ছনা ও দুর্নামের কথা জানতে না পারে, যা তাদের অবশ্য শ্রদ্ধেয় ধর্মীয়

আকিদার প্রতি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কঠিন শাস্তির কারণ হয়েছিলো। সুতরাং তারা অন্যায়ভাবে দুঃসাহসের সঙ্গে এবং ইতিহাসের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে অবস্থার পরিবর্তন করে ব্যাপারটিকে সম্পূর্ণ বিপরীত আকারে লিখে দিয়েছে। এবং বনি ইসরাইলের সফলতার সঙ্গে জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তনের ঘটনাকে উপরিউক্ত শব্দগুলো দ্বারা প্রকাশ করেছে। যেনো ফেরআউনের সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়ার ঘটনাটি ভবিষ্যতে মিসরবাসীদের সামনে না থাকে।

এই সিদ্ধান্তের সমর্থন এ থেকেও পাওয়া যায় যে, তৎকালীন মিসরীয় প্রথা অনুসারে প্রত্যেক বাদশাহর সমাধিস্থল পৃথক পৃথক হতো। বাদশাহর যাবতীয় অবস্থা, বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যসূচক ঘটনার তারিখ, বাদশাহর যুগের কতক রাজকীয় সামগ্রী এবং হিরা-জহরত তার সমাধির সঙ্গেই সুরক্ষিত করে রাখা হতো।

কিন্তু মিনফাতাহর এত শান-শওকত ও প্রতাপ-প্রতিপত্তি থাকা সত্ত্বেও—যেগুলোর প্রতি উল্লিখিত শিলালিপিতে ইঙ্গিত করা হয়েছে—তার জন্য পৃথক কোনো সমাধিস্থলও নির্মিত হয় নি এবং প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত সেসব প্রথা ও সংস্কারও পালন করা হয় নি যেগুলোকে বাদশাহদের জন্য অত্যন্ত জরুরি মনে করা হতো। মিনফাতাহকে বরং অতি শিগগিরই 'আমনতাহাব'-এর সমাধিস্থলেই সমাহিত করা হয়েছিলো। আর অষ্টাদশ ও উনবিংশ বংশের বাদশাহদের মৃতদেহগুলো একই স্থানে একত্র করে দেয়া হয়েছিলো।"[১১]

মিসরের জাদুঘরে ফেরআউন মিনফাতাহ মৃতদেহ আজো সংরক্ষিত আছে। যা কুরআন মাজিদের এই বাণীর সত্যায়ন করছে—

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ (سورة يونس)

'আজ আমি তোমার দেহটি রক্ষা করবো যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন[১২] হয়ে থাকো। অবশ্যই মানুষের মধ্যে অনেকে আমার নিদর্শন সম্পর্কে গাফেল।' [সুরা ইউনুস : আয়াত ৯২]

---

[১১] কাসাসুল কুরআন, আল্লামা আবদুল ওয়াহ্হাব নাজ্জার মিসরি, পৃষ্ঠা ২৩৯-২৪১।

[১২] ফেরআউনের দেহ থিবিসের একটি পিরামিড থেকে উদ্ধার করা হয়। বর্তমানে তা সবার দেখার জন্য কায়রোর জাতীয় জাদুঘরে রক্ষিত আছে।

আর মুহাম্মদ আহমদ আদাবি তাঁর دعوة الرسول إلى الله গ্রন্থে লিখেছেন, এই লাশের নাকের সামনের অংশ নেই। মনে হয় কোনো সামুদ্রিক প্রাণী তা খেয়ে ফেলেছে। সম্ভবত মাছই তা খেয়ে থাকবে। এরপর তার মৃতদেহ আল্লাহর নির্ধারিত ব্যবস্থা অনুযায়ীই তীরে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

উপরিউক্তর উদ্ধৃতিগুলোর জন্য কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। অবশ্য এগুলো ইউরোপের অন্ধ অনুসারী লোকদের জন্য শত শত উপদেশ গ্রহণের মূলধন যার অতিদ্রুত প্রাচ্যবিদদের (প্রচ্যের তত্ত্বাগ্রহী ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের) প্রত্যেকটি তত্ত্ব-বিশ্লেষণকে দ্বিধাহীনভাবে 'আমরা তা মেনে নিয়েছি এবং বিশ্বাস করেছি' বলে দিতে অভ্যস্ত। এরা কুরআন মাজিদ ও আল্লাহর নবীর বিধি-বিধানের ওপর সন্দেহ পোষণ করতে পারে এবং সন্দেহ পোষণ করে থাকেও; কিন্তু এরা ইউরোপীয় ঐতিহাসিক ও প্রাচ্যবিদদের জ্ঞানগত অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণকে আল্লাহর ওহির চেয়েও অধিক মর্যাদা দিয়ে থাকে। এরা নিজেদের উলামায়ে ইসলাম ও ইসলামি চিন্তাবিদগণের অনুসরণকে হারাম মনে করে, অথচ এরা ইউরোপীয় মনীষীবৃন্দের লেখাকে আল্লাহর লেখা বলে বিশ্বাস করে।
ইউরোপের আধুনিক ইতিহাসবিদগণ এই দাবি করেছেন যে, হযরত ইউসুফ ও হযরত মুসা আলাইহিমুস সালাম এবং মিসরের ফেরআউনদের মধ্যকার যেসব ঘটনাবলি কুরআন মাজিদ ও তাওরাতের মাধ্যমে জানা যায়, সেগুলো ঐতিহাসিক মানদণ্ডে ভুল ও ভিত্তিহীন। তা এইজন্য যে, মিসরের প্রাচীনকালের খোদাইকৃত নিদর্শনসমূহ ও শিলালিপিসমূহে ওইসব গুরুত্বপূর্ণ ও বিরাট বিরাট ঘটনাবলির প্রতি কোনো ইঙ্গিত পর্যন্ত পাওয়া যায় না। অথচ এটা সর্বজন-স্বীকৃত যে, মিসরবাসীরা তাদের ইতিহাস সংগ্রহকরণে অত্যন্ত সুচতুর ও তৎপর এবং তারা এ-ব্যাপারে দুনিয়ার সব জাতির চেয়ে অধিক অগ্রগামী। তাদের এই কর্মপদ্ধতির কল্যাণে আজ খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার বছরের অবস্থাসমূহের সঠিক ইতিহাস সন্নিবেশ করা সম্ভব হয়েছে।
ইউরোপীয় ইতিহাসবিদগণের দাবির অন্ধ অনুকরণে ভারতবর্ষের কোনো কোনো ইউরোপজাত মুসলমানও ওইসব ঘটনার সত্যতা অস্বীকার করে বসেছে। তারা আল্লাহর ওহি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আনুমানিক

ধারণাকে বিশ্বাসযোগ্য ও ইলহামি লিপির মর্যাদা দিয়েছে—ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

কিন্তু আজ মিসরীয় খোদাই-করা ফলক ও শিলালিপিসমূহে স্পষ্টরূপে সেকালের ফেরআউন ও বনি ইসরাইলের পারস্পরিক শত্রুতার অবস্থা সামনে এসে পড়েছে এবং উপরিউক্ত পর্যায়ক্রমিক ঘটনাবলি আপনা-আপনি সেসব তথ্যকে সামনে নিয়ে এসেছে যা কুরআন মাজিদে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব, জানি না এখন কুরআন মাজিদের ঘটনাবলির তাৎক্ষণিত অস্বীকারকারী জ্ঞানের দাবিদারদের জ্ঞানের বহর কেমন অবস্থা পরিগ্রহ করবে—নিজেদের মূর্খতা ও অন্ধ অনুসরণের গোমর ফাঁক হওয়ার আশঙ্কায় অস্বীকারের ওপর হঠকারিত না-কি প্রকৃত সত্যকে স্বীকার করে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বর্ণিত বিশ্বাসের পথের (আল্লাহর ওহির) অনুসরণ না করার জন্য আফসোস ও অনুতাপ প্রকাশ।

যাইহোক। তারা তাদের কর্মকাণ্ড যেটাই করুক, এটা অনস্বীকার্য সত্য যে, আল্লাহর ওহি অর্থাৎ কুরআন মাজিদের মাধ্যমে যে-পথ লব্ধ হয়েছে, তাকে তার নিজের স্থান থেকে একঅণু পরিমাণও সরে যাওয়ার প্রয়োজন হবে না। এবং অনুসন্ধান ও অনুমানের ভিত্তিতে লব্ধ জ্ঞান তখন পর্যন্ত অহরহ অস্থির ঘূর্ণনের মধ্যেই থাকবে, যে পর্যন্ত না তা কুরআনের মাধ্যমে সাব্যস্ত সত্যের ওপর এসে স্থির হয়।

ফেরআউনের স্বপ্ন

তাওরাতে বর্ণিত আছে এবং ইতিহাসবেত্তাগণ বলেন, বনি ইসরাইলের সঙ্গে ফেরআউনের এই কারণে শত্রুতা হয়েছিলো যে, তৎকালে জ্যোতিষী ও গণকেরা ফেরআউনকে বলেছিলো, একটি ইসরাইলি বালকের দ্বারা আপনার রাজত্বের বিনাশ ঘটবে। কোনো কোনো ঐতিহাসিক বর্ণনায় আছে যে, ফেরআউন একটি ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখেছিলো। দরবারে জ্যোতিষী ও গণকেরা তার স্বপ্নের ব্যাখ্যা তেমনই দিয়েছিলো যা এইমাত্র উপরে বলা হয়েছে। কুরআন মাজিদের মুফাস্সিরগণও এই ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলোকে তাফসিরের কিতাবসমূহে উদ্ধৃত করেছেন। তাওরাতে আরও কিছু অতিরিক্ত কথা বর্ণিত আছে। তাতে বলা হয়েছে যে, জ্যোতিষী ও গণকেরা স্বপ্নফল বর্ণনা করার পর

ফেরআউন ধাত্রী নিযুক্ত করে দিয়েছিলো এবং তাদেরকে এই দায়িত্ব দিয়েছিলো যে, মিসর রাজ্যের অধীন যেখানেই কোনো ইসরাইলির ঘরে পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করবে তৎক্ষণাৎ তাকে যেনো হত্যা করে ফেলা হয়। কিন্তু ধাত্রীদের হৃদয়ে এমন সহানুভূতি ও সমবেদনা উৎসারিত হলো যে তারা এই ঘৃণ্য কাজের প্রতি কোনো পদক্ষেপই করলো না। ফেরআউন ধাত্রীদের কাছে কৈফিয়ত তলব করলে তারা বললো, ইসরাইলি নারীরা মিসরীয় নারীদের মতো কোমলদেহ নয়। তারা ধাত্রীদের মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজেরাই সন্তান প্রসব করে নেয়। আমার খবরই পাই না। এ-কথা শুনে ফেরআউন একদল লোক নিযুক্ত করে, যেনো তারা অনুসন্ধান করে সঙ্গে সঙ্গে ইসরাইলি শিশু বালকদেরকে হত্যা করে ফেলে এবং বালিকাদেরকে ছেড়ে দেয়।

কুরআন মাজিদে হযরত মুসা ও হারুন আ.-এর আলোচনা

কুরআন মাজিদের বহু জায়গায় হযরত মুসা আ.-এর আলোচনা করা হয়েছে। কেননা, তাঁর অধিকাংশ অবস্থা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র অবস্থাবলির সঙ্গে অত্যন্ত সাদৃশ্য রাখে। আর এসব ঘটনাবলির মধ্যে স্বাধীনতা ও দাসত্বের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব এবং সত্য ও মিথ্যার প্রতিযোগিতার অনুপম কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। তা ছাগা এসব ঘটনাবলির মধ্যে জ্ঞান ও উপদেশমালার দুর্লভ ভাণ্ডার সঞ্চিত রয়েছে। এই কারণে কুরআন মাজিদ প্রয়োজন অনুসারে এবং স্থান ও পাত্র অনুযায়ী জায়গায় জায়গায় মুসা আ.-এর ঘটনার বিভিন্ন অংশকে সংক্ষিপ্ত আকারে ও বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করেছে।

নিম্নবর্ণিত নকশার মাধ্যমে সংখ্যা গণনার সঙ্গে সঙ্গে এই ঘটনার গুরুত্বের যথার্থ অনুমান করা যাবে এবং সেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নবীর মাহাত্ম্যও অনুধাবন করা যাবে।

এই নকশাটির দুটির অংশ। প্রথম নকশা থেকে প্রকাশ পাচ্ছে যে, হযরত মুসা ও হযরত হারুন আলাইহিমুস সালাম অথবা বনি ইসরাইল ও ফেরআউনের ঘটনা কোন্ কোন্ সুরায় ও কী সংখ্যক আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় অংশ প্রকাশ করছে যে, কুরআন মাজিদে হযরত মুসা আ. ও হযরত হারুন আ.-এর মুবারক নাম কত জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাদের মোট সংখ্যা কত।

প্রথম নকশা

সুরার নাম	আয়াত-সংখ্যক
সুরা আল-বাকারা	৪৭-৬১, ৬৩-৭৫, ৮৪-৮৭, ৯২, ৯৩, ১০৮, ১৩৬, ২৪৩, ২৫১
সুরা আন-নিসা	১৫৩-১৫৬, ১৬৪
সুরা মায়িদা	১২, ১৩, ২০-২৫, ৩২, ৪৫, ৭০, ৭১, ৭৮, ৭৯
সুরা আল-আন'আম	৮৪-৯০, ১৪৬, ১৫৪, ১৫৯
সুরা আল-আ'রাফ	১০৩-১৫৭, ১৫৯-১৭১
সুরা আল-আনফাল	৫৪
সুরা ইউনুস	৭৪-৯৩
সুরা হুদ	৯৬-৯৯, ১১০
সুরা ইবরাহিম	৫, ৬, ৮
সুরা আন-নাহল	১২৪
সুরা বনি ইসরাইল	২-৭, ১০১-১০৪
সুরা আল-কাহফ	৬০-৮২
সুরা মারইয়াম	৫১-৫৩
সুরা তোয়া-হা	৯০-৯৮
সুরা আল-আম্বিয়া	৪৮, ৪৯
সুরা আল-মুমিনুন	৪৫-৪৯
সুরা আল-ফুরকান	৩৫, ৩৬
সুরা শুআরা	১০-৬৬
সুরা নামল	৭-১৪
সুরা কাসাস	৩-৪৮
সুরা আনকাবুত	৩৯, ৪০
সুরা আস-সাজদা	২৩, ২৪
সুরা আল-আহযাব	৬৯
সুরা আস-সাফ্ফাত	১১৪-১২২
সুরা মুমিন	২৩-৪৫
সুরা আয-যুখরুফ	৩৬-৫৬

৪৪	সুরা দুখান	১৭-৩৩
৪৫	সুরা জাসিয়া	১৬, ১৭
৫১	সুরা যারিয়াত	৩৮-৪০
৫৪	সুরা কামার	৪১-৫৫
৬১	সুরা সাফফ	৫
৬২	সুরা জুমআ	৫, ৬
৬৬	সুরা আত-তাহরিম	১১
৬৯	সুরা আল-হাক্কাহ	৯, ১০
৭৩	সুরা মুয্যাম্মিল	১৫, ১৬
৭৯	সুরা নাযিআত	১৫-২৫
৮৯	সুরা ফাজর	১০-১৩

দ্বিতীয় নকশা

		মুসা আ.-এর নাম	হারুন আ.-এর নাম
সুরা	সুরার নাম	আয়াত	আয়াত
২	সুরা আল-বাকারা	১২	১
৪	সুরা আন-নিসা	২	১
৫	সুরা মায়িদা	২	০
৬	সুরা আল-আন‘আম	২	১
৭	সুরা আল-আ'রাফ	১৬	১
১০	সুরা ইউনুস	৮	১
১১	সুরা হুদ	২	০
১৪	সুরা ইবরাহিম	৩	০
১৭	সুরা বনি ইসরাইল	৩	০
১৮	সুরা আল-কাহফ	২	০
১৯	সুরা মারইয়াম	১	০
২০	সুরা তোয়া-হা	১৪	৩
২১	সুরা আল-আম্বিয়া	১	১
২৩	সুরা আল-মুমিনুন	২	১

২৫	সুরা আল-ফুরকান	১	১
২৬	সুরা শুআরা	৮	২
২৭	সুরা নামল	২	০
২৮	সুরা কাসাস	১৪	১
৩২	সুরা আস-সাজদা	১	০
৩৩	সুরা আল-আহযাব	১	০
৩৭	সুরা আস-সাফ্ফাত	২	০
৪০	সুরা মুমিন	৪	০
৪৩	সুরা আয-যুখরুফ	১	০
৫১	সুরা যারিয়াত	১	০
৬১	সুরা সাফফ	১	০
৭৯	সুরা নাযিআত	১	০
		১০৭	১৪

বংশপরিচয় ও জন্ম

হযরত মুসা আ.-এর বংশপরম্পরা কয়েক পুরুষের মাধ্যমে হযরত ইয়াকুব আ. পর্যন্ত পৌঁছে। মুসা আ.-এর পিতার নাম ছিলো ইমরান এবং মাতার ইউকাবাদ। পিতার বংশপরম্পররা এরূপ—ইমরান বিন কামাত বিন লাওয়া বিন ইয়াকুব আ.। হযরত হারুন আ. হযরত মুসা আ.-এর সহোদর ও বড়ভাই ছিলেন। ইমরানের ঘরে হযরত মুসা আ.-এর জন্ম এমন সময়ে হয়েছিলো যখন ফেরআউন বনি ইসরাইলের সদ্যপ্রসূত বালক শিশুদেরকে হত্যা করে ফেলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেছিলো। এ-কারণে মুসা আ.-এর মা ও পরিবারের লোকেরা তাঁর জন্মের পর অত্যন্ত বিচলিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলো যে কীভাবে এই শিশুটিকে হত্যাকারীদের দৃষ্টি থেকে রক্ষা করা যায়। এভাবে-সেভাবে-যেভাবেই হোক, তিন মাস পর্যন্ত তাঁকে সবার দৃষ্টি থেকে গোপনে রাখা হলো। তাঁর জন্মগ্রহণের সংবাদও কাউকে জানতে দেয়া হলো না। কিন্তু গুপ্তচরদের অনুসন্ধান এবং পরিস্থিতি গুরুতর হওয়ার কারণে বেশিদিন এই ঘটনা গোপনীয় রাখার ভরসা পাওয়া গেলো না। ফলে তাঁর মায়ের উদ্বেগ ও অস্থিরতা বৃদ্ধি পেতে থাকলো। এই কঠিন ও করুণ পরিস্থিতিতে অবশেষে আল্লাহ তাআলা সাহায্য করলেন এবং মুসা আ.-

এর মায়ের অন্তরে এমন কৌশলের উদ্ভব ঘটিয়ে দিলেন যে, একটি সিন্দুক নির্মাণ করো । সিন্দুকে আলকাতরা ও তেলের পালিশ লাগাও। পানি যেনো ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে। শিশুটিকে সিন্দুকে ভরো এবং তারপর তা নীলনদের স্রোতে ভাসিয়ে দাও।

মুসা আ.-এর মাই তা-ই করলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর বড় কন্যা ও মুসা আ.-এর সহোদরা বোনকে নির্দেশ দিলেন, তিনি যেনো সিন্দুকটির ভেসে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নদের তীরের ওপর দিয়ে হেঁটে যান এবং সিন্দুকটির প্রতি দৃষ্টি রাখেন। তিনি যেনো লক্ষ করেন, কীভাবে আল্লাহ তাআলা মুসা আ.-কে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন। কেননা, মুসা আ.-এর মাকে আল্লাহপাক এই সুসংবাদ পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, আমি এই শিশুকে তোমারই কোলে ফিরিয়ে দেবো এবং এই শিশু কালের পরিক্রমায় নবী ও রাসুল হবে।

ফেরআউনের গৃহে প্রতিপালন

হযরত মুসা আ.-এর সহোদরা বোন নদের তীর ধরে ভাসমান সিন্দুকটির ওপর দৃষ্টি রেখে যাচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন, সিন্দুকটি ভেসে ভেসে রাজপ্রাসাদের কাছে এসে থামলো। ফেরআউনের পরবিারের একজন রমণী তাঁর চাকরদের দিয়ে নদ থেকে সিন্দুকটি উঠিয়ে নিলেন এবং রাজপ্রাসাদে নিয়ে গেলেন। হযরত মুসা আ.-এর বোন তা দেখে খুবই আনন্দিত হলেন। প্রকৃত অবস্থা ভালোভাবে জানার জন্য তিনি রাজমহলের চাকরানিদের সঙ্গে মিশে গেলেন।

কুরআন মাজিদ রাজবংশের এই স্ত্রীলোকটিকে ফেরআউনের স্ত্রী বলেছে। আর তাওরাতের 'আত্মপ্রকাশ' অধ্যায়ে বলা হয়েছে, এই নারী ছিলেন ফেরআউনের কন্যা। কিন্তু ইতিহাসবেত্তাগণ এই মতানৈক্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন নি। তাঁরা বলেন, সম্ভবত পানিতে ভাসমান সিন্দুকটিকে ফেরআউনের কন্যাই উঠিয়ে নিয়েছিলো। তারপর সিন্দুকের শিশুটিকে পুত্র বানিয়ে নেয়ার আকাঙ্ক্ষা, শিশুটিকে হত্যা না করে নিজেরাই লালন-পালন করার আগ্রহ প্রকাশ এবং ফেরআউনের কাছে সুপারিশ করেছিলেন ফেরআউনের স্ত্রী আসিয়া।

কুরআন মাজিদের বর্ণনাপদ্ধতি থেকেও এ-কথাই প্রকাশ পায়। কারণ, হযরত মুসা আ.-কে নদীর বুক থেকে উখোলনকারী প্রসঙ্গে কুরআন মাজিদ বলেছে—

فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ

'তখন ফিরআউনের (পরিবারের) লোকজন তাকে (শিশু মুসাকে) উঠিয়ে নিলো।' [সুরা কাসাস : আয়াত ৮]

আর পুত্ররূপে গ্রহণ করার আকাঙ্ক্ষা এবং হত্যা না করে প্রতিপালন করার জন্য সুপারিশকারী সম্পর্কে কুরআন বলছে—

وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (سورة القصص)

'ফেরআউনের স্ত্রী বললো, "এই শিশু আমার ও তোমার নয়ন-প্রীতিকর। একে হত্যা করো না, সে আমাদের উপকারে আসতে পারে, আমরা তাকে সন্তান হিসেবেও গ্রহণ করতে পারি।"' [সুরা কাসাস : আয়াত ৯]

'ফেরআউনের স্ত্রী বললো'-এর হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রহ. থেকে এমন বক্তব্যই বর্ণিত হয়েছে।[১৩]

যাইহোক। ফেরআউনের লোকেরা সিন্দুকটি খুলে দেখতে পেলো, একটি সুন্দর ও স্বাস্থ্যবান শিশু সিন্দুকটির ভেতরে আরামে শুয়ে আছে এবং বুড়ো আঙ্গুল চুষছে। ফেরআউনের কন্যা তৎক্ষণাৎ তাকে রাজমহলে নিয়ে গেলো। ফেরআউনের স্ত্রী শিশুটিকে দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। অত্যন্ত মায়া-মমতার সঙ্গে শিশুটিকে আদর করলেন। রাজমহলের অভ্যন্তরীণ চাকরদের মধ্যে কেউ বলে উঠলো, 'এই শিশুটিকে তো বনি ইসরাইলের বলে মনে হচ্ছে । এ তো আমাদের বংশের শত্রু। এতে হত্যা করে ফেলা জরুরি। পাছে এমন না, এই শিশুই আমাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা হয়ে দাঁড়ায়।' এ-ধরনের কথা শুনে ফেরআউনের এমনটাই ইচ্ছে হলো। ফেরআউনের স্ত্রী ফেরআউনের হাবভাব দেখে বলতে লাগলেন, এমন সুন্দর ও আদরণীয় শিশুটিকে হত্যা করো না। বিচিত্র কি যে, এই শিশু তোমার ও আমার চোখের

---

[১৩] রুহুল মাআনি ফি তাফসিরিল কুরআনিল আযিম ওয়াস সাবয়িল মাসানি, আবুস সানা শিহাবুদ্দিন মাহমুদ আল-আলুসি, বিংশ খণ্ড, সুরা কাসাস।

প্রীতিদায় হবে। অথবা আমরা তাকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করে নেবো এবং তার জীবন ও অস্তিত্ব আমাদের জন্য কল্যাণকর প্রমাণিত হবে। অর্থাৎ এই শিশু যদি সেই ইসরাইলি শিশুই সাব্যস্ত হয়, যে হবে তোমার স্বপ্নের ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য, তবে আমাদের ভালোবাসা ও প্রতিপালনের কোল হয়তো তাকে ক্ষতিকর হওয়ার পরিবর্তে কল্যাণকর করে দেবে।

কিন্তু ফেরআউন ও তার বংশের লোকেরা কি জানতো যে, আল্লাহপাকের অদৃষ্টলিপি তাদের প্রতি হাসাহাসি করছে। রাব্বুল আলামিনের অপার মহিমা লক্ষ করুন, ফেরআউনকে সম্পূর্ণ ও অজ্ঞ ও অনবহিত রেখে তাকে তার শত্রুর রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে দিলেন।

মোটকথা, তখন এই প্রয়োজন দেখা দিলো যে, শিশুটির জন্য দুগ্ধ দানকারিণী ধাত্রী নিযুক্ত করা হোক। কিন্তু আল্লাহ তাআলা মুসা আ.-এর মায়ের সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করার জন্য শিশুর স্বভাব এমন করে দিলেন যে, সে কোনো রমণীর স্তনে মুখই লাগায় না। রাজমহলের ধাত্রী চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে বসে গেলো; কিন্তু মুসা আ. কোনো স্তন থেকেই দুধ পান করলেন না। মুসা আ.-এর বোন মারইয়াম সব অবস্থা দেখছিলেন। তিনি বললেন, অনুমতি পেলে আমি একজন ধাত্রীর সন্ধান দিতে পারি। তিনি অত্যন্ত সৎ স্বভাবশালিনী এবং এই কাজের জন্য খুবই উপযোগী। নির্দেশ পেলে বরং এখনই তাঁকে আমি আমার সঙ্গে করে নিয়ে আসতে পারি। ফেরআউনের স্ত্রী ধাত্রীকে আনার জন্য নির্দেশ দিলেন। আর মুসা আ.-এর বোন মাকে নিয়ে আসার জন্য আনন্দচিত্তে বাড়ির দিকে চলে গেলেন।

হযরত শাহ আবদুল কাদির দেহলবি রহ. তাঁর তাফসিরগ্রন্থ 'মুযিহুল কুরআন'-এ লিখেছেন, ফেরআউনের স্ত্রী (আসিয়া) ছিলেন বনি ইসরাইল বংশোদ্ভূত এবং তিনি মুসা আ.-এর চাচাতো বোন ছিলেন। তিনি মুসা আ.-এর বোনের ধাত্রী আনার কথায় বুঝে ফেলেছিলেন যে, শিশুটি বনি ইসরাইলেরই সন্তান।[১৪]

---

[১৪] মুফাস্সিরগণ ফেরআউনের এই স্ত্রীর নাম আসিয়া বলেছেন। কুরআন মাজিদ ফেরআউনের স্ত্রীকে মুমিন সাব্যস্ত করেছে। তা সত্ত্বেও তাঁকে ইসরাইলি বংশোদ্ভূত ও মুসা আ.-এর চাচাতো বোন বলা একটি দুর্বল মত। বিশুদ্ধ মত এই যে, তিনি ফেরআউনের বংশেরই নারী ছিলেন। [তাফসিরে রুহুল মাআনি, বিংশ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১।]

এদিকে এ-ধরনের কথাবার্তা হচ্ছিলো আর ওদিকে মুসা আ.-এর মায়ের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিলো। একটি ইলহামি চিন্তা-ভাবনায় শিশুপুত্রকে তো নদীর বুকে ভাসিয়ে দিয়ে এলেন; কিন্তু এখন মাতৃস্নেহ ও মমতা বড়ই তীব্র হয়ে উঠলো। তিনি অস্থির হয়ে নিজের এই গুপ্তরহস্যকে প্রকাশ করে দিতে উদ্যত হলেন। এই অস্থিরতা ও অশান্ত অবস্থার মধ্যেই আল্লাহ তাআলা মুসা আ.-এর মায়ের প্রতি তাঁর দয়া ও করুণা বর্ষণ করলেন। তাঁর হৃদয়ে স্থিরতা ও প্রশান্তি নাযিল করলেন। এখন তিনি অদৃশ্যের দয়া ও অনুগ্রহের প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে বসে থাকলেন। এমন সময়ে তাঁর কন্যা এসে সম্পূর্ণ ঘটনা শোনালেন। তিনি বললেন, যখন মুসা কোনো ধাত্রীরই দুধ পান করলো না, তখন আমি বললাম, ইসরাইলি বংশে একজন অত্যন্ত ভদ্র ও সৎস্বভবা নারী আছেন। তিনি এই শিশুকে আপন সন্তানের মতো লালন-পালন করতে পারবেন। ফেরআউনের স্ত্রী এ-কথা শুনে আমাকে নির্দেশ দিলেন, আমি যেনো এখনই আপনাকে নিয়ে গিয়ে ওখানে উপস্থিত করি। এ তো আমাদের প্রতি আল্লাহপাকের বড়ই অনুগ্রহ ও দয়া। এখন আপনি গিয়ে আপনার পুত্রকে বুকে তুলে নিয়ে প্রাণ জোড়ান এবং চোখ শীতল করুন। আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করুন। কেননা, তিনি তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন।

এই ঘটনা কুরআন মাজিদে বর্ণিত হয়েছে এভাবে—

وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ () فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ () وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ () وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ () وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ () وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ () فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (سورة القصص)

'মুসার মায়ের অন্তরে আমি ইঙ্গিতে (ইলহামযোগে) নির্দেশ করলাম, "শিশুটিকে স্তন্য দান করতে থাকো। যখন তুমি তার সম্পর্কে কোনো আশঙ্কা করবে তখন তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করো এবং ভয় করো না, দুঃখও করো না। আমি অবশ্যই তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেবো এবং তাকে রাসুলদের একজন বানাবো। তখন ফিরআউনের (পরিবারের) লোকজন তাকে (শিশু মুসাকে নদী থেকে) উঠিয়ে নিলো। এর পরিণাম তো এই ছিলো যে, সে (ভবিষ্যতে) তাদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হয়। ফেরআউন, হামান ও কারুন ও তাদের বাহিনী ছিলো অপরাধী। ফেরআউনের স্ত্রী বললো, "এই শিশু আমার ও তোমার নয়ন-প্রীতিকর। একে হত্যা করো না, সে আমাদের উপকারে আসতে পারে, আমরা তাকে সন্তান হিসেবেও গ্রহণ করতে পারি।" প্রকৃতপক্ষে তারা এর পরিণাম বুঝতে পারে নি (এই শিশু এবং তাদের নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাদের কোনো খবরই ছিলো না)। মুসার মায়ের হৃদয় অস্থির হয়ে পড়েছিলো। যাতে সে আস্থাশীল হয় তার জন্য আমি তার হৃদয়কে দৃঢ় করে না দিলে সে তার পরিচয় তো প্রকাশ করেই দিতো। সে (মুসা আ.-এর মা) মুসার বোনকে বললো, "এর (সিন্দুকটির) পেছনে পেছনে যাও।" সে তাদের অজ্ঞাতসারে (অপরিচিতের মতো) দূর থেকে তাকে (মুসাকে) দেখছিলো। (ফেরআউনের পরিবার এ-ব্যাপারে কিছু জানতেও পারলো না।) পূর্ব থেকে আমি তাকে ধাত্রী-স্তন্যপানে বিরত রেখেছিলাম। এরপর মুসার বোন বললো, 'তোমাদেরকে কি আমি এমন এক পরিবারের সন্ধান দেবো যে-পরিবার তোমাদের হয়ে একে লালন-পালন করবে এবং এর কল্যাণকামী হবে? তখন আমি তাকে ফিরিয়ে দিলাম তার মায়ের কাছে, যাতে তার চোখ জোড়ায়, সে দুঃখ না করে এবং বুঝতে পারে যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।" [সুরা কাসাস : আয়াত ৭-১৩]

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى () إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى () أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي () إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ (سورة طه)

'(হে মুসা,) এবং (তুমি জানো যে,) আমি তো তোমার প্রতি আরও একবার অনুগ্রহ করেছিলাম; যখন আমি তোমার মাতাকে জানিয়েছিলাম যা ছিলো জানাবার (আমি তাকে বুঝিয়ে দিলেছিলাম)—যে, "তুমি তাকে (মুসাকে) সিন্দুকের মধ্যে রাখো, এরপর তাকে দরিয়ায়[১৫] ভাসিয়ে[১৬] দাও, যাতে দরিয়া তাকে তীরে ঠেলে দেয়। তাকে আমার (মুসলিম সম্প্রদায়ের) শত্রু এবং তার (এই শিশুর) শত্রু নিয়ে যাবে।" (হে মুসা,) আমি আমার কাছ থেকে তোমার ওপর ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছিলাম, (যাতে অপরিচিত মানুষও তোমাকে ভালোবাসতে শুরু করে এবং আমার ইচ্ছা ছিলো) যাতে তুমি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হও। যখন তোমার বোন এসে (ফেরআউনের স্ত্রীকে) বললো, "আমি কি তোমাদেরকে বলে দেবো কে এই শিশুর ভার নেবে?" তখন আমি তোমাকে তোমার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম যাতে তার চোখ জোড়ায় এবং (শিশুর বিচ্ছেদে সে দুঃখ না পায়।' [সূরা তোয়া-হা : আয়াত ৩৭-৪০]

তাওরাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুসা আ.-এর মা যখন মুসা আ.-এর দুধ ছাড়ালেন তখন তিনি তাকে ফেরআউনের কন্যার কাছে দিয়ে দিলেন। এরপর মুসা আ. এক দীর্ঘকাল রাজপ্রাসাদে প্রতিপালিত হতে থাকেন এবং ওখানেই তাঁর ক্রমোন্নতি ঘটতে থাকে। কিন্তু তাওরাতের এই উক্তি বাস্তবের সম্পূর্ণ বিপরীত যে, মুসা আ. ফেরআউনের কন্যার পুত্র হয়েছিলেন। "যখন শিশু একটু বড় হলো, তখন মুসার মাতা তাকে ফেরআউনের কন্যার কাছে নিয়ে এলেন এবং সে ফেরআউনের কন্যার পুত্র নির্ধারিত হলো। সে তার নাম রাখলো মুসা এবং বললো, তার এই নাম রাখলাম এই কারণে যে, আমি তাকে পানি থেকে উদ্ধার করেছি।"[১৭]

হযরত মুসা আ.-এর মিসর থেকে বহির্গমন

হযরত মুসা আ. এক দীর্ঘ সময় রাজপ্রাসাদে রাজকীয় আদর-যত্নে প্রতিপালিত হলেন। ধীরে ধীরে তিনি যৌবনে পদার্পণ করলেন। তখন

[১৫] اليم শব্দের অর্থ দরিয়া। কিন্তু এখানে اليم বলে নীলনদকে বুঝানো হচ্ছে।

[১৬] القذف শব্দের অর্থ নিক্ষেপ করা; এখানে নিক্ষেপ করার অর্থ 'ভাসিয়ে দেয়া'।

[১৭] তাওরাত : আত্মপ্রকাশ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১, আয়াত ১০।

দেখা গেলো তিনি এক সুঠামদেহ সাহসী যুবক। তাঁর মুখমণ্ডল থেকে গাম্ভীর্য ফুটে বের হচ্ছে। কথাবার্তা থেকে বিশেষ ধরনের দৃঢ়তা ও মহত্ত্বের শান প্রকাশ পাচ্ছে। যৌবনে পদার্পণ করার পর তিনি এটাও জানতে পেরেছিলেন যে, তিনি ইসরাইলি বংশোদ্ভূত। মিসরীয় বংশের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই। তিনি এটাও দেখলেন যে, বনি ইসরাইলকে জুলুম ও নিপীড়ন করা হচ্ছে এবং তারা মিসরে অত্যন্ত লাঞ্ছনা ও দাসত্বের জীবনযাপন করছে। এই অবস্থা দেখে ক্রোধে তাঁর রক্ত টগবগ করতে লাগলো। তিনি সুযোগ পেলেই বনি ইসরাইলের সাহায্য-সহযোগিতা ও তাদের রক্ষায় এগিয়ে যেতেন।

আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জারির আত-তাবারি রহ. তাঁর تاريخ الامم والملوك(তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক) গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত মুসা আ. যখন যৌবনে পদাপর্ণ করেন এবং একজন শক্তিমান যুবকরূপে আবির্ভূত হলেন, তখন বনি ইসরাইলের ব্যাপারে তাঁর সাহায্য ও সুরক্ষার প্রতিক্রিয়া এই হলো যে, বনি ইসরাইলের ওপর মিসরীয় কর্মচারীদের অত্যাচার হ্রাস পেতে শুরু করলো।

আর এতে সন্দেহ নেই যে, বনি ইসরাইলের লাঞ্ছনা ও দাসত্বের জন্য মুসা আ.-এর ক্রুদ্ধ ও চিন্তিত হওয়া এবং তাদের সাহায্য-সহযোগিতা ও মুক্তির জন্য তাঁর হৃদয়ে গভীর আগ্রহ ও দৃঢ় স্পৃহা একটি আল্লাহ-প্রদত্ত স্বভাবজাত আবেগ ছিলো।

এখন আল্লাহপাকের দানের হাত আরো অগ্রসর হলো এবং তিনি মুসা আ.-কে দৈহিক শক্তির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অলঙ্কারেও ভূষিত করলেন। এখন পরিপক্ব বয়সে পৌঁছে তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণের শক্তি, সূক্ষ্মজ্ঞান ও চিন্তাশক্তিও উচ্চস্তরে উপনীত হলো। তিনি দৈহিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে পূর্ণতা লাভ করলেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (سورة القصص)

'যখন মুসা পূর্ণ যৌবনে উপনীত হলো ও পরিণত বয়স্ক হলো তখন আমি তাকে হেকমত (সিদ্ধান্ত গ্রহণের শক্তি) ও জ্ঞান দান করলাম; এইভাবে

আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কার প্রদান করে থাকি।' [সুরা কাসাস : আয়াত ১৪]

মোটকথা, মুসা আ. শহরে ভ্রমণকালে এসব অবস্থা দেখতেন এবং কোনো কোনো বনি ইসরাইলকে সাহায্য করতেন।

একদিন তিনি শহরের লোকালয় ছেড়ে শহরের এক প্রান্তের দিকে যাওয়ার সময় দেখলেন যে, একজন মিসরীয় লোক এক ইসরাইলি ব্যক্তিকে কামলা খাটানোর জন্য টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। ইসরাইলি ব্যক্তি মুসা আ.-কে দেখে সাহায্য প্রার্থনা করলো। মিসরীয় ব্যক্তির এ-ধরনের জুলুম দেখে হযরত মুসা আ. ক্রোধান্বিত হয়ে তাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু মিসরীয় লোকটা তাঁর কথা কানেই তুললো না। মুসা আ. ক্রোধের সঙ্গে সজোরে এক চড় কষালেন। মিসরীয় লোকটা চড়ের আঘাত সহ্য করতে না পেরে সঙ্গে সঙ্গে মারা গেলো। এই ঘটনায় মুসা আ. অনুতপ্ত হলেন। কেননা, লোকটাকে মেরে ফেলার উদ্দেশ্য তাঁর আদৌ ছিলো না। তিনি অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে মনে মনে বললেন, এটা নিশ্চয় শয়তানের কাজ, সে-ই মানুষকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে। তিনি আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করতে থাকলেন—হে আল্লাহ, যা-কিছু ঘটেছে অনিচ্ছাকৃতভাবে এবং অজ্ঞতার কারণে ঘটেছে। আমি আপনার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। ফলে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দিলেন এবং ক্ষমার সুসংবাদও প্রদান করলেন। এদিকে শহরে মিসরীয় ব্যক্তির হত্যার সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো। কিন্তু হত্যাকারীর কোনো সন্ধান পাওয়া গেলো না। অবশেষে মিসরীয়রা ফেরআউনের কাছে ফরিয়াদ জানালো যে, এই হত্যাকাণ্ড নিশ্চয় কোনো ইসরাইলি ব্যক্তি ঘটিয়েছে। সুতরাং আপনি এর বিচার করুন। ফেরআউন বললো, এভাবে সমগ্র গুষ্ঠি থেকে তো প্রতিশোধ নেয়া যাবে না, তোমরা এক কাজ করো, হত্যাকারীর সন্ধান করো। আমি অবশ্যই কর্মের পরিণতি পর্যন্ত পৌঁছে দেবো।

ঘটনাক্রমে পরের দিনও মুসা আ. শহরের শেষ প্রান্তে ভ্রমণ করছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন গতকালের সেই ইসরাইলি ব্যক্তি জনৈক কিবতির (মিসরীয়) সঙ্গে ঝগড়া করছে এবং মিসরীয় ব্যক্তিকেই প্রবল মনে হচ্ছে। মুসা আ.-কে ইসরাইলি ব্যক্তি গতকালের মতো আজো তাঁর কাছে সাহায্য চাইলো এবং বিচার প্রার্থনা প্রার্থনা করলো।

এই ঘটনা দেখে মুসা আ. দ্বিগুণ অসন্তোষ অনুভব করলেন। একদিকে মিসরীয় ব্যক্তির জুলুম, অপরদিকে ইসরাইলি ব্যক্তি চিৎকার-চেঁচামেচি এবং গতকালের ঘটনার স্মরণ—এসব বিরক্তির মধ্যে তিনি মিসরীয় ব্যক্তিকে নিবৃত্ত করার জন্য হাত বাড়ালেন। আর সঙ্গে সঙ্গে ইসরাইলি ব্যক্তিকেও ধমক দিয়ে বললেন, إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ 'তুই তো স্পষ্টই একজন বিভ্রান্ত লোক।'[১৮] অর্থাৎ অযথা ঝগড়া বাধিয়ে সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করতে থাকিস!

ইসরাইলি ব্যক্তি হযরত মুসা আ.-কে তার দিকে হাত বাড়াতে দেখে এবং তার সম্পর্কে অসন্তুষ্টিমূলক কঠিন কথা শুনে মনে করলো যে, ইনি এখন তাকে প্রহার করার জন্যই হাত বাড়িয়েছেন এবং তাকে ধরতে চাচ্ছেন। তখন সে উদ্বেগের সঙ্গে বলে উঠলো—

أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ (سورة القصص)

'গতকাল তুমি এক ব্যক্তিকে যেভাবে হত্যা করেছো, সেভাবে কি আমাকেও হত্যা করতে চাচ্ছো? তুমি তো পৃথিবীতে স্বেচ্ছাচারী হতে চাচ্ছো, শান্তি স্থাপনকারী হতে চাচ্ছো না।' [সুরা কাসাস : আয়াত ১৯]

মিসরীয় লোকটি এসব কথা শুনে তৎক্ষণাৎ ফেরআউনের পারিষদবর্গের কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা শুনালো। তারা ফেরআউনের কাছে গিয়ে জানালো যে, মুসা গতকালের মিসরীয় ব্যক্তির হত্যাকারী। ফেরআউন এ-কথা শুনেই জল্লাদকে নির্দেশ দিলো, এখনই গিয়ে মুসাকে গ্রেপ্তার করে আমার সামনে উপস্থিত করো।

মিসরীয়দের এই দরবারে এমন একজন সম্মানিত ও পদস্থ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন যিনি মুসা আ.-কে মনে-প্রাণে ভালোবাসতেন এবং ইসরাইলি ধর্মকে সত্য বলে বিশ্বাস করতেন। তিনি ফেরআউনের বংশেরই একজন ব্যক্তি ছিলেন এবং দরবারের সভাষদও ছিলেন। তিনি ফেরআউনের এই আদেশ শুনে জল্লাদের পূর্বেই দরবারে থেকে বের হয়ে গেলেন এবং দৌড়ে গিয়ে মুসা আ.-এর খেদমতে হাজির হলেন। তিনি সব ঘটনা মুসা আ.-কে জানালেন এবং পরামর্শ দিলেন যে, এখন এটাই

---

[১৮] সুরা কাসাস : আয়াত ১৮।

আপনার জন্য কল্যাণকর হবে যে আপনি মিসরীয়দের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করুন এবং এমন কোনো স্থানের দিকে হিজরত করুন যেখানে ফেরআউনের ক্ষমতা অচল। হযরত মুসা আ. তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করলেন এবং চুপচাপ মাদয়ানের দিকে হিজরত করে চলে গেলেন।

এখানে একটি কথা চিন্তা-ভাবনা করার যোগ্য যে, কুরআন মাজিদ এই লোকটি সম্পর্কে শুধু এতটুকু বলেছে—

وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ

'নগরীর দূর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি ছুটে এলো ও বললো, "হে মুসা, (ফেরআউনের) পারিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করার পরামর্শ করছে।"' [সুরা কাসাস : আয়াত ১৯]

আর আমরা তাঁর সঙ্গে 'সম্মানিত' ও 'পদস্থ' বিশেষণ দুটি যোগ করে দিলাম। এই কারণ আবদুল ওয়াহ্হাব নাজ্জার মিসরি কথায় এই যে, ১. লোকটি শহরের শেষ প্রান্ত থেকে এসেছিলেন। আর আরব দেশে এই প্রবাদ প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, الأطراف سكنى الأشراف। 'শহরের প্রান্তভাগ সম্মানিত লোকদের বাসস্থান'। আর তিনি মুসা আ.-কে বলেছিলেন, إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ। 'রাজদরবারের লোকেরা তোমাকে হত্যা করার পরামর্শ করছে।' বলা বাহুল্য, এরূপ কথা এমন ব্যক্তিই জানতে পারেন যিনি ফেরআউন ও তার সভাষদগণের মধ্যে বিশেষ পদ-মর্যাদার অধিকারী।

কুরআন মাজিদ এই ঘটনা বর্ণনা করছে এভাবে—

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ () قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ () قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ () فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ () فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ

نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ () وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ () فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (سورة القصص)

'সে নগরীতে প্রবেশ করলো, যখন এর অধিবাসীরা ছিলো অসতর্ক। ওখানে সে দুটি লোককে সংঘর্ষে লিপ্ত দেখলো, একজন তার নিজের দলের এবং অপরজন তার শত্রু দলের। মুসার দলের লোকটি তার শত্রুর বিরুদ্ধে তার সাহায্য প্রার্থনা করলো। তখন মুসা তাকে (শত্রুদলের লোকটাকে) মুষ্ট্যাঘাত করলো। এইভাবে সে তাকে হত্যা করে বসলো। মুসা বললো, এ তো শয়তানের কাণ্ড, সে তো প্রকাশ্য শত্রু ও বিভ্রান্তকারী।" সে (মুসা) বললো, "হে আমার প্রতিপালক, আমি তো আমার নিজের প্রতি জুলুম করেছি; সুতরাং আমাকে ক্ষমা করো। তখন তিনি তাকে ক্ষমা করে দিলেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। সে আরো বললো, "হে আমার প্রতিপালক, তুমি যেহেতু আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছো, আমি কখনো অপরাধীদের সাহায্যকারী হবো না। এরপর ভীত সতর্ক অবস্থায় সেই নগরীতে তার সকাল হলো। হঠাৎ সে শুনতে পেলো, আগের দিন যে-ব্যক্তি তার সাহায্য চেয়েছিলো, সে তার সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে। মুসা তাকে বললো, "তুমি তো স্পষ্টই একজন বিভ্রান্ত ব্যক্তি।" এরপর মুসা যখন উভয়ের শত্রুকে (মুসা আ. ও ইসরাইলি ব্যক্তিটির শত্রু এক কিবতিকে) ধরতে উদ্যত হলো তখন সে-ব্যক্তি বলে উঠলো, "গতকাল তুমি এক ব্যক্তিকে যেভাবে হত্যা করেছো, সেভাবে কি আমাকেও হত্যা করতে চাচ্ছো? তুমি তো পৃথিবীতে স্বেচ্ছাচারী হতে চাচ্ছো, শান্তি স্থাপনকারী হতে চাচ্ছো না।" নগরীর দূর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি ছুটে এলো ও বললো, "হে মুসা, (ফেরআউনের) পারিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করার পরামর্শ করছে। সুতরাং তুমি (মিসর থেকে) বাইরে চলে যাও। আমি তো তোমার কল্যাণকামী।" ভীত সতর্ক অবস্থায় সে ওখান থেকে বের হয়ে পড়লো এবং বললো, "হে আমার প্রতিপালক, তুমি জালিম সম্প্রদায় থেকে আমাকে রক্ষা করো।"' [সুরা কাসাস : আয়াত ১৫-২১]

وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا

"এবং (হে মুসা,) তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে; তখন আমি তোমাকে মনঃপীড়া থেকে মুক্তি দিই, আমি তোমাকে বহু পরীক্ষা করেছি।" [সুরা তোয়া-হা : আয়াত ৪০]

এ-জায়গায় কুরআন ও তাওরাতের বর্ণনায় কিছুটা ভিন্নতা দেখা যায়।

ক. কুরআন মাজিদ দ্বিতীয় দিনের ঝগড়কারীদের একজনকে বনি ইসরাইলের এবং দ্বিতীয়জনকে মিসরীয় (ফেরআউনি) বলেছে। আর তাওরাত বলেছে, দুজনই বনি ইসরাইলের ছিলো।

খ. তাওরাতে সেই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয় নি, যিনি মুসা আ.-কে ফেরআউন ও তার পারিষদবর্গের পরামর্শ সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছিলো।

কিন্তু এ-দুটি বিষয় সম্পর্কে (নিরপেক্ষ চিন্তায়) জ্ঞান ও প্রকৃতি এদিকেই পথ প্রদর্শন করে যে, কুরআন মাজিদের বিবরণই সত্য এবং তার ওপরই বিশ্বাস রাখা আবশ্যক। কেননা, ফেরআউনের সম্প্রদায়ের কাছে বনি ইসরাইরের প্রাণের কোনো মূল্যই ছিলো না যে, হযরত মুসা আ.-এর মতো রাজপ্রাসাদে অবস্থানকারী ব্যক্তি বিরুদ্ধে খুনের বদলার দাবিদার হতো। আর দ্বিতীয় কথা হলো, তাওরাতের বর্ণনার সঙ্গে এটি একটি স্বাভাবিক সংযোগ, যা বিশ্বাস ও জ্ঞানের সঙ্গে করা হয়েছে।

হযরত মুসা আ. ও মাদয়ান ভূমি

গযরত শুআইব আ.-এর ঘটনাবলিতে মাদয়ান সম্পর্কে অনেককিছু লেখা হয়েছে। হযরত মুসা আ. যখন মিসর থেকে বের হয়ে যেতে সংকল্প করলেন, তখন তিনি মাদয়ান দেশকেই মনোনীত করলেন। মাদয়ানের লোকালয়টি মিসর থেকে অষ্টম মঞ্জিলে অবস্থিত ছিলো।[১৯] মাদয়ানকে সম্ভবত তিনি এইজন্য মনোনীত করেছিলেন যে, মাদয়ানবাসীদের এই গোত্রটি হযরত মুসা আ.-এর নিকটতম আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ ছিলো। কেননা, মুসা আ. ছিলেন হযরত ইসহাক বিন হযরত ইবরাহিম আ.-এর বংশধর আর মাদয়ানের এই গোত্রটি হলো হযরত ইসহাক আ.-এর ভাই মাদয়ান বিন ইবরাহিম আ.-এর বংশ থেকে উদ্ভূত।

---

[১৯] তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক, আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জারির আত-তাবারি, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০৫, সাঈদ বিন জুবাইর রা. থেকে বর্ণিত।

হযরত মুসা আ. ফেরআউনের ভয়ে পলায়ন করেছিলেন। ফলে তাঁর সঙ্গে কোনো সাথিও ছিলো, পথপ্রদর্শকও ছিলো না। এমনকি কোনো পাথেও তাঁর সঙ্গে ছিলো। আর দ্রুত চলার জন্য তাঁর পা দুটিও ছিলো খালি। আবু জাফর আত-তাবারি রহ. হযরত সাঈদ বিন জুবাইর রা. থেকে রেওয়ায়েত করে লিখেছেন যে, এই গোটা সফরে মুসা আ.-এর খাদ্য গাছের পাতা ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। নগ্নপদ হওয়ার কারণে এই দীর্ঘ সফরে তাঁর পায়ের তলার চামড়া পর্যন্ত খুলে গিয়েছিলো। এই অস্থির ও উদ্বিগ্ন অবস্থায় হযরত মুসা আ. মাদয়ানের ভূমিতে প্রবেশ করলেন।[২০]

মাদয়ানের পানি

হযরত মুসা আ. মাদয়ানের মাটিতে পদার্পণ করলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে, কূপের সামনে পানি পান করানোর জায়গার ওপর অসম্ভব ভিড় লেগে রয়েছে। লোকেরা তাদের গৃহপালিত পশুগুলোকে পানি পান করাচ্ছে। কিন্তু এই ভিড়ের একটু দূরে দুটি বালিকা দাঁড়িয়ে আছে এবং তাদের পশুগুলোকে পানির দিকে যেতে বারণ করছে।

হযরত মুসা আ. বুঝে ফেললেন যে, এখানেও সেসব কর্মকাণ্ডই হচ্ছে যা দুনিয়ার জালিম শক্তিগুলো করে যাচ্ছে। তারা আল্লাহ তাআলার উত্তম বিধানকে লঙ্ঘন করে সম্প্রদায়গুলোর যাবতীয় কর্মকাণ্ড ও শৃঙ্খলাকেও জুলুমের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে। মনে হয়, বালিকা দুটি কোনো দুর্বল পরিবারের সদস্য। সে-কারণেই তাদেরকে এভাবে অপেক্ষা করতে হচ্ছে। শক্তিশালী লোক ও জালিমেরা তাদের পশুগুলোকে পানি পান করিয়ে তৃপ্ত করিয়ে নেয়ার পর এবং যত লোক এখানে পানি পান করাতে এসেছে তাদের সবাই পানির কাছ থেকে চলে যাওয়ার পর অবশিষ্ট পানি যা-কিছু থাকবে তা সেসব দুর্বলের পশুগুলোর অংশ হবে। দুর্বলের জন্য প্রত্যেক শক্তিমান এই বিধানই সাব্যস্ত করে রেখেছে যে, প্রতিটি স্বার্থ ও লাভের বেলায় অগ্রাধিকার থাকবে শক্তিমানদের এবং দুর্বলদের পালা আসবে পরে। আর সবলদের খাওয়ার পালা আসবে

---

[২০] তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক, আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জারির আত-তাবারি, ১ম খণ্ড,

সবার আগে। যেমন : আরবের বিখ্যাত কবি আমর বিন কুলসুম বলেন—

ونشرب إن وردنا الماء صفوا

ويشرب غيرنا كدرا وطينا

'আমরা যখন কোনো পানির কাছে যাই তখন উত্তম ও পরিষ্কার পানি পান করি। আর আমরা ছাড়া অন্যরা (যারা আমাদের চেয়ে দুর্বল) পান করে ঘোলা পানি ও মাটি।'[২১]

এই কবিতাটি প্রকৃতপক্ষে আমর বিন কুলসুম ও তাঁর গোত্রের অবস্থারই প্রতীক নয়; বরং তা হুবহু আয়নার মতো গোটা দুনিয়ার অত্যাচারী শাসনের চিত্র।

যাইহোক। হযরত মুসা আ. এই অবস্থা বরদাশত করতে পারলেন না। তিনি একটু এগিয়ে গিয়ে বালিকা দুটিকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা তোমাদের পশুগুলোকে পানি পান করাচ্ছো না কেনো? তারা দুজনই জবাব দিলো, আমরা দুর্বল ও অক্ষম। পশুগুলোকে নিয়ে অগ্রসর হলে এই শক্তিমানেরা পেছন থেকে আমাদের হটিয়ে দেয়। আর আমাদের পিতা একজন বৃদ্ধ ও দুর্বল। তাঁর এখন এই শক্তি নেই যে, তিনি শক্তিমানদের এই ভিড় সরিয়ে সামনে অগ্রসর হন। কাজেই যখন এরা পানি পান করিয়ে চলে যাবে, তখন অবশিষ্ট পানি যা কিছু থাকবে তা-ই আমরা আমাদের পশুদেরকে পান করিয়ে বাড়ি ফিরবো। এটাই আমাদের প্রাত্যহিক নিয়ম।

এসব কথা শুনে মুসা আ. উত্তেজিত হয়ে উঠলেন এবং ভেড়ার গোটা পালসহ ভিড় সরিয়ে সামনে অগ্রসর হয়ে কূপের কাছে পৌছলেন। তিনি কূপের বড় বালতিটি নিয়ে কূপে ফেললেন এবং পানি ভর্তি করে একাই টেনে তুললেন। এভাবে তিনি বালিকা দুটির পশুগুলোকে পানি পান করিয়ে দিলেন। হযরত মুসা আ. যখন মানুষের ভিড় ঠেলে নির্ভীকতার সঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করতে লাগলেন, তখন যদিও তা উপস্থিত লোকদের মনে অসন্তোষ ও বিরক্তির ভাব উদ্রেক করেছিলো, কিন্তু তার গাম্ভীর্যপূর্ণ চেহারা ও দৈহিক শক্তি দেখে সবাই ভয় পেয়ে গিয়েছিলো। এরপর মুসা

---

[২১] পঙক্তি দুটি কবির ألا هبي بصحنك فاصبحينا নামক মুআল্লাকার অন্তর্গত।

আ.-কে পানির বড় বালতিটি একাকী টেনে তুলতে দেখে সে-শক্তির সামনেই পরাভব স্বীকার করে, যে-শক্তির মদে মত্ত থেকে দুর্বল ও অক্ষমদেরকে পেছনে হটিয়ে দিতো এবং তাদের প্রয়োজনকে পদদলিত করে ছাড়তো।

কোনো কোনো মুফাস্‌সির মনে করেন, হযরত মুসা আ. দেখলেন কূপের মুখে একটি বিরাটকায় পাথর ঢাকা দিয়ে রয়েছে। একদল লোক একসঙ্গে শক্তি প্রয়োগ করলে পাথরটিকে তার জায়গা থেকে সরানো যেতে পারে। কিন্তু তিনিই অগ্রসর হলেন এবং একাকীই পাথরটিকে সরিয়ে বালিকা দুটির পশুগুলোর জন্য পানি পূর্ণ করে দিলেন।

আবদুল ওয়াহ্‌হাব নাজ্জার বলেন, এই উক্তিটি কুরআন মাজিদের বর্ণনার বিরোধী। কারণ, কুরআন মাজিদ বলে—

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ (سورة القصص)

'যখন সে (মুসা) মাদয়ানের কূপের কাছে পৌঁছলো, দেখলো, একদল লোক তাদের পশুগুলোকে পানি পান করাচ্ছে।' [সুরা কাসাস : আয়াত ২৩]

তবে এ-কথা কেমন করে শুদ্ধ হতে পারে যে, কূপের মুখ পাথর দিয়ে ঢাকা ছিলো। এই উক্তি যেমন শুদ্ধ ও সঠিক নয় তেমনি এ-ব্যাখ্যাও ঠিক নয় যে, ওখানে দুটি কূপ ছিলো। একটি থেকে মাদয়ানের লোকেরা তাদের পশুগুলোকে পানি পান করাচ্ছিলো আর অপর কূপটির মুখ পাথর দিয়ে ঢাকা ছিলো। আর এই বর্তমান যুগে ওখানে দুটি কূপের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে।

ওখানে দুটি কূপ থাকার ব্যাখ্যাটি শুদ্ধ ও সঠিক না হওয়ার কারণ এই যে, প্রথমত, কুরআন মাজিদ আর-একটি কূপের কথা আদৌ উল্লেখ করে নি এবং যা-কিছু বর্ণনা করেছে এই কূপের সম্পর্কেই বর্ণনা করেছে। দ্বিতীয়ত, পরবর্তীকালে ওই জায়গায় দুটি কূপ বিদ্যমান থাকার দ্বারা এটা অবধারিত হয় না যে, তৎকালেও ওখানে এমনই দুটিই কূপ ছিলো। সম্ভবত দীর্ঘকাল পরে বা ইসলামি যুগে প্রয়োজনের কারণে ওখানে দ্বিতীয় কূপটি খনন করে নেয়া হয়েছে। সুতরাং কুরআন মাজিদের পরিষ্কার ও সাদাসিধে বর্ণনাকে শুধু একটি নির্ভর-অযোগ্য রেয়ায়েতের খাতিরে জটিল বানিয়ে নেয়া সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অসঙ্গত।

মোটকথা, তখন সেই বালিকা দুটির ভেড়ার পাল পানি পান করলো এবং তারা বাড়ির দিকে চলে গেলো। প্রতিদিনের অভ্যাসের বিপরীত তাড়াতাড়ি ফিরে আসার কারণে বালিকা দুটির পিতা অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন। কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা পুরো ঘটনা খুলে বললো। কেমন করে জনৈক মিসরীয় লোক তাদেরকে সাহায্য করেছে। পিতা বালিকা দুজনের একজনকে বললেন, শিগগিরই যাও, তাকে এখনই আমার কাছে নিয়ে এসো।

এদিকে পিতা ও কন্যাদের মধ্যে এ-ধরনের কথাবার্তা হচ্ছিলো আর ওদিকে হযরত মুসা আ. পানি পান করানোর পর কাছেই একটি গাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। একে তো সফরের ক্লান্তি, তার ওপর ক্ষুধা-তৃষ্ণার জ্বালা। হযরত মুসা আ. প্রার্থনা করলেন, 'হে আমার প্রতিপালক, এ-সময়ে উত্তম সরঞ্জাম তা-ই যা আপনি নিজ কুদরতে আমার জন্য নাযিল করবেন, আমি তার কাঙাল।'

বালিকা ওখানে পৌঁছে দেখলো কূপের কাছেই তিনি বসে আছেন। লজ্জায় দৃষ্টি অবনত করে বালিকা বললো, আপনি আমাদের বাড়িতে চলুন। আমাদের পিতা আপনাকে ডাকছেন। তিনি আমাদের প্রতি আপনার অনুগ্রহের বিনিময় প্রদান করবেন। হযরত মুসা আ. ভাবলেন, হয়তো এই সুযোগে কোনো উপায়ের দেখা পাওয়া যেতে পারে। এখন যাওয়াই উচিত, তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করা সঙ্গত নয়। আল্লাহপাক যে আমার দোয়া কবুল করেছে এটা তারই সূচনা। হযরত মুসা আ. উঠে দাঁড়ালেন এবং বালিকাকে বললেন, তুমি আমার চলো না; বরং আমার পেছনে চলো এবং ইশারা-ইঙ্গিতে আমাকে পথ দেখিয়ে দাও।

মুসা আ. সম্মানিত ব্যক্তির বাড়ির দিকে যাত্রা তো কললেন, কিন্তু তিনি স্বভাবগত মর্যাদাবোধ ও আত্মসম্মানের প্রতি লক্ষ করে বার বার বালিকাটির এ-কথা মনে করে দুঃখ পাচ্ছিলেন যে, আমার পিতা আপনার এই পরিশ্রমের বিনিময় দিতে চান। কিন্তু সফর ও তাঁর অবস্থার সঙ্কটময়তা শেষ পর্যন্ত তাঁকে এই পরামর্শই দিলো যে, এখন এই অপছন্দনীয় কাজটাকেই সহ্য করে নাও। তাতে এই নিঃসঙ্গতার সময়ে একজন সহানুভূতিশীল সান্ত্বনাদাতা বন্ধুর স্বতন্ত্র সমবেদনা লাভ করা যেতে পারে।

হযরত মুসা আ. চলতে চলতে গন্তব্যস্থানে এসে পৌঁছলেন। তিনি গঠন ও স্বভাব-চরিত্রে বুযুর্গ ব্যক্তি ও বালিকা দুজনের পিতার সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করলেন। বুযুর্গ ব্যক্তি প্রথমে তাঁকে খাবার খাওয়ালেন। তারপর নিশ্চিন্ত মনে বসিয়ে তাঁর যাবতীয় অবস্থা শুনলেন। হযরত মুসা আ. পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাঁর নিজের জীবনবৃত্তান্ত এবং বনি ইসরাইলের ওপর ফেরআউনের নানাবিধ অত্যাচার ও নিপীড়নের বর্ণনা থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ ঘটনা বিস্তারিত শুনালেন। সবকিছু শোনার পর বুযুর্গ ব্যক্তি মুসা আ.-কে সান্ত্বনা দিলেন এবং আল্লাহ তাআলার শোকর, এখন তুমি জালিমদের কবল থেকে মুক্তি লাভ করেছো, কোনো ভয়ের কারণ নেই।

এখানে অত্যাচারীদের অত্যাচার ও জালিমদের জুলুম বলতে বনি ইসরাইলের শিশুদেরকে হত্যা, বনি ইসরাইলকে দাস বানিয়ে রাখা, তাদের নানা ধরনের দুর্দশা ও যন্ত্রণার মধ্যে আবদ্ধ রাখার ঘটনাবলিই উদ্দেশ্য হতে পারে। তা ছাড়া তাদের কুফর এবং ভূপৃষ্ঠে ফেতনা-ফাসাদ ও অনর্থ বিস্তার করাও উদ্দেশ্য হতে পারে। অন্যথায় কিবতি লোকটিকে হত্যা করে ফেলার ব্যাপারে মুসা আ. নিজের কাজে জন্য অনুতপ্ত ছিলেন এবং নিজেকে দোষী মনে করতেন।

এই ঘটনা কুরআন মাজিদে বর্ণিত হয়েছে এভাবে—

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ () وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ () فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ () فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (سورة القصص)

'যখন মুসা মাদয়ান অভিমুখে যাত্রা করলো তখন বললো, আশা করি আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করবেন। যখন সে মাদয়ানের কূপের কাছে পৌঁছলো, দেখলো, একদল লোক তাদের (গৃহপালিত) পশুগুলোকে পানি পান করাচ্ছে এবং তাদের পেছনে দুইজন

নারী তাদের পশুগুলোকে আগলাচ্ছে (পানির কাছে যেতে বারণ করছে)। মুসা বললো, "তোমাদের কী ব্যাপার?" তারা বললো, "আমরা আমাদের জানোয়ারগুলোকে পানি পান করাতে পারি না, যতক্ষণ রাখালেরা তাদের জানোয়ারগুলোকে নিয়ে সরে যায়। আমাদের পিতা অতি বৃদ্ধ।" মুসা তখন তাদের পক্ষে পশুগুলোকে পানি পান করালো। তারপর সে ছায়ার নিচে আশ্রয় গ্রহণ করে বললো, "হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমার প্রতি যে-অনুগ্রহ করবে আমি তার কাঙাল।" তখন নারী দুজনের একজন লজ্জা-জড়িত চরণে তার কাছে এলো এবং বললো, 'আমার পিতা আপনাকে আমন্ত্রণ করছেন, আমাদের জানোয়ারগুলোকে পানি পান করানোর পারিশ্রমিক দেয়ার জন্য।" তখন মুসা তার কাছে এসে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলো। সে বললো, "ভয় করো না, তুমি জালিম সম্প্রদায়ের কবল থেকে বেঁচে গেছো।"' [সুরা কাসাস আয়াত ২২-২৫]

তাওরাতে এখানেও দুটি জায়গায় মতভিন্নতা রয়েছে :

ক. তাওরাত বালিকাদের সংখ্যা দুইয়ের জায়গায় সাত বলেছে।

খ. তাওরাত বলে, বালিকারা পানি উঠিয়ে হাউজ পূর্ণ নিয়েছিলো। কিন্তু অন্য লোকেরা বল প্রয়োগ করে বালিকাদের হটিয়ে দিয়ে নিজেদের পশুগুলোকে পান পান করাতে শুরু করে দিলো। এই কাণ্ড দেখে হযরত মুসা আ. ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন।

এখানেও আমাদের কুরআন মাজিদের বর্ণনাকেই নির্ভরযোগ্য মনে করা কর্তব্য। প্রথমত এইজন যে, পূর্ববর্তী মতভিন্নতার জায়গাগুলোতে কুরআনের বর্ণনাকেই যুক্তিযুক্ত এবং স্বাভাবিকতার অনুরূপ দেখা গেছে। দ্বিতীয়ত এইজন্য যে, এখানেও সংখ্যার ব্যাপারটি থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেও তাওরাতের অন্যান্য বিষয় এ-কারণে সঠিক নয় যে, বালিকাদের মাদয়ান গোত্রের এবং সেই বসতিরই বাসিন্দা বলে মনে হয়। কূপের জায়গায় এ-ধরনের ঘটনা দৈনিকই তাদের সঙ্গে ঘটতো। সুতরাং তাদের জানা ছিলো যে, এই শক্তিবানের দল কোনোক্রমেই তাদেরকে অগ্রসর হতে দেবে না। আর আরব দেশের কবিদের কথা থেকেও এটাই প্রকাশ পায় যে, পানির ব্যাপারে তাদের দেশে দুর্বলদের ওপর শক্তিশালীদের অগ্রাধিকার ছিলো। শুধু আরব কেনো, গোটা দুনিয়ার প্রতিটি অংশে এই

অবস্থাই বিরাজমান ছিলো। সুতরাং, বালিকারা পানি পান করানোর জায়গায় অগ্রসর হওয়ার সাহস কী করে করতে পারতো। সঠিক কথা এটাই যে, তারা দুর্বল পরিবারের লোক ছিলো। তা ছাড়া মেয়েলোক হওয়ার কারণে এতটুকুতেই তৃপ্ত থাকতো যে, সবাই পানি পান করিয়ে চলে গেলে উদ্বৃত্ত পানিতে নিজেদের কাজ চালিয়ে নিতো।

বাকি থাকলো বালিকাদের সংখ্যার বিষয়টি। বালিকাদের সংখ্যার ব্যাপারে ইমাদুদ্দিন বিন কাসির রহ. দুটি বক্তব্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে লিখেছেন, সম্ভবত মাদয়ানের সেই সম্মানিত ব্যক্তি সাতটি কন্যাই ছিলো। যেমন তাওরাতে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু মাদয়ানের পানির কাছে যে-ঘটনা ঘটেছিলো ওখানে দুটি কন্যাই উপস্থিত ছিলো। যেমন, কুরআন মাজিদের বর্ণনায় স্পষ্ট রয়েছে।

বুযুর্গ ব্যক্তি সঙ্গে শ্বশুর-জামাতা সম্পর্ক

হযরত মুসা আ. এবং মাদয়ান গোত্রের বুযুর্গ মেজবানের মধ্যে এ-ধরনের কথাবার্তা চলছিলো। এ-সময় বৃদ্ধের কন্যা, যে মুসা আ.-কে ডেকে আনতে গিয়েছিলো, তাঁর পিতাকে বললো, আব্বা, আপনি এই মেহমানকে আপনার গৃহপালিত পশুগুলোকে চরানোর জন্য এবং তাদের পানি সংগ্রহ করার জন্য মজদুর নিযুক্ত করুন। মজদুর হিসেবে এমন ব্যক্তিই ভালো যিনি শক্তিশালীও এবং আমানতদারও হয়।

মুফাস্‌সিরগণ বলেন, কন্যার এই উক্তি পিতার কাছে একটু বিস্ময়কর মনে হলো। তিনি কন্যাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এই মেহমানের শক্তি ও আমানতদারি কীভাবে জানতে পারলে? কন্যা জবাব দিলো, আমি মেহমানের দৈহিক শক্তি তো এ থেকেই অনুমান করেছি যে, তিনি কূপের বড় বালতিটি পানি ভর্তি করে একাই টেনে তুললেন। আর আমানতদারির পরীক্ষা তো এ থেকে করলাম, যখন আমি তাকে ডাকতে গেলাম তখন তিনি আমাকে দেখামাত্র দৃষ্টি অবনত করে নিলেন এবং কথাবার্তা বলার সময় তিনি একবারও আমার দিকে মাথা উঠিয়ে তাকান নি। আর যখন বাড়ির দিকে আসতে শুরু করলাম, তখন তিনি আমাকে

তাঁর পেছনে চলতে বললেন এবং শুধু ইশারা-ইঙ্গিতে আমি তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলাম।[২২]

বুযুর্গ পিতা কন্যার এসব কথা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তিনি মুসা আ.-কে বললেন, "যদি তুমি আট বছর আমার কাছে থেকে আমরা বকরি-ভেড়া চরাও, তবে আমি আমার এই কন্যাটিকে তোমার সঙ্গে বিয়ে দিতে প্রস্তুত আছি। আর যদি তুমি এই মেয়াদকে আরো দুই বছর বাড়িয়ে দশ বছর পূর্ণ করো, তবে আরো উত্তম হবে। এটাই হবে এই কন্যার মোহর।" হযরত মুসা আ. এই শর্ত কবুল করে নিলেন এবং বললেন, "আমার ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিন, আমি উল্লিখিত মেয়াদের যেটি ইচ্ছা হয় পূর্ণ করবো। আপনার পক্ষ থেকে এ-বিষয়ে কোনো বাধ্য-বাধকতা থাকবে না।" উভয় পক্ষের পারস্পরিক সম্মতির পর মাদয়ানের বুযুর্গ ব্যক্তি উল্লিখিত মেয়াদকে মোহর সাব্যস্ত করে হযরত মুসা আ.-এর সঙ্গে তাঁর সেই কন্যাটিকে বিয়ে দিয়ে দিলেন।

কোনো কোনো তাফসিরকারের মত এই যে, শ্রমের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর বিবাহবন্ধন সম্পন্ন হয়েছিলো এবং আকদ সম্পন্ন হওয়ার পরক্ষণেই মুসা আ. তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে মাদয়ান ত্যাগ করেছিলেন। মুফাস্‌সিরগণ মুসা আ.-এর স্ত্রীর নাম সাফুরা বলেছেন।

ঘটনার এই অংশটুকু কুরআন মাজিদে বর্ণিত হয়েছে এভাবে—

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ () قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ () قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (سورة القصص)

'তাদের (কন্যা দুজনের) একজন বললো, হে পিতা, তুমি একে (এই মেহমানকে) মজুর নিযুক্ত করো, কারণ তোমার মজুর হিসেবে উত্তম হবে সেই ব্যক্তি, যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত।" সে (কন্যার পিতা) মুসাকে বললো,

---

[২২] جامع البيان عن تأويل آي القرآن, আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জারির আত-তাবারি, সুরা কাসাস।

"আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সঙ্গে বিয়ে দিতে চাই, এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার কাজ করবে, যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ করো, সে তোমার ইচ্ছা (তাহলে তা উত্তম হয়)। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তুমি আমাকে সদাচারী পাবে।" মুসা বললো, "আমার ও আপনার মধ্যে এই চুক্তিই থাকলো। এই দুটি মেয়াদের কোনো একটি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকবে না (আমার প্রতি কোনো ধরনের বাড়াবাড়ি করা হবে না)। আমরা যে-বিষয়ে কথা বলছি আল্লাহ তার সাক্ষী।"' [সুরা কাসাস : ২৬-২৮]

فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى () وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي

(আল্লাহপাক বলেন,) "তারপর তুমি কয়েক বছর মাদয়ানবাসীদের মধ্যে ছিলে, হে মুসা, এরপর তুমি নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলে। এবং আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য প্রস্তুত করে নিয়েছি।" [সুরা তোয়া-হা : আয়াত ৪০-৪১]

মুসা আলাইহিস সালাম-এর শ্বশুর কে ?

কুরআন মাজিদ হযরত মুসা আ. এবং মাদয়ানের বুযুর্গ বৃদ্ধ ব্যক্তি সম্পর্কে যেসব ঘটনা বর্ণনা করেছে, তার মধ্যে কোনো এক স্থানের বৃদ্ধের নাম উল্লেখ করা হয় নি। এ-কারণে ঐতিহাসিক বিবেচনায় মাদয়ানের বৃদ্ধের নাম সম্পর্কে ইতিহাসবেত্তা ও মুফাস্সিরগণের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের বক্তব্য পাওয়া যায়। নিম্নে সেগুলো আলোচিত হলো :

১। মুফাস্সিরগণ, জীবনচরিত লেখকগণ, আরবের সাহিত্যিকগণের বিরাট একটি অংশ ধারণা করেন যে, ইনি হযরত শুআইব আ.। এই মতটি খুবই প্রসিদ্ধ এবং ব্যাপকভাবে স্বীকৃত।

বিখ্যাত মুফাস্সির ইমাম আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জারির আত-তাবারি রহ. হাসান বসরি রহ. থেকে এই বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, "লোকে বলে, মুসা আ.-এর শ্বশুর হযরত শুআইব আ.।"[২৩]

[২৩] প্রাগুক্ত, সুরা কাসাস।

হাফেয ইমাদুদ্দিন বিন কাসির রহ. বলেন, হাসান বসরি রহ.-এর ঝোঁক এ-দিকেই যে, মাদয়ানের বুযুর্গ বৃদ্ধ ছিলেন হযরত শুআইব আ.। ইবনে কাসির আরও বলেন, ইবনে আবি হাতিম পূর্ণ সনদ উল্লেখ করার সঙ্গে মালিক বিন আনাস রহ. থেকে রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যে, তাঁর কাছে এ-বিষয়টি পৌঁছেছে, "হযরত মুসা আ.-এর শ্বশুর ছিলেন হযরত শুআইব আ.।"[২৪]

২। উলামাগণের এক অংশ বলেন, কুরআনে উল্লিখিত বৃদ্ধের নাম 'ইয়াসরুন' এবং ইনি ছিলেন হযরত শুআইব আ.-এর ভাতিজা। ইমাম আবু জাফর আত-তাবারি সনদের সঙ্গে একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যে, হযরত আবু উবায়দা ইবনুল জার্‌রাহ রা. বলতেন, যে-বৃদ্ধ হযরত মুসা আ.-কে শ্রমিক নিযুক্ত করেছিলেন তিনি ছিলেন হযরত শুআইব আ.-এর ভাতিজা 'ইয়াসরুন'।[২৫]

৩। আবার কেউ কেউ বলেন, হযরত মুসা আ.-এর শ্বশুরের নাম ছিলো ইয়াসরি। ইমাম তাবারি রহ. হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. থেকে সনদসহ রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যে, মুসা আ.-কে শ্রমিক নিযুক্তকারী মাদয়ানের বুযুর্গ বৃদ্ধের নাম ছিলো ইয়াসরি। আর এই রেওয়াতেরই অন্য শব্দগুলো এই, "স্ত্রীলোকটির পিতার নাম ছিলো ইয়াসরি।" কিন্তু 'ইয়াসরি'-যুক্ত রেওয়ায়েতটিতে এ-কথা বলা হয় নি যে তিনি হযরত শুআইব আ.-এর ভাতিজা ছিলেন।[২৬] আর তাওরাতে এ-রেওয়ায়েতে বর্ণিত নামের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নাম, 'ইয়াসরু' বলা হয়েছে।[২৭]

৪। কেউ কেউ বলেন, এই বৃদ্ধ হযরত শুআইব আ.-এরই কওমের একজন মুমিন ব্যক্তি ছিলেন।

---

[২৪] তাফসিরুল কুরআনির আযিম, ইমাদুদ্দিন বিন কাসির, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৪৮, সুরা কাসাস।

[২৫] جامع البيان عن تأويل آي القرآن, আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জারির আত-তাবারি, সুরা কাসাস।

[২৬] তাফসিরুল কুরআনির আযিম, ইমাদুদ্দিন বিন কাসির, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৪৮, সুরা কাসাস।

[২৭] উদ্ধৃত বক্তব্যগুলো থেকে এটাও জানা গেলো যে, সাইয়িদ সুলাইমান সাহেবের এই কথা বলা সঠিক নয় যে, মুসলমান মুফাস্‌সিরগণ সাধারণভাবে ইয়াসরু, হুবাব এবং শুআইব আ.-কে একই ব্যক্তি মনে করেন।

৫। উলামাগণের আর একটি জামাত ধারণা করেন যে, এই বৃদ্ধ হযরত শুআইব আ.-ও হতে পারেন না এবং তাঁর ভাতিজাও হতে পারেন না। কেননা, কুরআন মাজিদ থেকে জানা যায় যে, হযরত শুআইব আ.-এর যুগ হযরত মুসা আ.-এর বহু পূর্বের যুগ। উভয় যুগের মধ্যে কয়েকশো বছর ব্যবধান। কুরআন মাজিদ বলে, হযরত শুআইব আ. তাঁর কওমকে সম্বোধন করে বলেছিলেন—

وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُمْ بِبَعِيدٍ (سورة هود)

'আর লুতের সম্প্রদায় (-এর ঘটনা) তোমাদের থেকে দূরে নয়।' [সুরা হুদ : আয়াত ৮৯]

এটা স্পষ্ট বিষয় যে, হযরত লুত আ.-এর সম্প্রদায়ের ধ্বংস হযরত ইবরাহিম আ.-এর যুগে হয়েছিলো। আর হযরত ইবরাহিম আ. ও হযরত মুসা আ.-এর মধ্যবর্তী সময়সীমা ছিলো চারশো বছরেরও বেশি। আর যাঁরা এই সময়সীমাকে নিকটতম করে দেয়ার জন্য বলেছেন যে, হযরত শুআইব আ.-এর বয়স অসাধারণ রকম দীর্ঘ হয়েছিলো, তাঁদের এই দাবির পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই।[২৮]

এই বক্তব্যের সমর্থনের জন্য এটিও একটি শক্তিশালী দলিল যে, হযরত মুসা আ.-এর শ্বশুর যদি হযরত শুআইব আ.-ই হতেন তাহলে অবশ্যই কুরআন তাঁর না উল্লেখ করতো। এভাবে অস্পষ্ট রেখে দিতো না।[২৯]

এই বিভিন্ন ধরনের পাঁচটি বক্তব্য উদ্ধৃত করার পর আমাদের মতে প্রবল ও বিশুদ্ধ অভিমত এটাই মনে হয় যা ইবনে জারির আত-তাবারি ও ইবনে কাসির রহ.-এর মতো উচ্চ মর্যাদাশীল মুহাদ্দিসগণ ও মুফাস্সিরগণ অবলম্বন করেছেন। তাঁরা বলেন, নাম স্পষ্টভাবে বর্ণনা করার ব্যাপারে কোনো সহিহ রেওয়ায়েত পাওয়া যায় নি। আর যেসব রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করা হয়েছে সেগুলো দলিলরূপে পেশ করার যোগ্য নয়। সুতরাং নাম স্পষ্ট না করে যেভাবে কুরআন মাজিদ সেই বৃদ্ধের কথা আলোচনা করেছে, তদ্রূপ আমরাও তার নাম স্পষ্ট উল্লেখ করাকে আল্লাহ তাআলার ইলমের ওপর সোপর্দ করে দিলাম।

---

[২৮] তাফসিরুল কুরআনির আযিম, ইমাদুদ্দিন বিন কাসির, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৪৮, সুরা কাসাস।

[২৯] প্রাগুক্ত।

তাফসিরে ইবনে কাসির-এর ইবারত নিম্নরূপ—

قال ابو جعفر الطبری و هذا مما لا يدرك علمه إلا بخبر، ولا خبر بذلك تجب حجته، فلا قول في ذلك أولى بالصواب مما قاله الله جل ثناؤه

'আবু জাফর আত-তাবারি বলেছেন, নাম স্পষ্টরূপে উল্লেখ করার বিষয়টি খবর ও সংবাদ পাওয়া ব্যতীত মীমাংসিত হতে পারে না। এ-ব্যাপারে এমন কোনো খবর বা রেওয়ায়েত পাওয়া যায় নি যা তা দলিল হতে পারে। সুতরাং সবচেয়ে উত্তম পন্থা হলো তা-ই যা কুরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলা বলেছেন।'[৩০] [অর্থাৎ নাম সম্পর্কে নীরব থেকেছেন।]

ইবনে জারির আত-তাবারি ইঙ্গিত করেছেন কুরআনের এই বাক্যটির প্রতি—

وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

'আর আমাদের পিতা একজন অতিশয় বৃদ্ধ।' [সূরা কাসাস : আয়াত ২৩]

আবদুল ওয়াহ্হাব নাজ্জার বলেন, 'আমার সঙ্গে একজন মর্যাদাবান আলেম এ-বিষয়ে আলোচনা করেছেন যে, হযরত মুসা আ. অতি উচ্চ শ্রেণির নবী ছিলেন। সুতরাং কোনো সাধারণ লোক তাঁকে শ্রমিক নিযুক্ত করার সাহস করতে পারে না। আর মুসা আ. তা মঞ্জুরও করতেন না। তাঁকে শ্রমিক নিযুক্তকারী কেবল নবী ও পয়গাম্বরই হতে পারেন। সুতরাং মাদয়ানের বুযুর্গ দুর্বল বৃদ্ধ হযরত শুআইব আ.-ই হতে পারেন।'

আমি তাঁকে আরজ করলাম, 'আপনার এই বক্তব্য যৌক্তিক প্রমাণের মর্যাদা রাখে না এবং কিতাবি প্রমাণের মর্যাদারও অধিকারী নয়। খুব বেশি হলে কেয়াস বা অনুমানের স্তরে স্থান দেয়া যেতে পারে। ত ছাড়া, মুসা আ. তখন নবী ছিলেন না। নবুওতের মর্যাদা তিনি পরে লাভ করেছিলেন।'[৩১]

যাইহোক। এটা একটা মীমাংসিত বিষয় যে, বুযুর্গ বৃদ্ধের নাম স্পষ্ট করে উল্লেখ করার ব্যাপারে প্রমাণের উপযুক্ত কোনে রেওয়ায়েত নেই। ইবনে

---

[৩০] جامع البيان عن تأويل آي القرآن, আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জারির আত-তাবারি, সুরা কাসাস।

[৩১] কাসাসুল আম্বিয়া, সাইয়িদ আবদুল ওয়াহ্হাব নাজ্জার মিসরি, পৃষ্ঠা ২০৪।

জারির আত-তাবারি এবং ইবনে কাসির রহ. 'শ্রমের মেয়াদ পূর্ণ করা' প্রসঙ্গে যেসব রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন, তার মধ্যে বায্‌যার ও ইবনে আবি হাতিম রহ.-এর দীর্ঘ রেওয়ায়েতগুলো ব্যতীত কোনো রেওয়ায়েতেই নাম উল্লেখ করা হয় নি। আর এ-দুটি রেওয়ায়েতের অতিরিক্ত শব্দগুলো সম্পর্কে ইবনে কাসির বলেন—

مدار هذا الحديث على عبد الله بن لَهِيعة المصري –وفي حفظه سوء –وأخشى أن يكون رفعه خطأ، والله أعلم.

'এই (নামের স্পষ্ট বর্ণনা-সম্পর্কিত) হাদিসটির সত্যতা আবদুল্লাহ বিন লুহাইয়া আল-মিসরির ওপর নির্ভরশীল। তাঁর স্মরণশক্তি ছিলো দুর্বল। আমি তো আশঙ্কা করি যে, এই হাদিসটিকে 'মারফু' বলা ভুল।'[৩২]

আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জারির আত-তাবারি বলেন—

ثم قد روي أيضاً نحوه من حديث عتبة بن النّدر بزيادة غريبة جداً

'তা ছাড়া উতবা বিন নযরের হাদিস থেকেও অত্যন্ত অপরিচিত (ও নিশ্চিত দুর্বল) অতিরিক্ত শব্দাবলির সঙ্গে অনুরূপ বর্ণনা করা হয়েছে।' (সেই অতিরিক্ত কথাটি হলো নামের স্পষ্টরূপে উল্লেখ-সম্পর্কি।)

প্রতিশ্রুত মেয়াদ পূর্ণ করা

মোটকথা, হযরত মুসা আ. তাঁর শ্বশুরালয়ে শ্রমের মেয়াদ পূর্ণ করার অর্থাৎ বকরি-ভেড়া চরানোর জন্য অবস্থান করলেন। মুফাস্‌সিরগণ নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েতগুলোর প্রতি লক্ষ করে বলেন, মুসা আ. পূর্ণ মেয়াদ দশ বছরেই সম্পন্ন করেছিলেন।

কুরআন মাজিদে এ-কথার উল্লেখ নেই যে, মেয়াদ শেষ করার পর কতদিন মুসা আ. শ্বশুরালয়ে অবস্থান করেছিলেন। অবশ্য মুফাস্‌সিরগণ এটা বলেন যে, মেয়াদ শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরেই মুসা আ. মিসরের দিকে রওয়ানা করেছিলেন। আর তিনি মিসরে চলে যাওয়ার বছর বকরি ও ভেড়াগুলো যে-পরিমাণ বাচ্চা প্রসব করেছিলো, তাঁর শ্বশুর বাচ্চাই

[৩২] তাফসিরুল কুরআনির আযিম, ইমাদুদ্দিন বিন কাসির, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫৭, সুরা কাসাস।

মুসা আ.-এর হাতে সোপর্দ করে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রী ও বকরির পাল নিয়ে মিসরের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।[৩৩]

মুফাস্সিরগণ সম্ভবত নিম্নলিখিত আয়াতের প্রতি লক্ষ করেই মেয়াদ শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরেই যাত্রা করার কথা বলেছেন।

فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا

'মুসা যখন তার মেয়াদ পূর্ণ করার পর সপরিবারে যাত্রা করলো, তখন সে তুর পর্বতের দিকে আগুন দেখতে পেলো।' [সুরা কাসাস : আয়াত ৩০]

এই মনীষীগণ কুরআনে মেয়াদ পূর্ণ করা এবং যাত্রা করার বর্ণনার নৈকট্যের প্রতি লক্ষ করেই অনুমান করে নিয়েছেন যে, মেয়াদ শেষ করার পরেই মুসা আ. মিসরের উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছিলেন। অথত কোনো ইঙ্গিত বা সংকেত পাওয়ার আগ পর্যন্ত واو সংযোজক অব্যয়টি 'পরের' অর্থও বোঝায় না এবং 'পর্যায়ক্রম'-এর অর্থও বোঝায় না।

معالم التنزيل কিতাবে রয়েছে, হযরত মুসা আ. শ্রমের মেয়াদ পূর্ণ করার পর আরো দশ বছর তাঁর শ্বশুরালয়ে অবস্থান করেছিলেন।[৩৪]

তাওরাতও এ-কথারই সমর্থন করছে যে, মুসা আ. মেয়াদ পূর্ণ করার পরপরই মিসরের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে যান নি। বরং একবার তিনি গবাদিপশু চরাতে চরাতে পথ ভুলে গিয়ে পবিত্র ওয়াদিতে (উপত্যকায়) পৌছলেন এবং আল্লাহ তাআলার আদেশপ্রাপ্ত হলেন যে, বনি ইসরাইলকে ফেরআউনের দাসত্ব থেকে স্বাধীন করো এবং মিসরে গিয়ে তাদেরকে ফেরআউনের উৎপীড়ন থেকে মুক্তি দেয়ার ব্যবস্থা করো, তখন তিনি মিসরের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। তাওরাতের বাক্যগুলো নিম্নরূপ :

"আর মুসা আ. তাঁর শ্বশুর মাদয়ানের জ্যোতিষী ইয়াসরুর বকরির পাল চরাতেন। তিনি বকরির পালকে চারণভূমির দিকে তাড়িয়ে দিয়ে আল্লাহর পাহাড় হুরাবের কাছে এলেন। তখন আল্লাহ তাআলার ফেরেশতা একটি ঝোপ থেকে আগুনের শিখার ভেতর থেকে তাঁর সামনে আত্মপ্রকাশ

---

[৩৩] معالم التنزيل, আবু মুহাম্মদ হুসাইন বিন মাসউদ আল-বাগাবি রহ., পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪৩।

[৩৪] প্রাগুক্ত।

করলেন। তিনি তাকিয়ে দেখলেন, বৃক্ষের একটি ঝাড় বা ঝোপ আলোয় আলোকিত হয়ে রয়েছে; কিন্তু পুড়ে যাচ্ছে না।... এখন দেখো, বনি ইসরাইলের আর্তনাদ তোমার কাছে এসে পৌছেছে। আর বনি ইসরাইলের ওপর মিসরীয়রা যে-নিপীড়ন চালাচ্ছে তা আমি দেখেছি। সুতরাং তুমি যাও, আমি তোমাকে ফেরআউনের কাছে পাঠাচ্ছি। আমার মানুষ বনি ইসরাইলকে মিসর থেকে বের করে আনো।"[৩৫]

তখন মুসা আ. ওখান থেকে ফিরে এসে তাঁর শ্বশুরের কাছে গেলেন। শ্বশুরকে বললেন, আমি আপনার কাছে মিনতি করছি, আমাকে বিদায় দিন, মিসরে আমার ভাইদের কাছে চলে যাই।"[৩৬]

উত্তম এই যে, প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ তাআলা ইলমের প্রতিই সোপর্দ করা হোক। একমাত্র আল্লাহই প্রকৃত অবস্থা ভালোভাবে অবগত আছেন। তারপরও কুরআন মাজিদে বর্ণনাশৈলী এদিকে ইঙ্গিত করছে যে, সাধারণ তাফসিরের কিতাবসমূহে সুরা তোয়া-হা ও সুরা কাসাসে উল্লেখ করা হয়েছে—

فلمّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِه

'মুসা যখন তার (শ্বশুরের সঙ্গে প্রতিশ্রুত) মেয়াদ পূর্ণ করার পর সপরিবারে যাত্রা করলো।' [সুরা কাসাস : আয়াত ৩০]

আয়াতটির তাফসিরে বলা হয়েছে যে, মুসা আ.-এর এই যাত্রা করা মিসরের উদ্দেশে ছিলো। খুব সম্ভব এই বক্তব্য সঠিক নয়। কেননা, মুসা আ. মিসরে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছায় রওয়ানা হয়ে থাকতেন তাহলে ওয়াদিয়ে মুকাদ্দাসে (পবিত্র উপত্যকায়) পৌছার পর যখন তাঁকে বলা হলো, "জালিম ফেরআউনের কাছে এবং তাকে বোঝাও" তখন মুসা আ. জবাবে এ-কথা বলতেন না—

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُون (سورة القصص)

'মুসা বললো, "হে আমার প্রতিপালক, আমি তো তাদের (ফেরআউনের সম্প্রদায়ের) একজনকে হত্যা করেছি। ফলে আমি আশঙ্কা করছি (আমি মিসরে গেলে) তারা আমাকে হত্যা করে ফেলবে।"' [সুরা কাসাস : আয়াত ৩৩]

---

[৩৫] তাওরাত : আত্মপ্রকাশ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৩, আয়াত ১-১০।

[৩৬] তাওরাত : আত্মপ্রকাশ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৪, আয়াত ১৮।

وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (سورة الشعراء)

"আমার বিরুদ্ধে তো তাদের (মিসরীয়দের) এক অভিযোগ আছে (যে, আমি তাদের একজনকে হত্যা করেছি), আমি আশঙ্কা তারা আমাকে হত্যা করবে।" [সূরা শুআরা : আয়াত ১৪]

হযরত মুসা আ.-এর এই জবাবটি নিজেই বলছে যে, এই কথোপকথনের সময় হত্যার ঘটনাটির কারণে মুসা আ.-এর মিসরে যাওয়ার সাহস ছিলো না। অবশ্য যখন আল্লাহর অনুগ্রহ ও দান তাঁকে নবুওত ও রিসালাতের সম্মানে ভূষিত করলো, তখনে মিসরে ফিরে যাওয়ার আদেশপ্রাপ্ত হয়ে মুসা আ. আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর অন্তরকে নিশ্চিত করে নিয়ে ওখান থেকেই মিসরের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে গেলেন। আল্লাহপাকের আদেশের সামনে শ্বশুরের কাছে গিয়ে অনুমতি গ্রহণেরও পরোয়া করলেন না।

যাইহোক। হযরত মুসা আ. মাদয়ানে এক দীর্ঘকাল অবস্থান করলেন। এই পুরো সময়ে তিনি তাঁর শ্বশুরের পশুপাল চরালেন। তাওরাতে বর্ণিত আছে যে, শ্বশুরালয়ে অবস্থানের সময় হযরত মুসা আ.-এর একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলো। তিনি এর নাম রেখেছিলেন 'জিরাসুন'। মাদয়ানি ইবরানি ভাষায় এই শব্দের অর্থ 'ভ্রমণ ও সফর'। মুসা আ. যেনো পুত্রের নামের মধ্যে তাঁর সফরকে স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত করে দিলেন। যাতে তাঁর বংশধরদের এ-কথা মনে থাকে যে, ছেলেটির জন্ম হয়েছিলো ভিনদেশে ও সফরের অবস্থায়। তাওরাতের ইবারত নিম্নরূপ :

"আর মুসাকে নিজ কন্যা সাফুরাকে দান করলেন। সাফুরা এক পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। তিনি তার নাম রাখলেন জিরাসুন। কারণ, তিনি বললেন, আমি বিদেশে মুসাফির অবস্থায় রয়েছি।"[৩৭]

ওয়াদিয়ে মুকাদ্দাস বা পবিত্র উপত্যকা

একদিন হযরত মুসা আ. তাঁর পরিবারবর্গসহ বকরি-ভেড়া চরাতে চরাতে মাদয়ান থেকে অনেক দূরে চলে গেলেন। বকরিচারক গোত্রসমূহের জন্য এটা কোনো বিচিত্র ব্যাপার নয়। তখন ছিলো শীতের রাত। শীতের আধিক্য তাঁকে আগুন অন্বেষণে বাধ্য করলো। সামনে তুরে-সাইনা

[৩৭] তাওরাত : আত্মপ্রকাশ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ২, আয়াত ২১-২২।

পর্বতশ্রেণি দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলো। এটা ছিলো সাইনা পর্বতের পূর্ব কোণ। মাদয়ান থেকে একদিনের দূরত্বে লোহিত সাগরের দুটি শাখার মধ্যস্থলে মিসরে যাওয়ার পথের ওপর অবস্থিত। হযরত মুসা আ. চকমক পাথর দিয়ে আগুন ধরানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু অত্যধিক শীতের কারণে তাতে আগুন ধরলো না। সামনে ওয়াদির (ওয়াদিয়ে আইমান) দিকে তাকালেন। দেখতে পেলেন, একটি আগুনের শিখা আলো ছড়াচ্ছে। তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন, তোমরা এখানেই অপেক্ষা করো। আমি আগুন নিয়ে আসছি। আগুন পোহানোর কাজও চলবে আর ওখানে কোনো পথপ্রদর্শকের সাক্ষাৎ পেলে ভুলা-পথের সন্ধানও পাওয়া যাবে।

ঘটনার এই অংশ কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এভাবে—

إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى (سورة طه)

'সে যখন আগুন[৩৮] দেখলো, তখন তার পরিবারবর্গকে বললো, "তোমরা এখানে থাকো, আমি আগুন দেখেছি। সম্ভবত আমি তোমাদের জন্য তা থেকে কিছু জ্বলন্ত অঙ্গার আনতে পারবো অথবা আমি আগুনের কাছে কোনো পথনির্দেশ পাবো।"' [সুরা তোয়া-হা : আয়াত ১০]

নবুওত লাভ

خدا کے فضل کا موسیٰ سے پوچھئے احوال

کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائیں

'আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহের অবস্থা মুসাকে জিজ্ঞেস করুন।
তিনি আগুন আনার জন্য গিয়ে নবুওত লাভ করেন।'

হযরত মুসা আ. দেখলেন এ তো এক বিচিত্র রকমের আগুন; গাছের গায়ে আলো দেখা যায়; কিন্তু তা গাছকে পোড়ায় না আবার নিভেও যায় না। এসব ভাবতে ভাবতে তিনি সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু

[৩৮] মুসা আ. স্ত্রীসহ মাদয়ান থেকে মিসর যাচ্ছিলেন। পথে রাত হয়। শীতে তাদের কষ্ট হচ্ছিলো। তখন তিনি আগুন দেখলেন। প্রকৃতপক্ষে তা ছিলো আল্লাহর তাজাল্লি।

তিনি যতই এগিয়ে যান, আগুন আরও দূরে সরে যায়। এই অবস্থা দেখে মুসা আ.-এর অন্তরে আতঙ্কের ভাব সৃষ্টি হলো। তিনি ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন। যখনই তিনি পেছনে ফিরে যেতে উদ্যত হলেন তখনই আগুন কাছে এসে পড়লো। আগুন কাছে এলে তিনি এই আওয়াজ শুনতে পেলেন—

يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (سورة القصص)

"হে মুসা, আমি আল্লাহ, বিশ্বজগতের প্রতিপালক।"

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى () إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى () وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى (سورة طه)

'এরপর যখন সে আগুনের কাছে এলো, তখন আহ্বান করে বলা হলো, "হে মুসা আমিই তোমার প্রতিপালক, অতএব তোমার পাদুকা খুলে ফেলো, কারণ তুমি পবিত্র 'তুওয়া' উপত্যকায় রয়েছো। এবং আমি তোমাকে মনোনীত করেছি। সুতরাং যা ওহি প্রেরণ করা হচ্ছে তুমি তা মনোযোগের সঙ্গে শোনো।"' [সুরা তোয়া-হা : আয়াত ১১-১৩]

কুরআন মাজিদের পূর্ববর্তী আয়াত এবং এই আয়াতগুলোর প্রতি লক্ষ করে তাফসিরের কিতাবমূহে দুটি বিষয় আলোচনাধীন এসেছে :

এক.

হযরত মুসা আ. যে-বস্তুটিকে আগুন মনে করেছিলেন তা আগুন ছিলো না। বরং তা ছিলো আল্লাহ তাআলার তাজাল্লির নুর। কিন্তু এই নুরের পর্দার অন্তরাল থেকে যে-আওয়াজ শুনা গিয়েছিলো তা ছিলো ফেরেশতার আওয়াজ। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মুসা আ.-কে (সরাসরি) কথোপকথনের মর্যাদা দান করেছিলেন। অথবা তা আল্লাহ তাআলারই সম্বোধন ছিলো। কোনো কোনো মুফাস্সির বলেন, এটা ফেরেশতার আওয়াজ ছিলো। এর মাধ্যমে মুসা আ. আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কথোপকথনের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। এটা আল্লাহ তাআলার আওয়াজ ছিলো না। কেননা, তাঁর কথার সুরও নেই, স্বরও নেই।

আর তত্ত্বজ্ঞানীদের মতে, এটা সরাসরি আল্লাহ তাআলারই সম্বোধন ছিলো। মুসা আ. এই আওয়াজকে অন্যকিছুর মাধ্যমে শোনেন নি; বরং তিনি তেমনই শুনেছেন যেমন আল্লাহর নবীগণ আল্লাহর ওহি শুনে

থাকেন এবং مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ 'পর্দার অন্তরাল থেকে' আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কথোপকথনের মর্যাদা লাভ করে থাকেন।

দুই.

ওয়াদিয়ে মুকাদ্দাসে মুসা আ.-কে জুতা খুলে ফেলার আদেশ করা হয়েছিলো। অথচ সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁরা সাহাবিগণ রা. পায়ে জুতাসহ মসজিদে নামায আদায় করতেন। আজ তাঁর উম্মতের জন্যও এটাই ইসলামি বিধান যে, জুতা পবিত্র হলে তা পায়ে রেখেই বিনা দ্বিধায় মসজিদে নামায পড়া যেতে পারে। তবে এখানে মুসা আ.-কে কেনো নির্দেশ দেয়া হলো যে, এটা পবিত্র উপত্যকা, সুতরাং তোমারা জুতা খুলে ফেলো। এই জিজ্ঞাসার জবাব সহিহ হাদিসে রয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কারণ বিশ্লেষণ করে বলেছেন—

قَالَ : يَوْمَ كَلَّمَ اللهُ مُوسَى كَانَتْ عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ ، وَكِسَاءُ صُوفٍ ، وَسَرَاوِيلُ صُوفٍ، وَكُمَّةُ صُوفٍ ، وَنِعَالٌ مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ غَيْرِ ذَكِيٍّ.

'হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "আল্লাহ তাআলা যেদিন মুসা আ.-এর সঙ্গে কথা বলেছিলেন, সেদিন তাঁর পরনে ছিলো পশমি জুব্বা, পশমি চাদর, পশমি চাদর, পশমি পায়জামা এবং পশমি টুপি। তাঁর জুতাজোড়া ছিলো মৃত গাধার দাবাগতহীন চামড়ার তৈরি।"'[৩৯]

যাইহোক। এখন হযরত মুসা আ. আল্লাহ তাআলার নবী এবং সম্মানিত রাসুল। আল্লাহপাক তাঁকে নবীগণের সত্য দীনের দীক্ষা এবং ফেরআউনের দাসত্ব বনি ইসরাইলকে মুক্ত করার গুরুত্বপূর্ণ খেদমতের জন্য মনোনীত করেছেন। এখন তিনি পবিত্র উপত্যকায় আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সরাসরি কথোপকথনের মর্যাদা লাভ করছেন। যে-মুসা আ. মাদয়ানের রাস্তা থেকে পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন সেই মুসা আ.-কে মিসরের মতো সভ্যতা ও সংস্কৃতির দেশে ফেরআউনের মতো অহঙ্কারী বাদশাহকে দীনের পথপ্রদর্শনের জন্য মনোনীত করা হয়েছে। আর যিনি

[৩৯] সুনানুত তিরমিযি : হাদিস ১৭৩৪; মুসনাদে আবি ইয়ালা, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭; কানযুল উম্মাল : হাদিস ৩২৩৮০। উদ্ধৃত ভাষ্য মুসনাদে আবি ইয়ালা থেকে।

গতকাল পর্যন্তও উট ও বকরির পালের রাখালগিরি করছিলেন, আজ তাঁকে মানুষের নেতৃত্ব প্রদানের দায়িত্ব পালনের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। আর যে-জীবনের মূলধন গতকাল বকরি-ভেড়ার রাখালগিরি থেকে শুরু হয়েছিলো, তা আজ পবিত্র উপত্যকায় আল্লাহ তাআলার সর্বশ্রেষ্ঠ মাখলুক মানবজাতির রাখালগিরিতে উন্নীত পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে। আর গতকালের বকরিপালের রাখাল আজ পৃথিবীর পরিচালক হচ্ছেন।

এটাই আল্লাহ তাআলার অসীম কুদরতের অপার মহিমা যা মুখে অস্বীকারকারীদের অন্তরেও স্বীকৃতির কাঁটা বিঁধিয়ে দেয়। কোথায় যাযাবর রাখাল আর কোথায় সভ্য ও শহুরে রাজত্বের জন্য আল্লাহ তাআলার সত্যের পয়গামবাহী।

হযরত মুসা আ. যখন আল্লাহ তাআলার এই আওয়াজ শুনলেন এবং বুঝতে পারলেন যে, আর তাঁর ভাগ্যে এমন এক মহামূল্যবান সম্পদ জুটে গেছে যা মানবজাতির শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং আল্লাহপাকের দানের চূড়ান্ত ও শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন, তখন তিনি যারপরনেই আনন্দিত ও পুলকিত হয়ে উঠলেন। আশেকের মতো আত্মবিমোহিত হয়ে অস্থির অবস্থায় মূর্তির মতো দাঁড়িয়েছিলেন। অবশেষে আল্লাহর পক্ষ থেকে পুনরায় কথোপকথন শুরু হলো এবং মুসা আ.-কে জিজ্ঞেস করা হলো—

مَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى (سورة طه)

"হে মুসা, তোমার ডান হাতে ওটা কী?" [সুরা তোয়া-হা : আয়াত ১৭]

ব্যস্, আর কী! প্রকৃত মাহবুব ও প্রেমাস্পদের প্রশ্ন সত্যিকারের আশেক ও প্রেমিককে! আল্লাহু আকবার! এত বড় সৌভাগ্য! লুটিয়ে পড়ার ক্ষেত্র। ইশকের মোহে আত্মবিমোহিত, এটাও মনে থাকলো না যে, প্রশ্নের পাল্লা দিয়েই উত্তরকে ওজন করে নিতে হয় এবং যা-কিছু জিজ্ঞেস করা হয় কেবল তারই জবাব দিতে হয়। তিনি জবাব দিলেন—

قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي (سورة طه)

"এটা আমার লাঠি; আমি এতে ভর দিই এবং এর দ্বারা আঘাত করে আমি আমার মেষপালের জন্য বৃক্ষপত্র ফেলে থাকি।" [সুরা তোয়া-হা : আয়াত ১৮]

জবাবে শুধু 'লাঠি' শব্দটুকুই বলা উচিত ছিলো। কিন্তু ভালোবাসার আবেগ ও মুহাব্বতের ইশককে কেমন করে থামিয়ে রাখতে পারেন, যিনি

মাহবুব ও প্রেমাস্পদের সঙ্গে কথোপকথনের সৌভাগ্যকে দীর্ঘতর করে দগ্ধ প্রাণ শীতল করার উপকরণ সংগ্রহ করতে আকাঙ্ক্ষী? বললেন, এটা আমার লাঠি। তারপর আবার লাঠির উপকারিতা বর্ণনা করতে শুরু করলেন। কিন্তু হঠাৎ ভালোবাসার আবেগের স্থলে প্রকৃত মাহবুবের আদব রক্ষার চিন্তা মনের ভেতর চিমটি কেটে ওঠে। নিজেকে নিজেই বলেন, মুসা, খবরদার, কোন্ দরবারে দাঁড়িয়ে আছো, পাছে তোমার বর্ণনার দীর্ঘসূত্রতা দৃষ্টতা ও বেয়াদবির মধ্যে গণ্য না হয়।' মুসা আ. এসব ভেবে তৎক্ষণাৎ কথার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন এবং আল্লাহ তাআলার দরবারে আরজ করলেন—

وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ

"এবং তা আমার অন্যান্য কাজেও লাগে।" [সুরা তোয়া-হা : আয়াত ১৮]

হে প্রতিপালক, হৃদয়ের আবেগ ও প্রাণের অস্থিরতা তো এটাই চায় যে, আরো অনেক কিছু বলতে থাকি এবং এই অসীম আনন্দ ও স্বাদ অনুভব করতে থাকি; কিন্তু আদব রক্ষার চিন্তা আমাকে বিরত রাখছে। সূক্ষ্মদর্শী চোখে নির্দেশ দিচ্ছে যেনো আমি নীরবতা অবলম্বন করি। সুতরাং কথা সংক্ষেপ করছি। অন্যথায় ইশকের কাহিনি তো অফুরন্ত।

কবি বলেন—

عشق کہتا ہے جنوں کا جوش رہنا چاہئے

ضبط کی تاکید ہے خاموش رہنا چاہئے

قصۂ موسیٰ! سبق ہے ہوش والوں کیلئے

کس طرح عشاق کو خاموش رہنا چاہئے

'ইশক বলে, উন্মাদনার আবেগ থাকা উচিত। সংযমের তাকিদ হলো নীরব থাকা বাঞ্ছনীয়। মুসার কাহিনি একটি শিক্ষণীয় পাঠ জ্ঞানীদের জন্য; অর্থাৎ কীভাবে আশেকদের পক্ষে নীরবতা অবলম্বন করা উচিত।'

মুজেযা

তখন আল্লাহপাক বললেন, أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ "হে মুসা, তুমি তা নিক্ষেপ করো।" [সুরা তোয়া-হা : আয়াত ১৯]

সঙ্গে সঙ্গে মুসা আ. মহান আদেশটি পালন করলেন—

فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى

"তখন সে তা নিক্ষেপ করলো, সঙ্গে সঙ্গে তা (অজগর) সাপ হয়ে ছুটতে শুরু করলো।" [সুরা তোয়া-হা : আয়াত ২০]

হযরত মুসা আ. এই বিস্ময়কর কাণ্ড দেখে ভীত ও আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন এবং মানবিক স্বভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পলায়ন করতে উদ্যত হলেন। পিঠ ফিরিয়ে নিয়ে পলায়নপর হতেই আওয়াজ এলো—

قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى

আল্লাহ বললেন, "তুমি ওটাকে ধরো এবং ভয় করো না, আমি ওটাকে তার পূর্বরূপে (আসল আকৃতিতে) ফিরিয়ে দেবো।" [সুরা তোয়া-হা : আয়াত ২১]

হযরত মুসা আ.-এর লাঠিটি দুই শাখাবিশিষ্ট ছিলো। তখন এই দুটি শাখাই অজগরের মুখ বলে মনে হচ্ছিলো। তিনি অত্যন্ত অস্থির ছিলেন। কিন্তু আল্লাহপাকের সান্নিধ্য প্রশান্তি ও নিশ্চিন্ততার অবস্থা সৃষ্টি করে দিলো। তিনি নির্ভীক হয়ে অজগরের মুখে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। হাত ঢুকিয়ে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা পুনরায় দুই শাখাবিশিষ্ট লাঠি হয়ে গেলো।

এখন মুসা আ.-কে পুনরায় সম্বোধন করে নির্দেশ দেয়া হলো, তোমার হাত তোমার জামার বুকের দিকে যে-উন্মুক্ত অংশ আছে তার ভেতরে প্রবেশ করাও এবং বগলের সঙ্গে চেপে ধরো। তারপর দেখো, তা রোগ-ব্যাধিমুক্ত নিষ্কলুষ ও দীপ্তিমান হয়ে বের হয়ে আসবে। (এটি হলো দ্বিতীয় নিদর্শন।) যেমন : পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে—

وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى

"এবং তোমার হাত তোমার বগলে রাখো, তা বের হয়ে আসবে নির্মল উজ্জ্বল হয়ে (রোগ-ব্যাধি যেমন শ্বেত-কুষ্ঠ ইত্যাদি থেকে মুক্ত) অপর এক নিদর্শনস্বরূপ।" [সুরা তোয়া-হা : আয়াত ২২]

হে মুসা, এগুলো হলো আমার পক্ষ থেকে তোমার নবুওত ও রিসালাতের দুটি বড় নিদর্শন। এগুলো তোমার সত্য প্রচারে এবং সত্যের পক্ষে দলিল-প্রমাণ প্রদানে প্রবল সহায়তা করবে। সুতরাং, যেভাবে আমি তোমাকে নবুওত ও রেসালাত দান করলাম, তেমনিভাবে তোমাকে এ-দুটি মর্যাদাসম্পন্ন মুজেযাও দান করলাম।

لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى

“তা এইজন্য যে, আমি তোমাকে (চাক্ষুষভাবে) দেখাবো আমার মহানিদর্শনগুলোর কিছু।” [সুরা তোয়া-হা : আয়াত ২৩]

فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ

‘এই দুটি তোমার প্রতিপালকের প্রদত্ত প্রমাণ, ফেরআউন ও তার পারিষদবর্গের জন্য (তাদের মোকাবিলায়)। তারা তো সত্যত্যাগী (ও নাফরমান) সম্প্রদায়।’ [সুরা কাসাস : আয়াত ৩২]

হে মুসা, এখন তুমি যাও এবং ফেরআউন ও তার সম্প্রদায়কে সত্য ও হেদায়েতের পথ দেখাও। তারা বড়ই অবাধ্যতা ও নাফরমানির ভেতর নিমজ্জিত রয়েছে। তারা গর্ব ও অহঙ্কার এবং চরম অত্যাচার ও নিপীড়নের সঙ্গে বনি ইসরাইলকে দাস বানিয়ে রেখেছে। সুতরাং তাদেরকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করো।

হযরত মুসা আ. আল্লাহপাকের দরবারে আরজ করলেন, হে আমার প্রতিপালক, আমার হাতে এক মিসরীয় নিহত হয়েছে। এই কারণে আমার আশঙ্কা হয় যে, তারাও আমাকে হত্যা করে ফেলবে। এটাও আমার ধারণা যে, তারা প্রবলভাবে আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে এবং আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করবে। নবুওত ও রিসালাতের উচ্চ মর্যাদা যখন আপনি আমাকে দান করেছেন তখন আপনি আমার বক্ষকে প্রশস্ত করে দিন এবং নুরের দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিন। আর মহাগুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বকে আমার জন্য সহজ করে দিন। আর আমার জিহ্বায় যে-জড়তা রয়েছে তা দূর করে দিন। যাতে লোকেরা আমার কথা সহজে বুঝতে পারে। আমার কথা অনর্গল ও স্পষ্ট নয়। (বরং তোতলামির কারণে আমার কথা ঠেকে ঠেকে ও আটকে যায়।। আর আমার তুলনায় আমার ভাই হারুন অধিক বিশুদ্ধ ও অনর্গলভাষী। সুতরাং তাঁকেও আপনার এই নবুওতের নেয়ামত দান করুন এবং আমার দায়িত্বের অংশীদার বানিয়ে দিন।

আল্লাহ তাআলা মুসা আ.-কে নিশ্চিন্ত করলেন এবং বললেন, তুমি আমার পয়গাম নিয়ে অবশ্যই যাও এবং তাদেরকে সত্যের পথ প্রদর্শন করো। তারা তোমার কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না। আমার সাহায্য তোমার সঙ্গে রয়েছে। আর যেসব নিদর্শন আমি তোমাকে দান করেছি তা তোমার সফলতার কারণ হবে এবং শেষ পর্যন্ত তুমিই জয়ী হবে। আমি তোমার দরখাস্ত মঞ্জুর করে নিচ্ছি। তোমার ভাই হারুনকেও তোমার

কাজের অংশীদার করে দিচ্ছি। দেখো, তোমরা উভয়ে যখন ফেরআউন ও তার পারিষদবর্গ এবং সম্প্রদায়কে আমার সত্য ও সঠিক পথের দিকে আহ্বান করবে, তখন সত্যের পয়গাম প্রচারকালে নম্র-কোমল ও মধুর ভাষা ব্যবহার করবে। বিচিত্র নয় যে, তারা তোমার নসিহত কবুল করে নেবে এবং আল্লাহকে ভয় করে জুলুম ও অত্যাচার থেকে বিরত হয়ে যাবে।

মিসরে প্রবেশ

ইসমাইল আস-সুদ্দি বলেন, হযরত মুসা আ. নবুওত ও রিসালাতের পদ লাভ করলেন, আল্লাহপাকের কথোপকথনের বরকতপ্রাপ্ত হলেন, দীন প্রচার ও দাওয়াতে সফলতা লাভের সুসংবাদ শুনলেন। তারপর তিনি পবিত্র উপত্যকা থেকে অবতরণ করে তাঁর স্ত্রীর কাছে এলেন। তাঁর স্ত্রী পবিত্র উপত্যকারই সামনে মরুভূমির মধ্যে অপেক্ষা করছিলেন এবং স্বামীর প্রতীক্ষায় পথপানে তাকিয়েছিলেন। হযরত মুসা আ. স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ওখান থেকে আল্লাহ তাআলার নির্দেশ পালনের উদ্দেশ্যে মিসরের অভিমুখে যাত্রা করলেন। মঞ্জিলসমূহ অতিক্রম করে যখন মিসরে পৌঁছলেন তখন রাত হয়ে গিয়েছিলো। চুপি চুপি মিসরে প্রবেশ করে নিজেদের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলেন। কিন্তু ঘরের ভেতরে প্রবেশ করলেন না। মায়ের কাছে গিয়ে একজন মুসাফিরের মতো আত্মপ্রকাশ করলেন। বনি ইসরাইল গোত্রের মধ্যে এই পরিবার ছিলো মেহমানের সমাদর ও আপ্যায়নকারী। হযরত মুসা আ.-কে খুব সমাদর ও আপ্যায়ন করা হলো। ইতোমধ্যে তাঁর বড়ভাই হারুন আ. ঘরে এসে পৌঁছলেন। ঘরে পৌঁছার আগেই হযরত হারুন আ. আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুওত ও রিসালাতের পদ লাভ করেছিলেন। তাঁকে ওহির মাধ্যমে মুসা আ.-এর যাবতীয় ঘটনা জানিয়ে দেয়া হয়েছিলো। তিনি ঘরে এসেই ভাইয়ের সঙ্গে আলিঙ্গন করলেন এবং মুসা আ.-এর পরিবারবর্গকে ঘরের ভেতরে নিয়ে গেলেন। মাকে যাবতীয় ঘটনা বর্ণনা করে শুনালেন। তখন পরিবারের সবাই পরস্পর আলিঙ্গন করলেন। বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া

ভাইয়েরা তাঁদের অতীত জীবনের ঘটনাবলি জানলেন। মায়ের চোখজোড়া শীতল হলো।[৪০]

তাওরাত এই ঘটনাকে নিম্নরূপে বর্ণনা করেছে :

"আর আল্লাহ তাআলা হারুনকে বললেন, মাঠে গিয়ে সাক্ষাৎ করো। তিনি গমন করলেন। আল্লাহর পাহাড়ের ওপর তাঁর সাক্ষাৎ পেলেন। তাঁকে চুম্বন করলেন। আর মুসা আ. আল্লাহ তাআলার—যিনি তাঁকে নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন—সব কথা হারুন আ.-কে বর্ণনা করে শোনালেন।"[৪১]

আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন

হযরত মুসা আ. ওয়াদিয়ে মুকাদ্দাস বা পবিত্র উপত্যকায় আল্লাহ তাআলার কাছে আরজ করেছিলেন, "হে আল্লাহ, আমার জিহ্বায় যে-জড়তা রয়েছে তা দূর করে দিন। আর আমার হারুন আমার চেয়ে বিশুদ্ধ ও মার্জিতভাষী।" মুফাস্‌সিরগণ 'জিহ্বার জড়তা' সম্পর্কে একটি ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন। তার সারমর্ম এই : হযরত মুসা আ. শৈশবকালে একবার ফেরআউনের কোলে বসেছিলেন। ফেরআউনের দাড়ি হিরা-জহরত ও মণি-মাণিক্য দিয়ে সাজানো ছিলো। শিশুদের অভ্যাসমতো মুসা আ. ফেরআউনের দাড়ি ধরে নাড়াচাড় করছিলেন। ফলে উজ্জ্বল মুক্তগুলোর সঙ্গে দাড়ির কয়েকটি চুলও ছিঁড়ে এসেছিলো। ফেরআউন এতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে মুসা আ.-কে হত্যা করতে চাইলো। ফেরআউনের স্ত্রী আসিয়া স্বামীর এই অবস্থা দেখে কাকুতি-মিনতির সঙ্গে আবেদন করলেন, এ তো শিশু, একে হত্যা করো না। এই শিশু সম্মানের কী বোঝে? এর কাছে খেজুর ও আগুনের জ্বলন্ত কয়লা উভয়ই সমান। রাজহট্ (রাজাদের জেদ অটল থাকে) বলে একটি অতি পুরনো প্রবাদ বাক্য আছে। ফেরআউন বললো, আমি এখনই এর পরীক্ষা করে দেখছি। যদি সে আগুনের কয়লা দেখে হাত গুটিয়ে নেয় তবে আমি সঙ্গে সঙ্গে তাকে হত্যা করে ফেলবো। আল্লাহ তাআলা মুসা আ.-কে

---

[৪০] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইমাদুদ্দিন বিন কাসির আল-কুরাশি, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫২।

[৪১] তাওরাত : আত্মপ্রকাশ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৪; আয়াত ২৭-২৮।

কাজে লাগাবেন। তাই তাঁকে রক্ষা করার দায়িত্বগ্রহণেরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ফেরআউন যখন কয়েকটি খেজুরের বিচি এবং জ্বলন্ত আগুনের লাল কয়লা এনে মুসা আ.-এর সামনে রাখলো, তিনি হাত বাড়িয়ে একটি লাল কয়লা তুলে নিয়ে মুখে পুরে ফেললেন। মাত্র এক সেকেন্ডের কাজ। যা হওয়ার তা হয়ে গেলো। তাঁর জিহ্বায় দাগ পড়ে গেলো এবং জিহ্বা মোটা হয়ে গেলো। তখন থেকেই মুসা আ. জিহ্বায় তোতলামি এসে গেলো এবং অনর্গল কথা বলার মধ্যে বাধার সৃষ্টি হতে লাগলো। তাই মুসা আ. ওয়াদিয়ে মুকাদ্দাসে আল্লাহ তাআলার কাছে এই জড়তার কথা উল্লেখ করলেন।[৪২]

কিন্তু সাধারণ মুফাস্‌সিরগণের বর্ণিত এই ঘটনা থেকে ভিন্ন আবদুল ওয়াহ্‌হাব নাজ্জার তাঁর অনুমানভিত্তিক স্বতন্ত্র মত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, আমি এই ঘটনাকে সঠিক মনে করি না। আমার ধারণা, মুসা আ.-এর অস্পষ্ট বয়ান ও কথাবার্তায় জড়তা ও বাধা সৃষ্টি হওয়া নিম্নবর্ণিত দুটি কারণের কোনো একটি কারণে হতে পারে :

এক. কুরআন মাজিদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুসা আ.-কে যখন নীল নদ থেকে উঠিয়ে রাজাপ্রাসাদে আনা হলো তখন তাঁকে দুধ পান করানোর জন্য ধাত্রীর চিন্তাভাবনা করা হলো। শহরের কয়েকজন বুড়ি ধাত্রী এলো; কিন্তু মুসা আ. কারো স্তনে মুখ লাগালেন না। সুতরাং এই ধাত্রী নির্ধারণের ঘটনায় নিশ্চয়ই কিছু সময় লেগে থাকবে এবং মুসা আ. এ-সময় স্তনদুগ্ধ থেকে বঞ্চিত ছিলেন। অভিজ্ঞতার দ্বারা জানা গেছে যে, এমন অবস্থায় শিশুর জিহ্বা মোটা হয়ে যায় এবং কথা বলতে জড়তার রোগ সৃষ্টি হয়। হযরত মুসা আ.-এর ক্ষেত্রে এই অবস্থাই ঘটে থাকবে।

দুই. হযরত মুসা আ. যৌবনের প্রাথমিক অবস্থায়ই মাদয়ানে চলে গিয়েছিলেন এবং এক দীর্ঘকাল পর্যন্ত ওখানে অবস্থান করেছিলেন। মাআলমিুত তানযিল ও তাওরাতের রেওয়ায়েতগুলোক বিশুদ্ধ মেনে নিলে মাদয়ানে হযরত মুসা আ.-এর অবস্থানকাল বিশ বছর বা তারও চেয়ে বেশি হয়। এ-পরিস্থিতিতে এটা স্বাভাবিক কথা যে, তিনি মিসরীয় ভাষার সঙ্গে একটি সীমা পর্যন্ত অপরিচিত ও অনভিজ্ঞ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি

---

[৪২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইমাদুদ্দিন বিন কাসির আল-কুরাশি, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৪৯।

মিসরীয় ভাষায় বাক্যালাপ ও বক্তৃতা করার স্থায়ী শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। এ-অবস্থাকে তিনি 'জিহ্বার জড়তা' বলেছেন। পক্ষান্তরে হারুন আ. সম্পর্কে বলেছেন, هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا 'আমার ভাই হারুন আমার অপেক্ষা বাগ্মী।'[৪৩] কেননা, হারুন আ. সবসময় মিসরেই ছিলেন। তাঁর জবান মিসরীয় ভাষায় খুব চালু ছিলো।

এই দ্বিতীয় কারণটিতে অবশ্য এ-ধরনের প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, এই কারণটিকে যদি মেনে নেয়া হয়, তবে মুসা আ. হারুন আ.-এর সঙ্গে অনর্গলভাবে কথা বলতে কীভাবে সক্ষম হয়েছিলেন, যখন হারুন আ. কখনো মিসরের বাইরে গমন করেন নি? তিনি কেবল মিসরীয় ভাষাতেই কথা বলতে পারতেন। এই প্রশ্নের জবাব এই যে, হযরত হারুন আ. মিসরীয় ও ইবরানি উভয় ভাষাতেই খুব শিক্ষিত ও পারদর্শী ছিলেন। মিসরীয় ভাষা তাঁর দেশীয় ভাষা আর ইবরানি ছিলো তাঁর মাতৃভাষা। বহু শতাব্দী অতীত হওয়ার পরও বনি ইসরাইল ইবরানি ভাষা ভোলে নি, সংরক্ষিত রেখেছিলো। নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক কথাবার্তা ও লেখাপড়ায় ইবরানি ভাষাই ব্যবহার করতো। আর ইবরানি ও মাদয়ানি ভাষায় তেমন বেশি কোনো পার্থক্যও নেই। কারণ, দুটি ভাষাই তাঁদের উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ হযরত ইবরাহিম আ.-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলো।

এই দুটি কারণ উল্লেখ করার পর আবদুল ওয়াহ্হাব নাজ্জার বলেন, আমার মনের ঝোঁক প্রথম কারণটিকে দিকে। প্রথম কারণটিকেই আমি প্রবল বলে মনে করি।[৪৪]

কিন্তু আমার (গ্রন্থকার) কাছে তো প্রথম কারণটি কোনোভাবেই যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় না। কারণ, ধাত্রী অনুসন্ধানের কাজটির কথা কুরআন মাজিদে ও সহিহ হাদিসসমূহে তো অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করা হয়েছে। আর তার যে-ব্যাখ্যা তাওরাত ও ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতসমূহ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে, তা থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, ধাত্রী খোঁজার বিষয়টি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সমাধান হয়ে গিয়েছিলো; মুসা আ.-এর মাকে আনা হয়েছিলো তাঁকে দুধ পান করানোর জন্য।

---

[৪৩] সুরা কাসাস : আয়াত ৩৪

[৪৪] কাসাসুল আম্বিয়া, আবদুল ওয়াহ্হাব নাজ্জার মিসরি, পৃষ্ঠা ২০৮-২০৯।

আর বাদশাহর আদেশ জারি হওয়ার পর একটি শিশুকে দুধ পান করানোর ব্যাপারে কেমন করে কয়েকদিন বিলম্ব হতে পারে?

দ্বিতীয় কারণটিও বেশি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, এই কারণের ব্যাখ্যা অনুসারে হযরত হারুন আ.-এর সম্পর্কে তো هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا 'আমার ভাই হারুন আমার অপেক্ষা বাগ্মী' কথাটি বুঝে আসতে পারে; কিন্তু মিসরীয় ভাষা ভুলে যাওয়াকে عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي 'আমার জিহ্বার জড়তা' বলা কোনোভাবেই ঠিক নয়। যদি তা ঠিকই হয়, তবে তাঁর দোয়া তো আল্লাহ তাআলা কবুল করেছেন, এরপর আর ভুলে যাওয়ার অর্থ কী?

বরং পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন কথা এই যে, হযরত মুসা আ. এ-অবস্থায়ই জন্মগ্রহণ করেছিলেন যে, তাঁর জিহ্বায় তোতলামি ছিলো এবং কথাবার্তা বলতে জড়তার সৃষ্টি হতো। আর হযরত হারুন আ. বাগ্মী ও বিশুদ্ধভাষী ছিলেন। এজন্য হযরত মুসা আ. নিজের জন্য শুধু এতটুকু দোয়া করলেন যে, জিহ্বার এই জড়তা এবং তার তোতলামি যেনো এত কঠিন না থাকে। যাতে কথা বলতে অপারগ হয়ে পড়তে হয়। যদি জন্মগত জড়তা দূর না-ই হয়, তবে অন্তত এতটুকু আকাঙ্ক্ষা যে, শোতৃমণ্ডলী যেনো আমার কথা ভালোভাবে বুঝতে পারে। আর বিশুদ্ধ ভাষা ও চালু কথার জন্য আমার আশা এই যে, আমার ভাই হারুনকে আমার বাহুশক্তি অর্থাৎ আমার সহায় করে দিন। তিনি এমনিতেই আমার হাত ও বাহুতুল্য। আল্লাহ তাআলার দরবারে মুসা আ.-এর দুটি দোয়াই কবুল হয়ে গেলো। কোনো কোনো মুফাস্‌সির يَفْقَهُوا قَوْلِي 'যাতে তারা (লোকেরা) আমার কথা বুঝতে পারে' বাক্যে আরো একটি সূক্ষ্ম তর্ক উপস্থিত করে বলেছেন যে, হযরত মুসা আ. এই দোয়া করলেন যে, তাঁর জিহ্বার জড়তা এই সীমা পর্যন্ত দূর করে দেয়া হোক, তিনি যে-কওমের সত্য প্রচার করতে যাচ্ছেন, তারা যেনো তাঁর কথাবার্তা বুঝতে পারে। কাজেই নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্তই তাঁর দোয়া কবুল হয়েছিলো এবং তাঁর মুখে কিছু তোতলামি ও জড়তা এর পরেই থেকে গিয়েছিলো। মুসা আ. শর্ত লাগিয়ে নিজেই দোয়ার গণ্ডিকে সংকীর্ণ করে দিলেন। অন্যথায় তিনিও বিশুদ্ধ ভাষা ও বাগ্মিতায় অনন্য হয়ে যেতেন।

আমার (গ্রন্থকার) ধারণায় এখানে এই সূক্ষ্ম তর্ক উত্থাপনের কোনোই প্রয়োজন নেই। কেননা, যেখানে এবং যে-সময়ে হযরত মুসা আ. আল্লাহর দরবারে এই দোয়া করেছিলেন, এসব সূক্ষ্ম তর্ক উত্থাপনকারীরা তার মাহাত্ম্য ও বরকতকে ভুলে গেছেন এবং গভীরভাবে এ-কথা চিন্তা করেন নি যে, মুসা আ.-কে নবুওতের পদ দ্বারা সম্মানিত করা হচ্ছে। আল্লাহ তাআলার চূড়ান্ত পর্যায়ের দয়া ও অনুগ্রহের বারি তাঁর ওপর বর্ষণ করা হচ্ছে। রহমতের কোল তখন উন্মুক্ত। এ-অবস্থায় মুসা আ. তাঁর কর্তব্য ও দায়িত্বের গুরুত্ব অনুভব করে কাজ সহজ হওয়ার জন্য দোয়া করছেন এবং আকাঙ্ক্ষা করছেন। আল্লাহ তাআলা নিজেই হযরত মুসা আ.-এর কঠিন বিষয়গুলো এবং দায়িত্বের জটিলতা সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন, তবে কি এ-সময় আল্লাহর অসীম রহমতের চাহিদা এই হতে পারে যে, তিনি দানের ও বখশিশের ক্ষেত্রে সীমাহীন দানের পরিবর্তে ক্রয়-বিক্রয়ের মাপ ও মূল্যের বিনিময়ে সওদা প্রদানের মতো লেনদেনের কারবার করবেন? না-কি প্রকৃত অবস্থার প্রতি লক্ষ করে মুসা আ.-এর দোয়ার শব্দগুলোর শাব্দিক অর্থ বিচার না করে তিনি সবকিছুই দান করবেন যা মুসা আ.-এর যাবতীয় জটিলতার সমাপ্তি ঘটিয়ে তাঁর সহায়তাকারী সাব্যস্ত হতে পারে? নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা তা-ই করেছেন। অবশ্য মুসা আ.-এর দোয়ায় এভাবে কথা বলার মধ্যে একটি রহস্য ছিলো। যা তিনি এবং তাঁর প্রতিপালক উভয়েই বুঝতেন। মুসা আ.-এর আকাঙ্ক্ষা ছিলো যে, তাঁর মহান গুরুত্বপূর্ণ খেদমতে তাঁর ভাই হারুন আ. যেনো অবশ্যই শরিক থাকেন। কেননা, তিনি তাঁর ভাইও হন, আবার স্বভাবগতভাবেই বিশুদ্ধ ভাষা ও অনর্গল কথা বলার ক্ষমতারও অধিকারী। এ-কারণে মুসা আ. এর চেয়ে অধিক কিছুর প্রার্থী হন নি যাতে তাঁর কথা বলার জড়তা ও কষ্ট দূর হয়ে যায়। তাঁর বাসনা ছিলো, তাঁর ভাই হারুন আ.-ও কোনোভাবে নবুওতের দৌলত লাভ করেন। সুতরাং তাঁর সুপারিশের জন্য দোয়ার বর্ণনায় 'বিশুদ্ধভাষী' হওয়ার গুণটিই আল্লাহ তাআলার দরবারে পেশ করেছিলেন। বিষয় এই নয় যে, তিনি দোয়ার মধ্যে শব্দপ্রয়োগে কার্পণ্য করেছিলেন। কাজেই আল্লাহ তাআলা কম দেয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর শব্দগুলোর শাব্দিক অর্থই ধরেছেন

এবং সে-পরিমাণই দান করেছেন যে-পরিমাণ দোয়ার শব্দগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো।

এই ঘটনা কুরআন মাজিদে নিম্নরূপে বর্ণিত হয়েছে—

وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى () إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى () فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى () إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى () وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى () إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي () إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى () فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى (سورة طه)

'(হে মুহাম্মদ,) মুসার বৃত্তান্ত তোমার কাছে পৌছেছে কি? সে যখন (দূর থেকে) আগুন[৪৫] দেখলো, তখন তার পরিবারবর্গকে বললো, "তোমরা এখানে থাকো, আমি আগুন দেখেছি। সম্ভবত আমি তোমাদের জন্য তা থেকে কিছু জ্বলন্ত অঙ্গার আনতে পারবো অথবা আমি (অন্তত) আগুনের কাছে কোনো পথনির্দেশ পাবো।" এরপর যখন সে আগুনের কাছে এলো, তখন আহ্বান করে বলা হলো, (একটি আওয়াজ হলো) "হে মুসা আমিই তোমার প্রতিপালক, অতএব তোমার পাদুকা খুলে ফেলো, কারণ তুমি পবিত্র 'তুওয়া' উপত্যকায় রয়েছো। এবং আমি তোমাকে (আমার নবুওত ও রিসালাতের কর্মের জন্য) মনোনীত করেছি। সুতরাং যা ওহি প্রেরণ করা হচ্ছে তুমি তা মনোযোগের সঙ্গে শোনো। আমিই আল্লাহ, আমি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। অতএব আমার ইবাদত করো এবং আমার স্মরণার্থে সালাম কায়েক করো। কেয়ামত অবশ্যম্ভাবী, আমি তা (কেয়ামতের সঙ্কটমুহূর্ত) গোপনীয় রাখতে চাই, যাতে (প্রত্যেকে মানুষের ঈমান ও আমলের পরীক্ষা হয়ে যায়) প্রত্যেকেই নিজ কর্ম অনুযায়ী ফল লাভ করতে পারে। সুতরাং যে-ব্যক্তি কিয়ামতে বিশ্বাস করে না ও নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, যে যেনো তোমাকে তাতে

---

[৪৫] মুসা আ. স্ত্রীসহ মাদয়ান থেকে মিসর যাচ্ছিলেন। পথে রাত হয়। শীতে তাদের কষ্ট হচ্ছিলো। তখন তিনি আগুন দেখলেন। প্রকৃতপক্ষে তা ছিলো আল্লাহর তাজাল্লি।

বিশ্বাস স্থাপনে নিবৃত্ত না করে, নিবৃত্ত হলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।"' [সুরা তোয়া-হা : আয়াত ৯-১৬]

إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ () فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ () يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (سورة النمل)

'স্মরণ করো সেই সময়ের কথা, যখন মুসা তার পরিবারবর্গকে বলেছিলো, "আমি আগুন দেখেছি, সত্বর আমি ওখান থেকে তোমাদের জন্য কোনো খবর আনবো অথবা তোমাদের জন্য আনবো জ্বলন্ত অঙ্গার, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পারো। এরপর যখন সে তার কাছে এলো, তখন ঘোষিত হলো, "ধন্য, যারা আছে এই আলোর[৪৬] মধ্যে এবং যারা আছে তার চারপাশে, জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ পবিত্র ও মহিমান্বিত। হে মুসা, আমি তো আল্লাহ, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"' [সুরা নামল : আয়াত ৭-৯]

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى () قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى () قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى () فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى () قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى () وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى () لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى (سورة طه)

(এবং আল্লাহ বললেন,) "হে মুসা, তোমার ডান হাতে ওটা কী? মুসা বললো "এটা আমার লাঠি; আমি এতে ভর দিই এবং এর দ্বারা আঘাত করে আমি আমার মেষপালের জন্য গাছের পাতা পেলে থাকি।" তখন তিনি (আল্লাহপাক) বললেন, "হে মুসা, তুমি তা (লাঠি) নিক্ষেপ করো।" তখন সে তা নিক্ষেপ করলো, সঙ্গে সঙ্গে তা (অজগর) সাপ হয়ে ছুটতে শুরু করলো। আল্লাহ বললেন, "তুমি ওটাকে ধরো এবং ভয় করো না, আমি ওটাকে তার পূর্বরূপে (আসল আকৃতিতে) ফিরিয়ে দেবো। এবং তোমার হাত তোমার বগলে রাখো, তা বের হয়ে আসবে নির্মল উজ্জ্বল

---

[৪৬] মুসা আ.-এর কাছে আগুন মনে হলেও তা ছিলো নুর, যা আল্লাহর তাজাল্লি।

(রোগ-ব্যাধি যেমন শ্বেত-কুষ্ঠ ইত্যাদি থেকে মুক্ত) অপর এক র্শনস্বরূপ। তা (এই দুই নিদর্শন দেয়া হলো) এইজন্য যে, আমি াকে (চাক্ষুষভাবে) দেখাবো আমার মহানিদর্শনগুলোর কিছু।" [সূরা -হা : আয়াত ১৭-২৩]

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّاهِدِ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ () وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ () (القصص)

মুহাম্মদ,) মুসাকে আমি যখন বিধান দিয়েছিলাম তখন তুমি পশ্চিম ে[৪৭] উপস্থিত ছিলে না এবং তুমি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলে না। বস্তুত আমি ক মানবগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটিয়েছিলাম; এরপর তাদের বহু যুগ বাহিত হয়ে গেছে। তুমি তো মাদয়ানবাসীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলে াদের কাছে আমার আয়াত আবৃত্তি করার জন্য। আমিই তো ছিলাম ল প্রেরণকারী। মুসাকে যখন আমি আহ্বান করেছিলাম তখন তুমি পাহাড়ের পাশে উপস্থিত ছিলে না। বস্তুত তা[৪৮] তোমার পালকের পক্ষ থেকে দয়াস্বরূপ, যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে র্ক করতে পারো, যাদের কাছে তোমার পূর্বে কোনো সতর্ককারী ন নি, যেনো তারা উপদেশ গ্রহণ করে।' [সূরা কাসাস : আয়াত ৪৪-৪৬]

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى () إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى () اذْهَبْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى () فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى () وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَ (سورة النازعات)

র পাহাড় বা 'তুওয়া' উপত্যকার প্রান্তে।

র্থাৎ ওহি, যা আল্লাহ তাআলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে । করে তাকে এমনসব বিষয়ের সংবাদ প্রদান করেছেন যা তিনি জানতেন না।

'তোমার কাছে মুসার বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি? যখন তার প্রতিপালক পবিত্র উপত্যকা তুওয়ায় তাকে আহ্বান করে বলেছিলেন, "ফেরআউনের কাছে যাও, সে তো সীমালঙ্ঘন করেছে, এবং বলো, তোমার কি আগ্রহ আছে যে, তুমি পবিত্র হও—আর আমি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের দিকে পথপ্রদর্শন করি যাতে তুমি তাঁকে ভয় করো?"' [সূরা নাযি'আত : আয়াত ১৫-১৯]

اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى () قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي () وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي () وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي () يَفْقَهُوا قَوْلِي () وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي () هَارُونَ أَخِي () اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي () وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي () كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا () وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا () إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا () قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى (سورة طه)

'(আদেশ হলো, হে মুসা,) তুমি (মিশরের বাদশাহ) ফেরআউনের কাছে যাও, সে তো সীমালঙ্ঘন করেছে। মুসা বললো, "হে আমার প্রতিপালক, আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও (যেনো বড় থেকে বড় বোঝা বহন কারার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাই)। এবং আমার কর্ম সহজ করে দাও (যেনো পথের কোনো কষ্টই আমার ওপর প্রবল ও কঠোর না হয়)। আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও (যাতে কথাবার্তা ও ওয়াজ-নসিহত পূর্ণরূপে চালু হয়ে যায় এবং)—যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। আমার জন্য আমার স্বজনবর্গের মধ্য থেকে একজন সাহায্যকারী বানিয়ে দাও; আমার ভাই হারুনকে; তার মাধ্যমে আমার শক্তি দৃঢ় করো এবং তাকে আমার কাছে অংশী করো, যাতে আমরা (একনিষ্ঠভাবে) তোমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে পারি প্রচুর। এবং তোমাকে স্মরণ করতে পারি অধিক। তুমি তো আমাদের সম্যক দ্রষ্টা (তুমি কোনো অবস্থাতেই আমাদের থেকে গাফেল নও)।" তিনি বললেন, "হে মুসা, তুমি যা চেয়েছে তা তোমাকে দেয়া হলো।"' [সূরা তোয়া-হা : আয়াত ২৪-৩৬]

اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي () اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى () فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى () قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى () قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى () فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ

فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى (سورة طه)

"তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শনসহ (মুসা আ.-কে প্রদত্ত মুজিযাসহ) ফেরআউনের কাছে যাও, এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য করো না। তোমরা উভয়ে (মুসা ও হারুন) ফেরআউনের কাছে যাও, সে তো সীমালঙ্ঘন করেছে। তোমরা তার সঙ্গে নম্র কথা বলবে, (তোমরা কি জানো?) হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা (পরিণামকে) ভয় করবে।" তারা বললো, "হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা আশঙ্কা করি সে আমার ওপর বাড়াবাড়ি করবে অথবা অন্যায় আচরণে সীমালঙ্ঘন করবে।" তিনি বললেন, "তোমরা ভয় করো না। আমি তো তোমাদের সঙ্গে আছি, আমি শুনি ও আমি দেখি। সুতরাং তোমরা তার কাছে (বিনা দ্বিধায়) যাও এবং বলো, 'আমরা তোমার প্রতিপালকের রাসুল, সুতরাং আমাদের সঙ্গে বনি ইসরাইলকে যেতে দাও (তাদের মুক্ত ও স্বাধীন করে দাও) এবং তাদেরকে কষ্ট দিয়ো না। আমরা তো তোমার কাছে আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নিদর্শন এনেছি এবং তাদের প্রতি শান্তি যারা অনুসরণ করে সৎপথ।'" [সুরা তোয়া-হা : আয়াত ৪২-৪৭]

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا () فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا (سورة الفرقان)

'আমি তো মুসাকে কিতাব (তাওরাত) দিয়েছিলাম এবং তার সঙ্গে তার ভাই হারুনকে সাহায্যকারী করেছিলাম, এবং বলেছিলাম, "তোমরা সেই সম্প্রদায়ের কাছে যাও যারা আমার নিদর্শনাবলিকে অস্বীকার করেছে।" তখন আমি তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিলাম।' [সুরা ফুরকান : আয়াত ৩৫-৩৬]

وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ () قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ () قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ () وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ () وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ () قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ () فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (سورة الشعراء)

'স্মরণ করো, যখন তোমার প্রতিপালক মুসাকে ডেকে বললেন, "তুমি জালিম (ও পাপিষ্ঠ) সম্প্রদায়ের কাছে যাও, ফেরআউনের সম্প্রদায়ের কাছে; তারা কি ভয় করে না?" তখন সে বলেছিলো, "হে আমার প্রতিপালক, আমি আশঙ্কা করি যে, তারা আমাকে অস্বীকার করবে, এবং আমার হৃদয় সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছে, আর আমার জিহ্বা তো সাবলীল নয়। সুতরাং হারুনের প্রতিও প্রত্যাদেশ পাঠাও। আমার বিরুদ্ধে তো তাদের এক অভিযোগ আছে, আমি আশঙ্কা করি তারা আমাকে হত্যা করবে।" আল্লাহ বললেন, 'না, কখনোই নয়, সুতরাং তোমরা উভয়ে আমার নিদর্শনসহ যাও, আমি তো তোমাদের সঙ্গে আছি, শ্রবণকারী। অতএব, তোমরা উভয়ে ফেরআউনের কাছে যাও এবং বলো, আমরা তো জগৎসমূহের প্রতিপালকের রাসুল।"' [সুরা শুআরা : আয়াত ১০-১৬]

وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ () إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ () وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (سورة النمل)

"তুমি তোমার লাঠি (মাটিতে) নিক্ষেপ করো।" এরপর সে যখন ওটাকে সাপের মতো (ফণা তুলে) ছোটাছুটি করতে দেখলো তখন সে পেছনের দিকে ছুটতে লাগলো এবং ফিরেও তাকালো না। বলা হলো, "হে মুসা, ভীত হয়ো না, নিশ্চয় আমি এমন, আমার সান্নিধ্যে রাসুলগণ ভয় পায় না; তবে যারা জুলুম করার পর মন্দকাজের পরিবর্তে সৎকর্ম করে, তাদের প্রতি আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। এবং তোমার হাত তোমার বগলে (তোমার জামার বুকের অংশের উন্মুক্ত স্থানে) রাখো, তা বের হয়ে আসবে শুভ্র নির্মল অবস্থায়। তা ফেরআউন ও তার সম্প্রদায়ের কাছে আনীত নয়টি নিদর্শনের অন্তর্গত। তারা তো সত্যত্যাগী (ও নাফরমান) সম্প্রদায়।"' [সুরা নামল : আয়াত ১০-১২]

فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ

تَصْطَلُونَ () فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ () وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ () اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ () قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ () وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ () قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ (سورة القصص)

"মুসা যখন তার মেয়াদ পূর্ণ করার পর সপরিবারে যাত্রা করলো, তখন সে তুর পর্বতের দিকে আগুন দেখতে পেলো। সে তার পরিবারবর্গকে বললো, "তোমরা অপেক্ষা করো, আমি আগুন দেখেছি, সম্ভবত আমি ওখান থেকে তোমাদের জন্য খবর আনতে পারি অথবা একখণ্ড জ্বলন্ত অঙ্গার আনতে পারি যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পারো। যখন মুসা আগুনের কাছে পৌছলো তখন উপত্যকার দক্ষিণ পাশে পবিত্র ভূমিস্থিত এক বৃক্ষের দিক থেকে (যে-বৃক্ষে আগুন দেখা গিয়েছিলো) তাকে আহ্বান করে বলা হলো, "হে মুসা, আমিই আল্লাহ, জগৎসমূহের প্রতিপালক।" আরও বলা হলো, "তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ করো।" এরপর যখন সে তাকে সাপের মতো (ফনা তুলে) ছোটাছুটি করতে দেখলো তখন পেছনের দিকে ছুটতে লাগলো এবং ফিরে তাকালো না। তাকে বলা হলো, "হে মুসা, সামনে আসো, ভয় করো না, তুমি তো নিরাপদ। তোমার হাত তোমার বগলে রাখো, তা বের হয়ে আসবে শুভ্র-সমুজ্জ্বল নির্মল হয়ে। ভয় দূর করার জন্য তোমার হাত দুটি নিজের (বুকের) দিকে চেপে ধরো। এই দুটি তোমার প্রতিপালকের প্রদত্ত প্রমাণ, ফেরআউন ও তার পারিষদবর্গের জন্য। তারা তো সত্যত্যাগী (ও নাফরমান) সম্প্রদায়।" মুসা বললো, হে আমার প্রতিপালক, আমি তো তাদের একজনকে হত্যা করেছি। ফলে আমি আশঙ্কা করছি তারা আমাকে হত্যা করবে। আর আমার ভাই হারুন আমার থেকে বাগ্মী;

সুতরাং তাকে আমার সাহায্যকারীরূপে প্রেরণ করো, সে আমাকে সমর্থন করবে। আমি আশঙ্কা করি তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে।" আল্লাহ বললেন, "আমি তোমার ভাইয়ের দ্বারা তোমার বাহু শক্তিশালী করবো এবং তোমাদের উভয়কে প্রাদান্য দান করবো। তারা তোমার কাছে (ক্ষতি করার উদ্দেশে) পৌছতে পারবে না। তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরা আমার নিদর্শনের মাধ্যমে প্রবল (ও বিজয়ী) হবে।"' [সুরা কাসাস : আয়াত ২৯-৩৫]

وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا () ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا (سورة بني إسرائيل)

'আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এবং তাকে করেছিলাম বনি ইসরাইলের পথনির্দেশক। আমি আদেশ করেছিলাম, তোমরা আমাকে ব্যতীত অন্য কাউকেও কর্মবিধায়করূপে গ্রহণ করো না। হে তাদের বংশধর, যাদেরকে আমি নুহের সঙ্গে (নৌকায়) আরোহণ করিয়েছিলাম; সে তো ছিলো পরম কৃতজ্ঞ বান্দা।' [সুরা বনি ইসরাইল : আয়াত ২-৩]

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ () وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ () إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (سورة السجدة)

'আমি তো মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, সুতরাং তুমি তার সাক্ষাৎ সম্পর্কে[৪৯] সন্দেহ করো না, আমি একে (কিতাবকে) বনি ইসরাইলের জন্য পথনির্দেশক করেছিলাম। আর আমি তাদের মধ্য থেকে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করতো, যেহেতু তারা ধৈর্য ধারণ করেছিলো। আর তারা ছিলো আমার নিদর্শনাবলিতে দৃঢ় বিশ্বাসী। তারা যে-বিষয়ে মতবিরোধ করছে, তোমার

---

[৪৯] মিরাজে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে মুসা আ.-এর সাক্ষাৎ সম্পর্কে অথবা কিয়ামতের দিন আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্কে অথবা মুসা আ.-এর কিতাব প্রাপ্তি সম্পর্কে।

প্রতিপালকই কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে তার ফয়সালা করে দেবেন।' [সুরা আস-সাজদা : আয়াত ২৩-২৫]

এই আয়াতগুলোতে হযরত মুসা আ.-এর লাঠিটি মুজেযা হওয়ার বিষয়টি বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সুরা তোয়া-হায় বলা হয়েছে, هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ 'তা সাপ হয়ে ছোটাছুটি করছে'। সুরা নামল ও সুরা কাসাসে বলা হয়েছে كَأَنَّهَا جَانٌّ 'যেনো তা সাদা বর্ণের সাপ'। (আর দ্রুত গতি হিসেবে সাদা পাতলা সাপই দ্রুত গতিশীল ছিলো।) আর সুরা শুআরায় বলা হয়েছে, هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ 'তা স্পষ্ট বিরাট অজগর'। মুফাস্‌সিরগণ বলেন, শব্দ হিসেবে যদিও মুসা আ.-এর লাঠিটির রূপ বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু অর্থের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন প্রকার নয়; একই মূল বস্তুর বিভিন্ন অবস্থা দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ জাত হিসেবে তো তা সাপই ছিলো এবং দ্রুত গতি হিসেবে তা ছিলো جَانٌّ অর্থাৎ দ্রুত গতিশীল সাপ আর বিরাটাকার হিসেবে ছিলো ثُعْبَانٌ অর্থাৎ অজগর।

আর সুরা কাসাসে মুসা আ.-এর উভয় মুজেযা বর্ণনা করে বলা হয়েছে— وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ

'ভয় দূর করার জন্য তোমার হাত দুটি নিজের (বুকের) দিকে চেপে ধরো।'

এই আয়াতে কীরকম ভয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে? এ-সম্পর্কে হযরত শাহ সাহেব দেহলবি রহ. বলেন, ভয় দুর করার জন্য বাহু দুটি মিলিত করো। অর্থাৎ সাপের ভয় দূর হয়ে যাক।[৫০]

আর কোনে কোনো আলেম বলেন, এই ভয়ের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ফেরআউনের দরবারের ভয়। অর্থাৎ, ফেরআউনের সামনে এসে যদি কোনো সময় ভয় অনুভব করো, তবে হে মুসা, তোমার বাহুকে তোমার শরীরের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ো। তৎক্ষণাৎ ভয় দূর হয়ে যাবে এবং অন্তরে স্বস্তি ও প্রশান্তির অবস্থা সৃষ্টি হবে। এটি উল্লিখিত দুটি নিদর্শন ছাড়া তৃতীয় কোনো নিদর্শন ছিলো না। এ-আয়াতে ভয় দূর করার একটি প্রাকৃতিক উপায় বলে দেয়া হয়েছে, যা এ-ধরনের ক্ষেত্রে সাধারণত

[৫০] মুযিহুল কুরআন।

উপকারী প্রমাণিত হয়ে থাকে। আর যখন তা আল্লাহ তাআলাই শিখিয়ে দিয়েছিলেন, সুতরাং তা কার্যকরী হওয়া সম্পর্কে মুসা আ.-এর মনে সন্দেহ অবশিষ্ট থাকার অবকাশই ছিলো না।[৫১]

আমাদের মতে আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক হযরত শাহ সাহেব দেহলবি রহ.-এর ব্যাখ্যারই সমর্থন করছে। আর আবদুল ওয়াহ্হাব নাজ্জার মিসরির ব্যাখ্যা কিছুটা দূরের বলে মনে হয়।

ফেরআউনের দরবারে সত্যের দাওয়াত

যাইহোক। হযরত মুসা আ. ও হারুন আ.-এর মধ্যে যখন পরস্পর সাক্ষাৎ ও কথোপকথনের পর্ব শেষ হলো। তখন তাঁরা দুজনই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, আল্লাহর আদেশ পালনের উদ্দেশ্যে ফেরআউনের কাছে যাওয়া এবং তাকে আল্লাহর পয়গাম পৌঁছে দেয়া উচিত।

কতিপয় মুফাস্‌সির লিখেছেন, যখন দুই ভাই ফেরআউনের দরবারে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন, তখন তাঁদের মা ভালোবাসার আতিশয্যের কারণে তাঁদের যেতে বারণ করতে চাইলেন এবং তাঁদেরকে বললেন, তোমরা এমন ব্যক্তির কাছে যেতে চাচ্ছো, যে রাজসিংহাসন ও রাজমুকুটেরও মালিক আবার জালিম ও অহঙ্কারীও। তোমরা ওখানে যেয়ো না। তোমাদের ওখানে যাওয়া বিফল হবে। কিন্তু মুসা আ. ও হারুন আ. দু-ভাই-ই মাকে বুঝালেন যে, আল্লাহর হুকুম সবসময় অনঢ়, তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করা যায় না। তিনি আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, আমরা সফল হবো।

মোটকথা, উভয় ভাই আল্লাহ তাআলার সত্য নবী ও রাসুল, ফেরআউনের দরবারে পৌঁছলেন। নির্ভয়ে ও নিশ্চিন্ত মনে তাঁরা ভেতরে প্রবেশ করলেন। ফেরআউনের সিংহাসনের কাছে গিয়ে মুসা ও হারুন আ. তাঁদের আগমনের কারণ বর্ণনা করলেন। যখন কথোপকথন শুরু হলো, তখন তারা বললেন :

'হে ফেরআউন, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাঁর নবী ও রাসুল নিযুক্ত করে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন। আমরা তোমার কাছে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চাই। একটি এই যে, আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় বলে বিশ্বাস

---

[৫১] কাসাসুল আম্বিয়া, আবদুল ওয়াহ্হাব নাজ্জার, পৃষ্ঠা ২১২।

করো এবং কাউকেও তাঁর শরিক ও সমকক্ষ সাব্যস্ত করো না। দ্বিতীয় বিষয় হলো, জুলুম ও অত্যাচার থেকে নিবৃত্ত হও এবং বনি ইসরাইলকে তোমার দাসত্ব থেকে মুক্ত ও স্বাধীন করে দাও। আমরা যা-কিছু তোমাকে বলছি, দৃঢ় বিশ্বাস করো যে, আমরা বানোয়াট ও কৃত্রিম কিছু বলছি না। আমাদের এমন দুঃসাহসও হতে পারে না যে, আমরা আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলবো। আমাদের সত্য প্রমাণের জন্য যেমন আমাদের এই শিক্ষা সাক্ষী রয়েছে তেমনি আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দুটি নিদর্শনও (মুজেযা) দান করেছেন। সুতরাং তোমার জন্য এটাই সঙ্গত হবে যে, আল্লাহর এই পয়গামকে কবুল করে নাও এবং বনি ইসরাইলকে মুক্তি দাও। আমরা তাদেরকে নবীগণের দেশে নিয়ে যাবো যেখানে তারা একমাত্র আল্লাহ তাআলার ইবাদত করবে। তাঁকে ছাড়া আর কারো উপাসনা করবে না। কেননা, এটাই একমাত্র সত্যপথ এবং তাদের পূর্বপুরুষগণের রীতিনীতি।

এই ঘটনা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এভাবে—

وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ () حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (سورة الأعراف)

'এবং মুসা বললো, "হে ফেরআউন, আমি তো জগৎসমূহের প্রতিপালকের কাছ থেকে প্রেরিত। এটা স্থির নিশ্চিত যে, আমি আল্লাহ সম্পর্কে সত্য ব্যতীত বলবো না। (আমার জন্য এটা কখনোই শোভনীয় নয় যে, আমি আল্লাহ তাআলার সম্পর্কে সত্য ব্যতীত অন্যকিছু বলি।) আমি তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ এনেছি, সুতরাং বনি ইসরাইলকে তুমি আমার সঙ্গে যেতে দাও।" [সূরা আ'রাফ : আয়াত ১০৪-১০৫]

ফেরআউন তাঁদের কথা শুনে বললো, হে মুসা, আজ তুমি নবী সেজে আমার সামনে এসে বনি ইসরাইলের মুক্তি দাবি করছো। সেই দিনগুলো কি ভুলে গেলে যখন তুমি আমার গৃহে লালিত পালিত হয়েছিলে এবং শৈশবের জীবন অতিবাহিত করেছিলেন? আর এ-কথাও কি তুমি ভুলে গেলে যে, তুমি একজন মিসরীয় লোককে হত্যা করে এখান থেকে পলায়ন করেছিলে?

সত্যের বিরোধিতা ও মিথ্যা প্রতিপাদন করবে এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে আল্লাহর আযাবের যোগ্য বলে সাব্যস্ত হবে।

إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى

'আমাদের কাছে ওহি প্রেরণ করা হয়েছে যে, শাস্তি তো তার জন্য যে মিথ্যা আরোপ করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়।' [সুরা তোয়া-হা : আয়াত ৪৮]

ফেরআউন আবারো সেই একই প্রশ্নের পুনারবৃত্তি করলো—হে মুসা, তোমাদের উভয়ের রব কে? হযরত মুসা আ. ফেরআউনের এই প্রশ্নের জবাব এমন কথা বললেন যার কোনা উত্তর নেই। ফেরআউন হতভম্ব হয়ে থাকলো এবং দিক বদলে অন্যদিকে মোড় নেয়ার জন্য এমনভাবে চেষ্টা করতে লাগলো যেমন বাতিলপন্থী বিতর্ককারীরা করে থাকে। তাদের রীতি এই যে, সঠিক উত্তর দিতে না পারলে এবং প্রকৃত অবস্থা সামনে এসে পড়লে তখন সেটাকে দমিয়ে দেয়ার জন্য বক্রতা অবলম্বন করে এবং কথার মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়ে থাকে।

যাইহোক। মুসা আ. বললেন, আমার প্রতিপালক তো সেই একই প্রতিপালক, যিনি দুনিয়ার প্রতিটি বস্তুকে অস্তিত্ব দান করেছেন। তারপর সব ধরনের প্রয়োজনীয় ক্ষমতা (যথা : পঞ্চ ইন্দ্রিয়, জ্ঞানশক্তি ইত্যাদি) প্রদান করেছেন এবং তাদের জন্য জীবনের যাবতীয় কর্মের দ্বার উন্মোচিত করে দিয়েছেন। প্রত্যেক বস্তু দেহ ও অস্তিত্বের নেয়ামত দান করেছেন। তারপর সবাইকে পূর্ণতা লাভের পথে চলার জন্য পথপ্রদর্শন করেছেন। তখন ফেরআউন নিরুত্তর হয়ে কথার মোড় এইভাবে ঘুরিয়ে দিলো যে, فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى 'তাহলে অতীত যুগের লোকদের অবস্থা কেমন হয়েছে?' তার উদ্দেশ্য ছিলো এই যে, যদি তোমার কথা সঠিক হয়, তবে আমার পূর্বে যারা অতীত হয়ে গেছে, যেমন আমাদের পূর্বপুরুষগণ, তাদের আকিদা তোমার আকিদার অনুকূলে ছিলো না, তাদের সবাই কি শাস্তিতে আক্রান্ত হবে? হযরত মুসা আ. ফেরআউনের বাঁকা আলোচনা বুঝতে পারলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেলো যে, এই ব্যক্তি আসল উদ্দেশ্যকে এলোমেলো করে দিতে চাচ্ছে। তাই তিনি তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন—

قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى

করো ও তোমাদের গবাদি পশু চরাও; অবশ্যই এতে নিদর্শন আছে বিবেকসম্পন্নদের জন্য। আমি মাটি থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তাতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেবো এবং তা থেকে তোমাদেরকে পুনরায় বের করবো।' [সুরা তোয়া-হা : আয়াত ৪৯-৫৫]

হিন্দুস্তানের একজন সমসাময়িক বিখ্যাত আলেম সুরা তোয়া-হার أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى 'যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার আকৃতি দান করেছেন, তারপর (জীবন ও কর্মের) পথনির্দেশ করেছেন' আয়াতে হেদায়েত শব্দের অর্থ 'ইন্দ্রিয়সমূহ ও জ্ঞান-বুদ্ধিকে পথ প্রদর্শন করা' অর্থ মেনে নিয়ে মুফাস্‌সিরগণকে অনর্থক তিরস্কারের পাত্র বানিয়েছেন। তিনি মনে করেন, মুফাস্‌সিরগণ কুরআন মাজিদের আলোচ্য আয়াতের প্রাণবস্তুর সন্ধান না পেয়ে এখানেও হেদায়েত-এর অর্থ গ্রহণ করেছেন দীন ও মাযহাবের হেদায়েত। আর যেনো শুধু তিনিই প্রথম এই প্রাণবস্তুটিকে চিনতে পেরেছেন এবং তার মূলতত্ত্ব জানতে পেরেছেন। অথচ কয়েকজন মুফাস্‌সির ছাড়া অতীত ও বর্তমানের অধিকাংশ মুফাস্‌সির ও তত্ত্বজ্ঞানী এ-ক্ষেত্রে সে-অর্থই বর্ণনা করেছেন যাকে পরিষ্কার ও স্বভাবজাত বলা হয়েছে।[৫৫]

মুফাস্‌সির উলামায়ের কেরাম বলেন, ফেরআউন ও মুসা আ.-এর মধ্যে এসব কথোপকথনে হযরত হারুন আ. দোভাষী হিসেবে থাকতেন। আর মুসা আ.-এর প্রমাণগুলোকে অত্যন্ত মার্জিত ও বিশুদ্ধ ভাষায় পেশ করতেন।

যাইহোক। বিভিন্ন মজলিসে হযরত মুসা আ. ও ফেরআউনের মধ্যে বিতর্কের এই ধারা অব্যাহত থাকলো। ফেরআউন হযরত মুসা ও হারুন আ.-এর উজ্জ্বল প্রমাণ ও প্রকৃত দলিলসমূহ শুনে হতভম্ব হয়ে যেতো এবং ভেতরে ভেতের খুব রেগে উঠতো, কিন্তু নিরুত্তর হয়ে পড়ার কারণে হযরত মুসা আ. থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো উপায় স্থির করতে পারতো না। সে জানতো যে, তার খোদা হওয়ার ভিত্তি এতো দুর্বল যে তা মুসা

---

[৫৫] ثم هدى إلى طريق الانتفاع والارتفاق بما اعطاه وعرفه كيف يتوصل إلى بقائه وكماله أما اختيارا كما في الحيوانات أو طبعا كما في الجمادات والقوى الطبيعية النباتية والحيوانية

[দেখুন : أروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، أبو الثناء شهاب الدين الألوسي]

আ.-এর প্রমাণসমূহের সামনে মাকড়সার জালের মতো ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। সভাসদরা এসব বিষয় ভালোভাবে বুঝতো। তাই ফেরআউনের পক্ষে তা অত্যন্ত অসহনীয় ছিলো। বিশেষত, যে-রাজ্যের মধ্যে রাজকীয় প্রতাপ ও রাজত্বের আড়ম্বরের সঙ্গে সঙ্গে খোদা হওয়ার সম্মান ও মর্যাদাও প্রদান করা হয়, সেখানে মুসা ও হারুন আ.-এর সত্য প্রচারের এই দুঃসাহস ফেরআউনে ভেতরে ভেতরে খুব ভীত ও ব্যাকুল করে তুলেছিলো। তাই সে তখন বিতর্কের ধারা সমাপ্ত করার জন্য ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করলো। এসব পন্থার মধ্যে ছিলো নিজের শক্তি ও ক্রোধের প্রকাশ, মিসরীয় সম্প্রদায়কে মুসা আ. ও বনি ইসরাইলের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলা, রাব্বুল আলামিনের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করে এই বিতর্ক ও আলোচনার অবসান ঘটিয়ে দেয়া ইত্যাদি। সে তার সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বললো—

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي

'এবং ফেরআউন (তার সভাসদবৃন্দের উদ্দেশে) বললো, "হে পারিষদবর্গ, আমি ব্যতীত তোমাদের অন্যকোনো ইলাহ আছে বলে জানি না।" [সুরা কাসাস : আয়াত ৩৮]

তারপর তার মন্ত্রী হামানকে নির্দেশ দিলো—

فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ

"হে হামান, তুমি আমার ইট পোড়াও এবং একটি সুউচ্চ প্রসাদ নির্মাণ করো; হয়তো আমি তাতে উঠে মুসার ইলাহকে দেখতে পারি। তবে আমি অবশ্য মনে করি সে মিথ্যাবাদী।"' [সুরা কাসাস : আয়াত ৩৮]

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ () أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ (سورة مؤمن)

"ফেরআউন বললো, "হে হামান, তুমি আমার জন্য নির্মাণ করো এক সুউচ্চ প্রাসাদ, যাতে আমি পাই অবলম্বন—অবলম্বন আসমানে আরোহণের, যেনো আমি দেখতে পাই মুসার ইলাহকে; তবে আমি তো

তাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি।" এভাবে ফেরআউনের কাছে শোভনীয় করা হয়েছিলো তার মন্দকাজকে এবং তাকে (খারাপ কাজের ওপর হঠকারিতা করার কারণে) নিবৃত্ত করা হয়েছিলো সরল পথ থেকে এবং ফেরআউনের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছিলো সম্পূর্ণরূপে।' [সূরা মুমিন : আয়াত ৩৬-৩৭]

হযরত শাহ আবদুল কাদির রহ. তাঁর মুযিহুল কুরআন-এ বলেন, ফেরআউনের مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي 'আমি ব্যতীত তোমাদের অন্যকোনো ইলাহ আছে বলে জানি না' থেকে বুঝা যায় ফেরআউন নাস্তিক ছিলো। তাফসির ও ইতিহাসের কিতাবে প্রাচীন মিসরের যেসব ঐতিহাসিক তথ্যপ্রমাণ উদ্ধৃত করা হয়েছে, তা থেকেও এই সন্ধানই পাওয়া যায় যে, মিসরবাসীরা দেব-দেবীর পূজক ছিলো। তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা ছিলো 'আমিনরা' অর্থাৎ সূর্যদেবতা। তারা কোনো অর্থেই এক খোদা বা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী ছিলো না; তারা বরং গোটা বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্ম ও তাদের সব ধরনের চাল-চলন ও কার্যাবলির সম্পর্ক গ্রহ ও নক্ষত্ররাশি এবং সেই দেবতাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মনে করতো। খুব সম্ভব ফেরআউন ও তার সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ভারতের জৈন মতাদর্শের কাছাকাছি ছিলো। কেননা, জৈনরা খোদা বিশ্বাস করে না; কিন্তু দেব-দেবীর পূজা করে।

হামান

হামান সম্পর্কে কুরআন মাজিদ পরিষ্কার কোনো বর্ণনা দেয় নি যে, এটা কি কোনো ব্যক্তির নাম না পদের নাম। আর হামান ব্যক্তিবিশেষের নাম হয়ে থাকলে ফেরআউনের দরবারে তার কী পদ ছিলো। কুরআন এ-বিষয়েও আলোকপাক করে নি যে, ফেরআউনের নির্দেশ অনুসারে হামান উচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলো কি-না আর ফেরআউন তার ওপর আরোহণ করে কী করেছিলো। কেননা, এ-বিষয়গুলো পবিত্র কুরআনের মৌলিক উদ্দেশ্যের জন্য প্রয়োজনীয় ছিলো না। তাওরাতও এ-বিষয়গুলো সম্পর্কে কোনো ইঙ্গিত দেয় নি, এমনকি তাওরাতে ফেরআউনের প্রাসাদ নির্মাণের আদেশেরও উল্লেখ করা হয় নি। অবশ্য মুফাস্‌সিরগণ এই কাহিনি উদ্ধৃত করেছেন যে, হামান অতি উচ্চ এক মিনারা নির্মাণ করে ফেরআউনকে জানালো। ফেরআউন তীর-ধনুক নিয়ে মিনারায় আরোহণ

করলো এবং আকাশের দিকে লক্ষ করে তীর ছুড়লো। আল্লাহ তাআলার কুদরতের ফয়সালা অনুযায়ী সেই তীরটির অগ্রভাগ রক্তমাখা হয়ে এলো। ফেরআউন তা দেখে গর্ব ও অহঙ্কারের সঙ্গে মিসরবাসীকে বললো, নাও, এখন আমি মুসার খোদারও কর্ম খতম করে দিয়েছি। এই কাহিনির সত্যতা আল্লাহপাকই ভালো জানেন।

ফেরআউন তার পারিষদবর্গ, সাধারণ কিবতি সম্প্রদায় এবং হামানের কাছে হযরত মুসা আ.-এর মোকাবিলায় নিজের পরাজয় ঢেকে রাখার জন্য যদিও উপরিউক্ত পন্থা অবলম্বন করেছিলো, কিন্তু সে নিজেও বুঝতো যে তা প্রবঞ্চনা ছাড়া কিছু নয়। এতে সাধারণ মানুষের অন্তরে সান্ত্বনা আসতে পারে না। খুব সম্ভব বহু সংখ্যক মিসরীয় এসব ব্যাপার বুঝতো। তারপরও সভাসদবৃন্দ, বিশিষ্ট ও সাধারণ মানুষের এমন একজন বিবেচনাবোধসম্পন্ন লোকও ছিলো না যে সাহসও সত্যকে গ্রহণের সঙ্গে এই সত্যের ঘোষণা করে দেয় এবং হেদায়েত ও নসিহত কবুলের দ্বার উন্মোচিত করে দেয়।

ফেরআউনের দরবারে মুজেযা প্রকাশ

মোটকথা, ফেরআউনের ভীতি ও উদ্বেগ বৃদ্ধিই পেতে থাকলো। সত্য ও মিথ্যার এই টানা-হেঁচড়ার মধ্যে সে ভীষণ বিপদ দেখছিলো। সুতরাং সে ব্যাপারটিকে এখানেই সমাপ্ত করে দিলো না; বরং এটাই জরুরি মনে করলো যে, সে তার প্রতাপ-প্রতিপত্তি, শক্তিমত্তা ও ক্রোধের প্রকাশ হযরত মুসা ও হারুন আ.-এর ওপরও বিস্তার করবে এবং এইভাবে তাঁদেরকে ভীত ও শঙ্কিত করে সত্যের পয়গাম পৌঁছানোর দায়িত্ব থেকে নিবৃত্ত রাখবে। তাই সে বললো, "হে মুসা, যদি তুমি আমাকে ব্যতীত আর কাউকে মাবুদ সাব্যস্ত করো তবে আমি তোমাকে কারাগারে বন্দি করে রাখবো।" হযরত মুসা আ. বললেন, "আমি তো তোমার কাছে এক অদ্বিতীয় আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে স্পষ্ট নির্দশন নিয়ে এসেছি, আমি কী করে এই ভুল পথ অবলম্বন করবো।" ফেরআউন বললো, "যদি বাস্তবিকই তুমি তোমার ব্যাপারে সত্য হয়ে থাকো, তবে কোনো নিদর্শন দেখাও।"

এই ঘটনা কুরআন মাজিদ নিম্নলিখিত আয়াতগুলোতে প্রকাশ করছে—

قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ () قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ () قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (سورة الشعراء)

'ফেরআউন বললো, "যদি তুমি আমার পরিবর্তে অন্যকে ইলাহরূপে গ্রহণ করো আমি তোমাকে অবশ্যই কারারুদ্ধ করবো।" মুসা বললো, "আমি যদি তোমার কাছে কোনো স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে আসি, তবুও?" ফেরআউন বললো, "তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে তা উপস্থিত করো।" [সুরা শুআরা : আয়াত ২৯-৩১]

قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

'ফেরআউন বললো, "যদি তুমি কোনো নিদর্শন এনে থাকো, তবে তুমি সত্যবাদী হলে তা উপস্থিত করো।"' [সুরা আ'রাফ : আয়াত ১০৬]

হযরত মুসা আ. সামনে এগিয়ে গেলেন এবং জনাকীর্ণ দরবারে ফেরআউনের সামনে তাঁর লাঠিটি মাটিতে ফেলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তা এক বিরাটাকার অজগরের রূপ ধারণ করলো। তা সত্যিকারের অজগরই ছিলো; কোনো ধরনের দৃষ্টিবিভ্রম ছিলো না। তারপর মুসা আ. তাঁর হাতকে জামার ভেতরে নিয়ে গিয়ে আবার বের করে আনলেন। তৎক্ষণাৎ হাতটি একটি উজ্জ্বল তারকার মতো দীপ্তিমান দেখা যেতে লাগলো। এটা ছিলো দ্বিতীয় মুজেযা বা দ্বিতীয় নিদর্শন।

ফেরআউনের পারিষদবর্গ যখন তাদের বাদশাহ ও নিজেদের সম্প্রদায়কে একজন ইসরাইলির হাতে এভাবে পরাজয় বরণ করতে দেখলো, বিচলিত হয়ে উঠলো এবং বলতে লাগলো, নিশ্চয় এই ব্যক্তি অতি বড় বিচক্ষণ জাদুকর। সে তার এসব কলাকৌশল এজন্য দেখাচ্ছে যে, সে তোমাদের ওপর জয়ী হয়ে তোমাদের দেশ মিসর থেকে তোমাদেরকে বের করে দেবে। সুতরাং আমাদের ভেবে দেখা দরকার এই ব্যক্তির ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত। অবশেষে ফেরআউন ও ফেরআউনের পারিষদবর্গ পারস্পরিক পরামর্শক্রমে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে, আপাতত মুসা ও হারুনকে অবকাশ দেয়া হোক। ইতোমধ্যে তোমরা গোটা রাজ্যের সব বিচক্ষণ ও সুদক্ষ জাদুকরকে রাজধানীতে সমবেত করো। তারপর মুসার সঙ্গে জাদুবিদ্যার প্রতিযোগিতা করা হোক। নিঃসন্দেহে এই ব্যক্তি পরাজয় বরণ করবে এবং তাঁর যাবতীয় আশা-অভিলাষ মাটির সঙ্গে মিশে যাবে।

ফেরআউন তখন মুসা আ.-কে বললো, আমি ভালোভাবেই বুঝতে পারছি, তুমি তোমার কলাকৌশল প্রয়োগ করে আমাদেরকে মিসরের ভূমি থেকে বহিষ্কার করতে চাচ্ছো। সুতরাং, এখন তোমার চিকিৎসা এটা ছাড়া আর কিছুই নয় যে, দেশের বড় বড় সুদক্ষ জাদুকরকে একত্র করে তোমাকে পরাজিত করা হবে। এখন আমাদের ও তোমার মধ্যে প্রতিযোগিতার দিন নির্ধারিত হওয়া উচিত। এরপর আমরাও সেই নির্ধারিত দিনের ব্যতিক্রম করবো এবং তুমিও তোমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে না। হযরত মুসা আ. বললেন, আমি এই প্রতিযোগিতার জন্য তোমাদের يَوْمُ الزِّينَة অর্থাৎ উৎসবের দিনকেই সবচেয়ে ভালো দিন মনে করি। সেদিন সূর্যোদয়ের একটু পরেই আমাদের সবাইকে মাঠে সমবেত হওয়া উচিত।

এই ঘটনা কুরআন মাজিদে বিবৃত হয়েছে এভাবে—

فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ () وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ () قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ () يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ () قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ () يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ

'এরপর মুসা তার লাঠি নিক্ষেপ করলো এবং তৎক্ষণাৎ তা এক সাক্ষাৎ অজগর হলো। এবং সে তার হাত (বগলে স্থাপন করে) বের করলো আর তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের দৃষ্টিতে শুভ্র-উজ্জ্বল প্রতিভাত হলো। ফেরআউনের সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বললো, "এ তো এক সুদক্ষ জাদুকর, এ তোমাদেরকে তোমাদের (মিসর) দেশ থেকে বহিষ্কৃত করতে চায়, এখন তোমরা কী পরামর্শ দাও?" তারা বললো, "তাকে ও তার ভাইকে কিঞ্চিৎ অবকাশ দাও এবং নগরে নগরে সংগ্রাহকদের পাঠাও, যেনো তারা তোমার কাছে প্রতিটি সুদক্ষ জাদুকর উপস্থিত করে।"' [সুরা আ'রাফ : আয়াত ১০৭-১১২]

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ () فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ () قَالَ

مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ () قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ () وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ (سورة يونس)

'পরে আমার নিদর্শনসহ মুসা ও হারুনকে ফেরআউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে প্রেরণ করি। কিন্তু তারা অহঙ্কার করে এবং তারা ছিলো অপরাধী সম্প্রদায়। এরপর যখন তাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে সত্য এলো তখন তারা বললো, "এটা তো নিশ্চয়ই স্পষ্ট জাদু।" মুসা বললো, "সত্য যখন তোমাদের কাছে এলো তখন তোমরা তার সম্পর্কে এমন কথা বলছো? এটা কি জাদু? জাদুকরেরা তো সফলকাম হয় না।" তারা বললো, "আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে যার ওপর পেয়েছি তুমি কি তা থেকে আমাদেরকে বিচ্যুত করার জন্য আমাদের কাছে এসেছো এবং যাতে দেশে তোমাদের দুইজনের প্রতিপত্তি হয়, এইজন্য? আমরা তোমাদের প্রতি বিশ্বাসী নই।" ফেরআউন বললো, "তোমরা আমার কাছে সব সুদক্ষ (ও বিচক্ষণ) জাদুরকরকে নিয়ে এসো।"' [সুরা ইউনুস : আয়াত ৭৫-৭৯]

قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى () فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى () قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى (سورة طه)

'সে বললো, "হে মুসা, তুমি কি আমাদের কাছে এসেছো তোমার জাদু দ্বারা আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করে দেয়ার জন্য? আমরাও অবশ্যই তোমার কাছে উপস্থিত করবো তার অনুরূপ জাদু। সুতরাং তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে (প্রতিযোগিতার জন্য) নির্ধারণ করো এক নির্দিষ্ট সময় এক মধ্যবর্তী স্থানে, যার ব্যক্তিক্রম আমরাও করবো না এবং তুমিও করবে না।" মুসা বললো, "তোমাদের নির্ধারিত সময় উৎসবের দিন এবং যেদিন পূর্বাহ্নে জনগণকে সমবেত করা হবে।"' [সুরা তোয়া-হা : আয়াত ৫৭-৫৯]

মোটকথা, হযরত মুসা ও ফেরআউনের মধ্যে প্রতিযোগিতার দিন হিসেবে উৎসবের দিনটি নির্ধারিত হলো। ফেরআউন তখনই তার

কর্মচারীদের নামে নির্দেশ জারি করে দিলো যে, এই রাজ্যে যেখানে যত বিচক্ষণ ও দক্ষ এবং বিখ্যাত জাদুকর রয়েছে, তাদেরকে অতি শিগগিরই রাজধানীর উদ্দেশে পাঠিয়ে দাও।

আবদুল ওয়াহ্হাব নাজ্জার বলেন, يَوْمُ الزِّينَةِ বা উৎসবের দিন বলতে মিসরীয়দের সেই উৎসবের দিনটিই উদ্দেশ্য যা ওয়াফাউন নীল (وفاء النيل) নামে প্রসিদ্ধ। কেননা, তাদের উৎসবের দিনগুলোর মধ্যে এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসবের দিন।

মিসরের জাদুকরগণ

হযরত মুসা আ.-এর নবুওতের যুগ মিসরের তৎকালীন সভ্যতার যে-ইতিহাস আমাদের সামনে উপস্থিত করছে তা থেকে এ-বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ করা যাচ্ছে যে, প্রাচীন মিসরের যাবতীয় বিদ্যা ও শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের মধ্যে জাদুর একটি স্বতন্ত্র বিদ্যার মর্যাদা ছিলো। এ-কারণে মিসরীয়দের মধ্যে জাদুকরদের মর্যাদা উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হতো। এমনকি রাজদরবারেও তাদের যথেষ্ট প্রভাব ছিলো। আর যুদ্ধ, সন্ধি, জন্ম ও মৃত্যু ইত্যাদির কোষ্ঠী নির্ণয় করা এবং গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কাজেও জাদুকরদের শরণ নেয়া হতো। তাদের জাদুকরী ফলাফলকে বেশ গুরুত্ব ও মর্যাদা দেয়া হতো। এমনকি ধর্মীয় ব্যাপারগুলোতে জাদুকরদেরকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেয়া হতো। প্রাচীন রাজকীয় সমাধিস্থলগুলোতে মমিকৃত মৃতদেহের সঙ্গে যেসব কাগজপত্র ও দলিল-দস্তাবেজ পাওয়া গেছে আর উদ্ধাকৃত শিলাখণ্ডসমূহে যেসব ছবি ও নকশা পাওয়া যাচ্ছে, এগুলোর দ্বারা তার সত্যায়ন হয়ে যায়।

প্রাচীন সম্প্রদায়গুলোর নানাবিধ ভ্রষ্টতার মধ্যে এটাও এক ধরনের ভ্রষ্টতা ছিলো যে, তারা ধর্মবিশ্বাসের মতোই জাদুর ওপর বিশ্বাস রাখতো। তাদের ধর্মীয় জীবনে জাদুও ক্রিয়াশীল আছে বলে বিশ্বাস করতো। এ-বিশ্বাসের ভিত্তিতেই তারা জাদুবিদ্যা শিখতো ও শেখাতো। তারা জাদুবিদ্যায় নতুন নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনও করতো। যেমন : ব্যবিলন (ইরাক), মিসর, চীন ও ভারতের ইতিহাস এর সাক্ষ্য বহন করছে।

এ-কারণেই মিসরীয় জনগোষ্ঠীর ওপর ফেরআউন ও তার সভাসদবর্গের এবং তাদের রাজকর্মচারীদের এ-কথা জাদুর মতো কার্যকরী হয়েছিলো যে, মুসা একজন জাদুকর। সে তার জাদুবিদ্যার দক্ষতা ও

কলাকৌশলের প্রভাব কাজে লাগিয়ে মিসর রাজ্যের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে চায় এবং তোমাদেরকে মিসর থেকে বহিষ্কার করে দিতে চায়। এর একমাত্র প্রতিকার এই যে, মিসর রাজ্যের সমস্ত দক্ষ ও অভিজ্ঞ জাদুকরকে একত্র করা হোক এবং মুসাকে পরাভূত করে তার এই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয়া হোক। হযরত মুসা আ. এই প্রস্তাবটিকে এজন্য সুবর্ণ সুযোগ মনে করলেন যে, তিনি আল্লাহ তাআলার যত মুজেযা (নিদর্শন) ফেরআউনকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখিয়েছিলেন, তারা ওইসব মুজেযাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো এই বলে যে, এ তো জাদু। সুতরাং এখন জাদুকরদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার পরও আল্লাহপাকের মুজেযাই জয়ী হবে। তখন নিরুপায় হয়ে সত্যের সামনে মাথা নত করতে তারা বাধ্য হবে এবং সত্য স্বীকার না করে তাদের কোনো উপায়ই থাকবে না। তিনি আরো ভাবলেন, যদিও আল্লাহর ওহি প্রতি বিশ্বাস এবং উজ্জ্বল প্রমাণ ও দলিলের দ্বারা আল্লাহর নিদর্শনের সত্যতার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে দেয়া হয়েছে, তবুও ফেরআউন এবং তার কর্মচারীরা সবসময় ওইসব ঘটনাকে জাদু বলে জনসাধারণকে আসল সত্য থেকে উদাসীন ও অজ্ঞ রাখতে চেষ্টা করেছে, অথবা তীব্র বিদ্বেষ ও হিংসা এবং একগুঁয়েমি তাদের নিজেদেরকেও সত্যের আলো থেকে বঞ্চিত রেখেছে। সুতরাং, উৎসবের দিন যখন সর্বস্তরের বিশিষ্ট ও সাধারণ মানুষের সমাবেশে জাদুকরগণ অক্ষম হয়ে আমার সত্যতা স্বীকার করে নেবে, তখন কারো পক্ষে মুখ খুলে কথা বলার সুযোগ থাকবে না এবং জনসাধারণের সামনে সত্যের বহিঃপ্রকাশ দীন প্রচারের জন্য উৎকৃষ্ট উপায় বলে বিবেচিত হবে।

জাদু

অভিধানে سحر (জাদু) শব্দের অর্থ গুপ্ত বিষয় ও অদৃশ্য বস্তু ভোরের প্রথম অংশকে سحر বলা হয় এইজন্য যে, তখনো দিনের আলো পরিপূর্ণ প্রকাশ পায় না এবং কিছুটা অন্ধকার তখনো অবশিষ্ট থাকে। ইলম বা জ্ঞানের পরিভাষায় سحر (জাদু) বলা হয় এমন বিচিত্র ও বিস্ময়কর ব্যাপারকে, যার অস্তিত্বে আগমনের কারণ দৃষ্টির অগোচরে থেকে যায় এবং বাহ্য দৃষ্টিতে অনুভূত হয় না।

اعلم أن لفظ السحر في عرف الشرع مختص بكل أمر يخفى سببه ويتخيا
غير حقيقته ويجري مجرى التمويه والخداع.

ণ থাকে যে, শরিয়তের পরিভাষায় سحر (জাদু) শব্দটি এমনসব
ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যার কার্যকারণ গোপনীয় থাকে এবং বাস্তবের
াত দৃশ্য দৃষ্ট হয় (দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে)। তা মূলত বিভ্রম ও প্রবঞ্চনার
।।'[৫৬]

। কিছুটা বাস্তবতা আছে না-কি তা কেবলই দৃষ্টিবিভ্রম, বাস্তবতা
চ কিছুই নেই—এ-ব্যাপারে আহলে সুন্নত ওয়ালা জামায়াতের
ায়ে কেরাম এই মত পোষণ করেন যে, জাদু সত্যই একটি বাস্তব
র এবং ক্ষতিকর কার্যে ক্রিয়াশীল। আল্লাহ তাআলা তাঁর পূর্ণ
ত ও মুসলেহতের প্রেক্ষিতে জাদুতে এমন ক্ষতিকর ক্রিয়াশীলতা
দিয়েছেন, যেমন হলাহল বিষ ও অন্যান্য ক্ষতিকর পদার্থের মধ্যে
ছেন। এমন নয়, জাদু আল্লাহর কুদরতের মুখাপেক্ষী না হয়ে,
বিল্লাহ নিজেই ক্রিয়া করতে সক্ষম। কেননা, এমন বিশ্বাস তো
ঃ কুফরি।

ত ইমাম আবু হানিফা রহ., 'আহকামুল কুরআন'-এর সংকলক আবু
রাযি আল-জাস্সাস রহ., আবু জাফর আসফারাইনি শাফি রহ.,
মা ইবনে হাযম জাহেরি আন্দালুসি রহ. এবং মু'তাযিলাগণ বলেন,
(জাদু)-র মূল ব্যাপার হাত-সাফাই, দৃষ্টিবিভ্রম, কল্পনার প্রবঞ্চনা
আর কিছুই নয়। নিঃসন্দেহে তা একটি বাতিল ব্যাপার ও অমূলক
। যেমন : ইমাম আবু বকর রাযি বলেন—

ومتى أطلق فهو اسم لكل أمر مموه باطل لا حقيقة له ولا ثبات.

ত-তাফসিরুল কাবির : মাফাতিহুল গাইব, ফখরুদ্দিন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন
বিন হুসাইন আর-রাযি আশ-শাফি রহ. (১১৫০-১২১০ খ্রিস্টাব্দ), প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা
।

'যখন سحر (জাদু) শব্দটিকে সাধারণভাবে (বিশেষণহীন) ব্যবহার করা হয় তখন তা কেবল এমনসব বিষয়ের নাম যা বিভ্রম ও বাতিল; এর কোনো বাস্তবতাও নেই, স্থায়িত্বও নেই।'[৫৭]

আর হাফেয ইমাদুদ্দিন বিন কাসির বলেন—

وقد ذكر الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة رحمه الله في كتابه '' الاشراف على مذاهب الاشراف '' بابا في السحر فقال: أجمعوا على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا حقيقة له عنده.

'ওয়াযির আবুল মুযাফ্ফর ইয়াহ্ইয়া বিন মুহাম্মদ বিন হুবায়রাহ তাঁর রচিত গ্রন্থ 'আল-ইশরাফ আলা মাযাহিবিল আশরাফ'-এ سحر (জাদু) সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন, উলামায়ে কেরাম এ-বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছেছেন যে, سحر (জাদু)-এর (কিছু-না-কিছু) বাস্তবতা আছে; কিন্তু ইমাম আবু হানিফা রহ. তাঁদের সঙ্গে একমত নন। তিনি বলেন যে, তাঁর কাছে জাদুর কোনো বাস্তবতা নেই।'[৫৮]

وقال أبو عبد الله القرطبي: وعندنا أن السحر حق وله حقيقة يخلق الله عنده ما يشاء خلافا للمعتزلة وأبي إسحق الاسفرايني من الشافعية حيث قالوا: إنه تمويه وتخييل.

'আবু আবদুল্লাহ কুরতুবি বলেন, আমাদের কাছে سحر (জাদু)-র সত্যতা আছে এবং তার বাস্তবতাও আছে (তা বাস্তব বিষয়)। আল্লাহ তাআলা এর মাধ্যমে যা ইচ্ছা সৃষ্টি করে দেন। কিন্তু মু'তাযিলা সম্প্রদায় এবং ইমাম শাফির মতাদর্শের আলেমগণের মধ্যে আবু ইসহাক

---

[৫৭] আহকামুল কুরআন, আবু বকর আহমদ বিন আলি আর-রাযি আল-জাস্সাস আল-হানাফি রহ. (৯১৭-৯৮০ খ্রিস্টাব্দ), প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৮।

[৫৮] তাফসিরুল কুরআনির আযিম, ইমাদুদ্দিন আবুল ফিদা ইসমাইল বিন কাসির আল-কুরাশি (তাফসিরে ইবনে কাসির), প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪৭।

আসফারাইয়ানি উল্লিখিত বক্তব্যের বিপরীত মত পোষণ করেন। তাঁরা বলেন, জাদু প্রবঞ্চনা ও দৃষ্টিবিভ্রমের নাম।'[৫৯]

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানি রহ. বলেন—

واختلف في السحر فقيل هو تخييل فقط ولا حقيقة له وهذا اختيار أبي جعفر الاستراباذي من الشافعية وأبي بكر الرازي من الحنفية وابن حزم الظاهري وطائفة قال النووي والصحيح أنه له حقيقة وبه قطع الجمهور وعليه عامة العلماء.

'سحر (জাদু) সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এটা শুধু দৃষ্টিবিভ্রমের নাম, এর কোনো সত্যতা বা বাস্তবতা নেই। শাফি মতাবলম্বী আবু জাফর ইসতারবাযি, হানাফি মতাবলম্বী আবু বকর আর-রাযি, ইবনে হাযাম জাহেরি আন্দালুসি এবং একটি ছোট জামাত এই ধারণা পোষণ করেন। আর ইমাম আবু যাকারিয়া নববি বলেন, বিশুদ্ধ মত এই যে, সমস্ত বাস্তব বিষয়ের মতো سحر (জাদু)-রও একটি বাস্তবতা আছে। অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম চূড়ান্তভাবে এ-মতেই বিশ্বাসী এবং সাধারণ আলেমগণেরও অভিমতও এটাই।'[৬০]

যেসকল উলামায়ে কেরাম سحر (জাদু)-র সত্যতা ও বাস্তবতা মানেন, তাঁদের মধ্যেও আবার এ-বিষয়ে মতভেদ দেখা যায় যে, আল্লাহ তাআলা কি জাদুর মধ্যে এমন ক্রিয়াশীলতা দান করেছেন যে তা কোনো বস্তুর সত্তা ও মূলকেও পরিবর্তন করে দিতে পারে, না-কি তা অন্যান্য ক্ষতিকর বস্তুর মতো শুধু ক্ষতিকর। এটা সম্ভব নয় যে, জাদুর ক্রিয়ায় মানুষ ঘোড়ায় রূপান্তরিত হয়ে যায়, অথবা গাধা মানুষ হয়ে যায়। একটি ক্ষুদ্র দলের ধারণা, জাদুর মধ্যে মূল ও সত্তাকেও পরিবর্তন করে দেয়ার শক্তি ও ক্রিয়াশীলতা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মত, سحر (জাদু)-র মধ্যে আদৌ এ-ধরনের ক্রিয়াশীলতা প্রদান করা হয়

[৫৯] প্রাগুক্ত।

[৬০] ফাতহুল বারি শারহু সহিহিল বুখারি, শিহাবুদ্দিন আবুল ফযল আহমদ বিন আলি বিন হাজার আল-আসকালানি রহ. (১৪৭২-১৪৪৮ খ্রিস্টাব্দ), দশম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮২।

নি এবং سحر (জাদু)-র দ্বারা মূল সত্তার পরিবর্তন ঘটে না। বরং যখন দেখা যায় পরিবর্তন ঘটেছে, সেটা আসলে দৃষ্টিবিভ্রম এবং বিভ্রম-শক্তির কলা-কৌশল ছাড়া কিছু নয়। হাফেয ইবনে হাজার আসকালানি রহ. বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করে বলেছেন—

لكن محل النزاع هل يقع بالسحر انقلاب عين أو لا فمن قال أنه تخييل فقط منع ذلك ومن قال أن له حقيقة اختلفوا هل له تأثير فقط بحيث يغير المزاج فيكون نوعا من الامراض أو ينتهي إلى الاحالة بحيث يصير الجاد حيوانا مثلا وعكسه فالذي عليه الجمهور هو الاول وذهبت طائفة قليلة إلى الثاني.

'এখানে মতভেদের ক্ষেত্র এই বিষয়টি যে, سحر (জাদু) দ্বারা কোনো বস্তুর মূল সত্তার পরিবর্তন সাধিত হয় কি, না হয় না। যাঁরা বলেন, سحر (জাদু) কেবল দৃষ্টিবিভ্রমের নাম তারা তো সত্তার পরিবর্তন অস্বীকার করেন। আর যাঁরা বলেন, سحر (জাদু)-এর বাস্তবতা বা সত্যতা বলতে কিছু একটা আছে, তাঁরা এ-ব্যাপারে বিভিন্ন মত পোষণ করেন : জাদুর ক্রিয়া এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ যে, তা স্বভাবের মধ্যে রোগ-ব্যাধির মাধ্যমে যে-ধরনের পরিবর্তন ঘটে তেমন পরিবর্তন ঘটায়। ফলে জাদুও একটি ব্যাধি বলে গণ্য হয়। বরং জাদু তার চেয়েও শক্তিশালী যে, তা কোনো বস্তুর মূল সত্তাকেই পরিবর্তন করে দিতে পারে। যেমন : নিষ্প্রাণ পদার্থকে প্রাণীতে রূপান্তর করতে পারে অথবা তার বিপরীতও ঘটাতে পারে (প্রাণীকে নিষ্প্রাণ বস্তুতে পরিণত করতে পারে)। জমহুর উলামায়ে কেরামের মত প্রথমটি (সত্তার পরিবর্তন না ঘটা) আর দ্বিতীয়টি (সত্তার পরিবর্তন ঘটা) ক্ষুদ্র একটি জামাতের মত।'

এসব আলোচনার পর হাফেয ইবনে হাজার আসকালানি রহ. ফেরআউনের জাদুকরদের জাদু প্রদর্শন—যা তারা উৎসবের দিন মুসা আ.-এর মোকাবিলায় করেছিলো—প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করে বলেন, সকল উলামায়ে কেরাম এ-ব্যাপারে একমত যে, তা কেবল দর্শকদের দৃষ্টিবিভ্রম এবং ধোঁকা ও প্রতারণায় সীমাবদ্ধ ছিলো। আবু বকর রাযি আল-জাস্‌সাস রহ. এবং ইবনে হাজার আসকালানি রহ. দুজনেই এই

বিবরণ দিচ্ছেন যে, ফেরআউনের জাদুকরদের লাঠি ও চামড়ার রশিসমূহের মূল সত্তার পরিবর্তন ঘটে নি এবং সেগুলো সত্যিকারের সাপে রূপান্তরিত হয় নি। মূলত, সেগুলোর ভেতর পারদ পুরে দেয়া হয়েছিলো। আর যে-জমিনের ওপর জাদুর প্রদর্শনী হয়েছিলো, তার নিম্নদেশ খনন করে তার অভ্যন্তরে আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হয়েছিলো। ফলে, নির্দিষ্ট সময়ে নিচের আগুনের উত্তাপে পারদে গতির সঞ্চার হয় এবং লাঠি ও রশিগুলো সাপের মতো দৌড়াতে শুরু করে।

ইমাম ফখরুদ্দিন আর-রাযি তাঁর তাফসিরগ্রন্থ 'মাফাতিহুল গাইব'-এ سحر (জাদু) সম্পর্কে আলোচনা করে তার আভিধানিক অর্থের প্রেক্ষিতে এমন সব বিষয়কেও سحر (জাদু)-র প্রকারসমূহের মধ্যে গণ্য করেছেন যা সাধারণ দৃষ্টিতে বিস্ময়কর ও আশ্চর্যজনক মনে করা হয়। যেমন : মেসমেরিজম (mesmerism)[৬১], হিপনোটিজম (hypnotism), তাবিজ, আশ্চর্যজনক চিত্রমালা, বিজ্ঞানের আবিষ্কারসমূহ এবং দুনিয়ার নানাবিধ বিস্ময়ক ব্যাপারসমূহ, এমনকি বক্তার চিত্তাকর্ষক বক্তৃতাকেও তিনি জাদুর ব্যাপক অর্থের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। একটি হাদিসে এসেছে—

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "নিঃসন্দেহে কোনো কোনো বক্তৃতা জাদুতুল্য (ক্রিয়াশীল)।"[৬২]

সুতরাং, এ-কথা পরিষ্কারভাবে জেনে রাখা আবশ্যক যে, যে-জাদু ধর্ম ও চারিত্রিক বিচারে নিন্দনীয় এবং পথভ্রষ্টতা ও কুফরি হিসেবে বিবেচিত হয়, সেই জাদুর সঙ্গে উপরিউক্ত প্রকারসমূহের কোনোই সম্পর্ক নেই।

জাদু এবং ধর্ম

ইসলাম ধর্মের ফেকাহ শাস্ত্রবিদগণ سحر (জাদু) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, যেসব জাদুক্রিয়ায় শয়তান, অপবিত্র আত্মা এবং গায়রুল্লাহর সাহায্য

---

[৬১] কারো চিন্তা ও মনোযোগকে কোনো বিষয়ের প্রতি এমনভাবে কেন্দ্রীভূত করা যে সে ভিন্ন কিছু চিন্তা করতে সক্ষম থাকে না।

[৬২] সহিহ বুখারি : হাদিস ৫১৪৬।

নেয়া হয়, সেগুলোকে প্রয়োজন পূরণকারী সাব্যস্ত করে তন্ত্র-মন্ত্রের সাহায্যে বশীভূত করে কার্য হাসিল করা হয়, তবে শিরকেরই সমার্থক। যারা এই কাজ করে তারা কাফের। আর যেসব জাদুক্রিয়ায় এগুলো (শয়তান, অপবিত্র আত্মা, গায়রুল্লাহ) ব্যতীত অন্য পন্থা অবলম্বন করা হয় এবং যার দ্বারা মানুষের ক্ষতি সাধন করা হয়, তা হারাম এবং যারা এই কাজ করে তারা ফাসেক (সত্যত্যাগী ও পাপাচারী)।

কুরআন মাজিদে হযরত সুলাইমান আ.-এর ঘটনায় উল্লেখ করা হয়েছে—

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ

‘এবং সুলাইমান কুফরি করে নি; কিন্তু শয়তানরাই কুফরি করেছিলো। তারা মানুষকে জাদু শিক্ষা দিতো।’ [সুরা বাকারা : আয়াত ১০২][৬৩]

আর হাদিস শরিফে এসেছে—

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا الْمُوبِقَاتِ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, “তোমরা ধ্বংসকারী বস্তুগুলো থেকে দূরে থাকো—আল্লাহর সঙ্গে শরিক সাব্যস্ত করা এবং জাদু থেকে।”[৬৪]

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানি রহ. سحر (জাদু)-র হাদিসটির ওপর আলোচনা করে বলেছেন—

قال النووي عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالاجماع وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات ومنه ما يكون كفرا ومنه ما لا يكون كفرا بل معصية كبيرة فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفر وإلا فلا وأما تعلمه وتعليمه فحرام فإن كان فيه ما يقتضي الكفر كفر.

---

৬৩ ফাতহুল বারি শারহু সহিহিল বুখারি, শিহাবুদ্দিন আবুল ফযল আহমদ বিন আলি বিন হাজার আল-আসকালানি রহ., দশম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৩।

৬৪ প্রাগুক্ত। সহিহ বুখারি : আয়াত ৫৭৬৪।

"ইমাম আবু যাকারিয়া নববি বলেন, سحر (জাদু)-এর কর্ম করা হারাম। উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মতিক্রমে তা কবিরা গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাদুকে সাতটি ধ্বংসকারী বস্তুর মধ্যে গণ্য করেছেন। জাদুর কোনো কোনো প্রকার সরাসরি কুফর। কোনো কোনো প্রকার কুফর না হলেও ভয়ঙ্কর নাফরমানি ও পাপের কাজ। সুতরাং سحر (জাদু)-এর কোনো কর্ম বা মন্ত্র যদি কুফরিমূলক হয়, তবে তা কুফরি; অন্যথায় কুফরি নয়। সারকথা এই যে, سحر (জাদু) শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়া সম্পূর্ণরূপে হারাম; আর তার মধ্যে কুফরিকে আবশ্যক করে এমন বিষয় যদি থাকে তবে তা অবশ্যই কুফরি।"[৬৫]

মুজেযা ও سحر (জাদু)-র মধ্যে পার্থক্য

ইসলামের আলেমগণের মধ্যে আবহমান কাল থেকে এ-বিষয়টি একটি মতামতের যুদ্ধক্ষেত্র ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হিসেবে চলে আসছে যে, জাদু এবং মুজেযার মধ্যে পার্থক্য কী। একজন লোক কেমন করে স্থির করবে যে, এটা নবী ও রাসুলের মুজেযা না-কি জাদুকরের জাদু। এ-প্রসঙ্গে যেসব গুরুত্বপূর্ণ ইলমি দলিল ও প্রমাণসমূহ উদ্ধৃত করা হয়েছে তা জানার জন্য আকায়িদ শাস্ত্রের গ্রন্থসমূহ পাঠ করা আবশ্যক। বিশেষ করে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ.-এর كتاب النبوات (কিতাবুন নবুওয়াত) এবং শায়খ মুহাম্মদ সাফারিনি রহ.-এর شرح عقيدة سفاريني (শারহু আকিদা সাফারিনি)-এর পাঠ প্রণিধানযোগ্য। অবশ্য এখানে একটি সহজবোধ্য প্রমাণ পেশ করে দেয়া সঙ্গত মনে হচ্ছে।

নবী ও রাসুলগণের প্রকৃত মুজেযা তাঁদের সেই শিক্ষা, যা সত্যপথ থেকে ভ্রষ্ট মানুষ এবং বিপথগামী সম্প্রদায়গুলোর হেদায়েতের জন্য অত্যন্ত হিতকর এবং যা নবী-রাসুলগণ ধর্মীয় ও পার্থিব কল্যাণ ও সফলতা লাভের জন্য অনুপম বিধান আকারে পেশ করে থাকেন। অর্থাৎ আল্লাহর

[৬৫] ফাতহুল বারি শারহু সহিহিল বুখারি, শিহাবুদ্দিন আবুল ফযল আহমদ বিন আলি বিন হাজার আল-আসকালানি রহ., দশম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৩।

কিতাব। কিন্তু যেভাবে জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিগণ আল্লাহর নবীর উপস্থাপিত জ্ঞান ও হেকমত এবং তাঁর বর্ণিত হেদায়েত ও নসিহতের সত্যতা ও পূর্ণতাকে যাচাই করে থাকেন, তেমনি দুনিয়ার সাধারণ মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতিও এ-বিষয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, তারা সত্যতা ও সততা পরখ করার জন্যও এমন কিছু বিষয়ের আকাঙ্ক্ষী হয়, যা সত্য আনয়নকারীর আধ্যাত্মিক শক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং যার মোকাবিলা করতে দুনিয়ার যাবতীয় শক্তি অক্ষম হয়ে যায়। কেননা, সাধারণ মানুষের জ্ঞান সত্যকে উপলব্ধি করার জন্য একেই মাপকাঠি সাব্যস্ত করে।

অতএব, আল্লাহ তাআলার এই নিয়ম প্রচলিত আছে যে, তিনি নবী ও রাসুলগণকে সত্য ধর্মের শিক্ষা ও পয়গাম প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে একটি বা একাধিন নিদর্শনও দান করে থাকেন। আর নবী-রাসুলগণ যখন নবুওতের দাবির সঙ্গে সঙ্গে কোনো কারণ ও উপকরণ ছাড়াই এমন কোনো নিদর্শন প্রকাশ করেন, দুনিয়ার কোনো শক্তিই যার মোকাবিলা করতে পারে না, তখন তার নাম হয় মুজেযা।

আর এই একই এটাও আল্লাহ তাআলার নিয়ম যে, কোনো নবী ও রাসুলকে যে-মুজেযা প্রদান করা হয়, তা ওই জাতীয়ই হয়ে থাকে, যে-বিষয়ে সেই কওমের যাদেরকে নবী ও রাসুল প্রথম সম্বোধন করে হেদায়েতের বাণী শুনিয়েছেন তাদের পূর্ণ অভিজ্ঞতা থাকে এবং সে-বিষয়ের যাবতীয় সূক্ষ্ম তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত থাকে। তাদের জন্য এটা হৃদয়ঙ্গম করতে সহজ হয় যে, নবী ও রাসুলের এই মুজেযা মানবিক শক্তির চেয়ে অনেক উচ্চতর শক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। যদি একগুঁয়েমি ও হঠকারিতা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে, তবে তারা তা বিনা দ্বিধায় স্বীকার করে নেয় যে—

ایں سعادت بزور بازو نیست تانہ بخشد خدائے بخشندہ

"এই সৌভাগ্য বাহুবলে অর্জিত হবে না, যে-পর্যন্ত না মহান দাতা আল্লাহ তাআলা দান করেন।"

এভাবে প্রতিটি মানুষের ওপর আল্লাহ তাআলার প্রমাণ পূর্ণ হয়ে যায়।

অতএব, মুজেযা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলারই কর্ম, যা একজন সত্য নবীর সত্যতা প্রমাণের জন্য কোনো কারণ ও উপকরণ ব্যতীত অস্তিত্ব

লাভ করে থাকে। তার ভিত্তি কোনো নিয়ম-কানুনের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। একটি বিদ্যা বা কৌশলের মতো তা শিখে নেয়া যেতে পারে না। নবী-রাসুলও তা সবসময় করে দেখাতে সক্ষম হন না, যতক্ষণ না সত্যের বিরোধীদের সামনে চ্যালেঞ্জস্বরূপ তা প্রদর্শন করার প্রয়োজন হয়। সুতরাং, যখন সেই গুরুত্বপূর্ণ সময় এসে পড়ে এবং নবী ও রাসুল আল্লাহপাকের প্রতি রুজু হন, তখন আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে তা করে দেখানোর জন্য শক্তি প্রদান করা হয়। পক্ষান্তরে سحر (জাদু) তার বিপরীত। তা একটি বিদ্যা ও কলা-কৌশলমাত্র। প্রতিটি দক্ষ জাদুকর নিয়ম-কানুন অনুসরণ করে জাদুকে সবসময়ই কাজে লাগাতে পারে। এর কারণ ও উপকরণ যদিও সাধারণ দৃষ্টির অগোচরে থেকে যায়, কিন্তু এ-ব্যাপারে সব অভিজ্ঞ লোক তা অবগত থাকে। এ-কারণেই জাদু অন্যান্য বিদ্যা ও শাস্ত্রের মতো একটি সংকলিত ও সুবিন্যস্ত বিষয়। মিসরীয়, চৈনিক ও ভারতীয়রা জাদুকে উৎকর্ষমণ্ডিত ও চালু করেছে এবং এটিকে পূর্ণতার সীমায় পৌঁছে দিয়েছে।

এই হলো বিষয়টি ইলমি ও জ্ঞানগত দিক, যার দ্বারা মুজেযা ও জাদুর সীমারেখা সম্পূর্ণরূপে পৃথক ও আলাদা হয়ে যায়। বাকি থাকলো অনুভূতি ও চাক্ষুষ দর্শনের ব্যাপারটি। এ-ক্ষেত্রে মুজেযা ও জাদুর মধ্যে পার্থক্য এই যে, জাদুকরের সাধারণ জীবন ভয়-ভীতি, কষ্ট ও যন্ত্রণা প্রদান এবং অসৎ কাজের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। এ-কারণে মানুষ জাদুকরকে ভয় করে। জাদুকরের সামনে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে নবী ও রাসুলের গোটা জীবনটাই সত্যতা ও সততা, আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানবজাতির প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনা, খোদাভীতি ও পবিত্রতার সঙ্গে সম্পর্কিত থাকে এবং তাঁদের চরিত্র পবিত্র, নিষ্কলুষ, পরিচ্ছন্ন ও উজ্জ্বল হয়ে থাকে। তিনি মুজেযাকে পেশা বানিয়ে নেন না; বরং গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সততা ও সত্যের সংরক্ষণে তা প্রদর্শন করে থাকেন। আর তিনি এমন সময় মুজেযা প্রদর্শন করে থাকেন, যখন তাঁর শত্রুরাও তাঁর পবিত্রতা, সততা ও চারিত্রিক নিষ্কলুষতার স্বীকৃতি আগে থেকেই দিয়ে থাকে। কিন্তু তারা সত্যের দাওয়াত ও তাবলিগকে হয়তো সন্দেহের চোখে দেখে অথবা অবিশ্বাসের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে। এরপর তারা নবীর মুজেযা দাবি করে। তা ছাড়া কখনো যদি মুজেযা ও জাদুর

প্রতিযোগিতা এসে পড়ে, তখন মুজেযাই জয়ী হয় এবং উচ্চ থেকে উচ্চস্তরের জাদুও পরজিত ও অক্ষম হয়ে পড়ে; কিন্তু এর বিপরীত ঘটা সম্পূর্ণ অসম্ভব। যেমন : জাদুকর ও আম্বিয়ায়ে কেরামের প্রতিযোগিতার ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করছে।

মোটকথা, হযরত মুসা আ.-কে লাঠি ও শুভ্রোজ্জ্বল হাতের মুজেযা দান করা হয়েছিলো এইজন্য যে, তাঁর যুগে মিসর ছিলো জাদুর কেন্দ্রস্থল, আর যাদুবিদ্যাও ছিলো তার পূর্ণ যৌবনে। আর মিসরীয়রা একে গোটা পৃথিবীর মোকাবিলায় পূর্ণতার উচ্চস্তরে পৌছে দিয়েছিলো।

অতএব, আল্লাহ তাআলার চিরকালীন নিয়মের চাহিদা মোতাবেক হযরত মুসা আ.-কে এমন মুজেযা প্রদান করা হয়েছিলো, যা তারই জাতীয় কিছুর সঙ্গে সম্পর্কিত হয়। যেনো তাদের অবিশ্বাসের ওপর হঠকারিতা সীমা অতিক্রম করলে এবং শত্রু ও বিপক্ষ দল তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি লোপকারী জাদু দ্বারা তাঁর সঙ্গে মোকাবিলা করতে অগ্রসর হলে আল্লাহ তাআলার মুজেযা ও নিদর্শন বিপক্ষ ও বিরোধী দলকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করে যে, মুসার কাছে যে-শক্তি রয়েছে তা মানুষের কলাকৌশল ও বিস্ময়কর কার্যাবলির চেয়ে অনেক উর্ধ্বে এবং মানবিক ক্ষমতার বাইরে। এভাবে সাধারণ ও বিশিষ্ট সর্বস্তরের মানুষের বিশ্বাস হয়ে যায় যে, এগুলো সত্য মুজেযা এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সংঘটিত। তাদের মুখ তা স্বীকার করুক বা না করুক, জনসমাবেশে তাদের অক্ষমতা ও অপারগতা তাদের অন্তরসমূহের স্বীকৃতির সাক্ষ বহন করে।

হযরত মুসা আ. ও জাদুকরদের প্রতিযোগিতা

যাইহোক। উৎসবের দিন এসে পৌছালো। উৎসবের ময়দানে সম্পূর্ণ রাজকীয় জাঁকজমক ও আড়ম্বরের সঙ্গে ফেরআউন তার সিংহাসনে সমাসীন। সভাসদবর্গও তাদের মর্যাদা অনুসারে নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট। লাখ লাখ মানুষ সত্য ও মিথ্যার লড়াই প্রত্যক্ষ করার জন্য উপস্থিত। একদিকে মিসরের বিখ্যাত ও বিচক্ষণ জাদুকরের দল তাদের জাদুর সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে দণ্ডায়মান, অপরদিকে আল্লাহর রাসুল, সত্যের পয়গামবাহী এবং সত্য ও সতার প্রতীক হযরত মুসা ও হারুন আ. প্রস্তুত। ফেরআউন বেশ উল্লাস বোধ করছে। কেননা, সে এই বিশ্বাসে বিভোর রয়েছে যে, মিসরের জাদুকরেরা এক নিমিষেই এই দুই ব্যক্তিকে

পরাজিত করে ছাড়বে। সে জাদুকরদেরকে উৎসাহ প্রদান করছে এবং বলছে, তোমরা মুসাকে পরাজিত করে দিতে পারলে তোমাদেরকে শুধু বিপুল পরিমাণে পুরস্কারই প্রদান করা হবে না; বরং আমার রাজদরবারে তোমাদের জন্য বিশিষ্ট স্থান নির্ধারিত করে দেয়া হবে। জাদুকরেরাও তাদের সফলতা লাভে পূর্ণ আস্থাশীল হয়ে ফেরআউন থেকে মান ও মর্যাদা বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করছে এবং তারা ভবিষ্যতের কল্পনায় খুবই উল্লসিত ও উচ্ছ্বসিত।

কুরআন মাজিদ ঘটনার এই অংশ বর্ণনা করছে এভাবে—

وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ () قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (سورة الأعراف)

'জাদুকরেরা ফেরআউনের কাছে এসে বললো, "আমরা যদি বিজয়ী হই তবে আমাদের জন্য পুরস্কার (ও সম্মান) থাকবে তো?' সে বললো, "হ্যাঁ, এবং অবশ্যই তোমরা আমার (রাজদরবারে) সান্নিধ্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"' [সুরা আ'রাফ : আয়াত ১১৩-১১৪]

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ () وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ () لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ () فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ () قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (سورة الشعراء)

'এরপর এক নির্ধারিত দিনে নির্দিষ্ট সময়ে জাদরকদেরকে একত্র করা হলো, এবং লোকদেরকে বলা হলো, "তোমরাও সমবেত হচ্ছো কি?" (অর্থাৎ তোমরাও সমবেত হও) যেনো আমরা জাদুকরদের অনুসরণ করতে পারি, যদি তারা বিজয়ী হয়।" এরপর জাদুকরেরা ফেরআউনের কাছে এসে বললো, "আমরা যদি বিজয়ী হই তবে আমাদের জন্য পুরস্কার থাকবে তো?' ফেরআউন বললো, "হ্যাঁ, এবং অবশ্যই তোমরা তখন আমার ঘনিষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"' [সুরা শুআরা : আয়াত ৩৮-৪২]

জাদুকরেরা ফেরআউনের পক্ষ থেকে নিশ্চিত হয়ে মুসা আ.-এর দিকে ফিরলো। কিন্তু একে অপরকে চ্যালেঞ্জ করার আগেই মুসা আ. দীন প্রচারের কর্তব্য পালনে উপস্থিত জনতাকে সম্বোধন করে বললেন, "তোমার এই অবস্থার আমার খুবই আফসোস হচ্ছে। তোমরা এ কী

করছো? তোমরা আমাকে জাদুকর হিসেবে আখ্যায়িত করো আল্লাহ তাআলার ওপর মিথ্যা দোষারোপ করো না। আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, তোমাদের এই মিথ্যারোপের শাস্তি হিসেবে তিনি তোমাদেরকে না সমূলে উৎপাটিত করে ফেলেন। কেননা, যে-কেউই মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেছে সে বিফলই থেকে গেছে।" লোকেরা মুসা আ.-এর কথা শুনে পরস্পর তর্কবিতর্ক শুরু করে দিলো এবং কানঘুষা করতে লাগলো। সভাসদরাও এই অবস্থা দেখে জাদুকরদেরকে বললো, এরা দুই ভাই নিঃসন্দেহে জাদুকর। তারা তাদের জাদুবলে তোমাদেরকে তোমাদের ওপর জয়ী হতে চায় এবং তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করে দিতে চায়। তোমরা তোমাদের কাজ শুরু করে দাও। সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে দৃঢ়পদে মুসার মোকাবিলায় দাঁড়িয়ে যাও। আজ যে-পক্ষই জয়লাভ করবে, সে-পক্ষই সফলকাম বলে বিবেচিত হবে।

ঘটনার এই অংশ কুরআন বর্ণনা করেছে এভাবে—

قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى () فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى () قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى () فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى (سورة طه)

'মুসা তাদেরকে বললো, "দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না। করলে, তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দিয়ে সমূলে ধ্বংস করে দেবেন। যে মিথ্যা রচনা করেছে সে ব্যর্থ হয়েছে।" তাদের নিজেদর মধ্যে নিজেদের কর্ম সম্পর্কে বিতর্ক করলো এবং তারা গোপনে পরামর্শ করলো (তর্ক-বিতর্ক ও চুপে চুপে কানাঘুষা করলো)। তারা বললো, "এই দুইজন অবশ্যই জাদুকর, তারা চায় তাদের জাদু দ্বারা তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করতে এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবন ব্যবস্থা ধ্বংস করতে। অতএব তোমরা তোমাদের জাদুক্রিয়া সংহত করো। তারপর সারিবদ্ধ হয়ে উপস্থিত হও এবং যে আজ জয়ী হবে সে-ই সফল (প্রমাণিত) হবে।"' [সুরা তোয়া-হা : আয়াত ৬১-৬৪]

জাদুকরেরা এগিয়ে গিয়ে মুসা আ.-কে বললো, তোমার কাহিনি এখন বাদ দাও। বলো, প্রতিযোগিতা তোমার পক্ষ থেকে শুরু হবে না-কি

দের পক্ষ থেকে। হযরত মুসা আ. দেখলেন তাঁর সতর্কীকরণের
না ক্রিয়াই তাদের ওপর হলো না। তাই তিনি বললেন, ঠিক আছে,
রাই শুরু করো এবং জাদুবিদ্যায় তোমাদের দক্ষতা ও বিচক্ষণতার
পরিচয় পেশ করো। তখনই জাদুকরেরা তাদের রশি, বাণ ও
গুলোকে মাটির ওপর ছেড়ে দিলো। সেগুলো সাপ ও অজগরে
চরিত হয়ে দৌড়াচ্ছে দৃষ্টিগোচর হলো। হযরত মুসা আ. তা দেখে
মনে ভয় ও আশঙ্কা বোধ করলেন। তা এ-কারণে যে, যদি
করা এই প্রদর্শনী দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে এবং জাদুকরদের
ক সত্য বিষয় মনে করে। কেননা, এমনটা ঘটলে তো এই প্রভাবিত
। তাদের সত্য গ্রহণ করার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। তখন
হ তাআলা তাঁকে নিশ্চিন্ত করে দিলেন এবং ওহি দ্বারা জানিয়ে
ন যে, মুসা, ভয় করো না। আমার প্রতিশ্রুতি এই যে, তুমিই জয়ী
। তোমার লাঠিকে মাটির ওপর ফেলে দাও। মুসা আ. তাঁর লাঠিকে
র ওপর ফেললেন। তৎক্ষণাৎ তা বিশাল অজগরে পরিণত হয়ে
করদের যাবতীয় ভেলকিবাজি গিলে ফেললো এবং কিছুক্ষণের
ই গোটা ময়দান পরিষ্কার হয়ে গেলো। এভাবে জাদুকরেরা তাদের
। প্রদর্শনীতে অকৃতকার্য ও ব্যর্থ হয়ে গেলো।

ান মাজিদ ঘটনার এই অংশকে বিবৃত করেছে এভাবে—

قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى () قَالَ بَلْ أَلْقُو
حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى () فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِه
مُوسَى () قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى () وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا
إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى (سورة طه)

বললো, "হে মুসা, হয় তুমি নিক্ষেপ করো অথবা প্রথমে আমরাই
প করি।" মুসা বললো, "বরং তোমরাই নিক্ষেপ করো।" তাদের
প্রভাবে অকস্মাৎ মুসার মনে হলো তাদের দড়ি ও লাঠিগুলোর
ছুটি করছে। মুসা তার অন্তরে কিছুটা ভীতি অনুভব করলো (যে,
দৃশ্য দেখে জনসাধারণ প্রভাবিত না হয়ে পড়ে)। আমি বললাম,
ভয় করো না, তুমিই প্রবল (তুমিই বিজয়ী হবে)। তোমার ডান
যা আছে তা নিক্ষেপ করো (মাটিতে)। তা তারা যা করেছে

(কলাকৌশলের সাপগুলো) সেগুলোকে গ্রাস করে ফেলবে। তারা যা করেছে তা তো কেবল জাদুকরের কৌশল। জাদুকর যেখানেই থাকুক, সফল হবে না।"' [সুরা তোয়া-হা : আয়াত ৬৫-৬৯]

قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ () قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ () وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ () فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ () فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ () وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (سورة الأعراف)

'তারা বললো, "হে মুসা, তুমিই কি নিক্ষেপ করবে, না আমরাই নিক্ষেপ করবো।" সে বললো, "তোমরাই (আগে) নিক্ষেপ করো।" যখন তারা নিক্ষেপ করলো (জাদুকরেরা রশি ও লাঠি নিক্ষেপ করলো) তখন লোকদের চোখে জাদু করলো (দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটালো), তাদেরকে আতঙ্কিত করলো এবং তারা এক বড় রকমের জাদু দেখালো। আমি মুসার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, "তুমিও তোমার লাঠি নিক্ষেপ করো।" সহসা তা তাদের অলীক সৃষ্টিগুলোকে গ্রাস করতে লাগলো; ফলে সত্য প্রতিষ্ঠিত হলো এবং তারা যা করছিলো তা মিথ্যা প্রতিপন্ন হলো। সেখানে তারা পরাভূত হলো ও লাঞ্ছিত হলো। এবং জাদুকরেরা সিজদায় নিক্ষিপ্ত হলো।' [সুরা আ'রাফ : আয়াত ১১৫-১২০]

فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ () فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ () وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (سورة يونس)

'এরপর যখন জাদুকরেরা এলো, তখন তাদেরকে মুসা বললো, তোমাদের যা নিক্ষেপ করার নিক্ষেপ করো।" যখন তারা নিক্ষেপ করলো তখন মুসা বললো, " তোমরা যা এনেছো তা জাদু, নিশ্চয় আল্লাহ সেটাকে অসার করে দেবেন। আল্লাহ অবশ্যই অশান্তি সৃষ্টিকারীদের কর্ম সফল করেন না।" অপরাধীরা অপ্রীতিকর মনে করলেও আল্লাহ তার বাণী অনুযায়ী সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবেন।' [সুরা ইউনুস : আয়াত ৮০-৮২]

জাদুবিদ্যায় পারদর্শী ও বিচক্ষণ জাদুকরেরা যখন মুসা আ.-এর লাঠির এই অলৌকিক ব্যাপার দেখলো, তারা প্রকৃত অবস্থা বুঝে গেলো। যে-সত্যকে এতক্ষণ পর্যন্ত ফেরআউন ও তার সভাসদবর্গ গোপন রাখতে চেষ্টা করেছিলো, তারা তা আর গোপন রাখতে পারলো না। জাদুকরেরা সমাবেশের সামনেই স্বীকার করে নিলো যে, মুসা আ. এই কাজ জাদুর অনেক উর্ধ্বে, তা আল্লাহ প্রদত্ত মুজেযা। তার সঙ্গে জাদুর কোনো দূরতম সম্পর্কও নেই। তারা তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তাআলার উদ্দেশে সিজদায় লুটিয়ে পড়লো এবং ঘোষণা করে দিলো, আমরা মুসা ও হারুনের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম। কেননা, তিনিই রাব্বুল আলামিন।

এই বিষয়টি কুরআন মাজিদ ব্যক্ত করেছে এভাবে—

فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى

'এরপর জাদুকরেরা সিজদায় নিক্ষিপ্ত হলো (মুজেযা দর্শনে জাদুকরেরা বিস্ময়াভিভূত হয়ে সিজদায় পতিত হলো)। তারা বললো, আমরা হারুন ও মুসার প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম।' [সুরা তোয়া-হা : আয়াত ৭০]

وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ () قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ () رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ

'এবং জাদুকরেরা সিজদায় নিক্ষিপ্ত হলো। তারা বললো, "আমরা ঈমান আনলাম জগৎসমূহের প্রতিপালকের প্রতি—যিনি মুসা ও হারুনেরও প্রতিপালক।"' [সুরা আ'রাফ : আয়াত ১২০-১২২]

ফেরআউন দেখলো যে, তার সমস্ত প্রতারণার জাল ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেছে এবং মুসাকে পরাভূত করার যে-শেষ নির্ভরটুকু ছিলো, সেটাও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়েছে। এখন এমন না হয় যে, মিসরবাসীরাও তার হাতছাড়া হয়ে যায় এবং মুসা তার উদ্দেশে সফল হয়ে যায়। সুতরাং সে প্রবঞ্চনা ও প্রতারণার জন্য ভিন্ন পথ অবলম্বন করলো এবং জাদুকরদেরকে বললো, মনে হয় মুসা তোমাদের সবার গুরু এবং তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে রেখেছিলে। তাই তো তোমরা আমার প্রজা হয়ে আমার অনুমতি ছাড়াই মুসার প্রতিপালকের ওপর ঈমান আনার ঘোষণা দিয়ে দিলে। আচ্ছা, আমি তোমাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করবো, যাতে ভবিষ্যতে কারো এমন বিশ্বাসঘাতকতা করার দুঃসাহস না হয়।

প্রথমে তোমাদের ডান হাত ও বাম অথবা বাম হাত ও ডান পা কেটে ফেলবো। তারপর তোমাদেরকে শূলে চড়াবো।

এই ঘটনা পবিত্র কুরআন বিবৃত করেছে এভাবে—

قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى

'ফেরআউন বললো, কী, আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার আগেই তোমরা মুসার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে? দেখছি, সে তো তোমাদরে প্রধান (গুরু ও সরদার); সে তোমাদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে। সুতরাং আমি তো তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কাটবোই এবং আমি তোমাদের খেজুর বৃক্ষের কাণ্ডে শূলবিদ্ধ করবোই এবং তোমরা অবশ্যই জানতে পারবে আমাদের মধ্যে কার শাস্তি কঠোরতর ও অধিক স্থায়ী।"' [সূরা তোয়া-হা : আয়াত ৭১]

قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنتُم بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (سورة الأعراف)

'ফেরআউন বললো, "কী, আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার আগেই তোমরা তাতে (মুসার প্রতিপালকের ওপর) বিশ্বাস স্থাপন করলে? এটা তো এক চক্রান্ত। তোমরা জেনে-শুনে এই চক্রান্ত করেছো নগরবাসীদেরকে নগর থেকে বহিষ্কার করার জন্য। আচ্ছা, তোমরা শিগগিরই এর পরিণাম জানবে।"' [সূরা আ'রাফ : আয়াত ২৩]

কিন্তু সত্যিকারের ঈমান যখন কারো ভাগ্যে হয়, তা এক মুহূর্তের জন্যও হোক না কেনো, এমন অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তি ও রুহানি ফয়েজ সৃষ্টি করে দেয়, বিশ্বজগতের কোনো বড় থেকে বড় শক্তি তাকে প্রভাবিত ও ভীত করতে পারে না। দেখুন, এই জাদুকরেরাই, যারা একটু আগেও ফেরআউনের কাছে পুরস্কার ও মান-মর্যাদার আবদার ও আবেদন পেশ করছিলেন, তাঁরাই ঈমান আনার সঙ্গে সঙ্গে এমন নির্ভীক ও পরোয়াহীন হয়ে পড়লেন যে, তাঁদের সামনে কঠিন থেকে কঠিন বিপদ এবং যন্ত্রণাদায়কের চেয়েও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিও তুচ্ছ ব্যাপার হয়ে গেলো। কোনো ভয়ই তাঁদের দৃঢ় ঈমানকে টলাতে পারলো না। তাঁরা ফেরআউনের সামনেই বিনা দ্বিধায় ইসলামের ঘোষণা করে দিলেন।

তারা যখন ফেরআউনের এই অত্যাচারমূলক হুমকি শুনলেন, তখনই বলতে শুরু করলেন—

قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا () إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (سورة طه)

'তারা (জাদুকরেরা) বললো, "আমাদের কাছে যে-স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে তার ওপর এবং যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তার ওপর তোমাকে আমরা কিছুতেই প্রাধান্য দেবো না। সুতরাং তুমি করো যা তুমি করতে চাও। তুমি তো কেবল এই পার্থিব জীবনের ওপর কর্তৃত্ব করতে পারো। আমরা নিশ্চয়ই আমাদের প্রতি ঈমান এনেছি যাতে তিনি ক্ষমা করেন আমাদের (অতীত জীবনের) অপরাধ এবং তুমি আমাদেরকে যে-জাদু করতে বাধ্য করেছো তা। আর আল্লাহ শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী।"' [সূরা তোয়া-হা : আয়াত ৭২-৭৩]

قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ () إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ (سورة الشعراء)

'তারা বললো, "(তোমার এই শাস্তিতে আমাদের) কোনো ক্ষতি নেই, আমরা আমাদের প্রতিপালকের কাছে প্রত্যাবর্তন করবো। আমরা আশা করি যে, আমাদের প্রতিপালক আমাদের অপরাধ মার্জনা করবেন, কারণ আমরা মুমিনদের মধ্যে অগ্রণী।"' [সূরা শুআরা : আয়াত ৫০-৫১]

মোটকথা, সত্য ও মিথ্যার এই প্রতিযোগিতায় ফেরআউন এবং তার সভাসদবৃন্দকে চরম পরাজয় বরণ করতে হলো। তারা সাধারণ প্রজাবৃন্দের সামনে অপদস্থ হলে। হযরত মুসা আ.-কে আল্লাহ তাআলা যে-প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পূর্ণ হলো। তাঁরই মাথার ওপর বহাল থাকলো সফলতার মুকুট।

এই অবস্থা দেখে জাদুকরেরা ছাড়াও বনি ইসরাইলি যুবকদের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র দল মুসলমান হয়ে গেলো; কিন্তু তারা ফেরআউনের অত্যাচার ও উৎপীড়নের ভয়ে ইসলামের কথা প্রকাশ করতে পারলো না। কেননা, ফেরআউন মুসলমানদের ওপর সাধারণভাবে উৎপীড়ন ও নির্যাতন তো চালাতোই, এখন পরাজয়ের অপমান তাকে আরো ক্রোধান্বিত করে তুলেছিলো।

হযরত মুসা আ. তাদেরকে দীক্ষা দিলেন যে, এখন মুমিন হওয়ার পর তোমাদের নির্ভর শুধু আল্লাহ্ তাআলার ওপরই হওয়া উচিত। মুমিনের দলটি তা মেনে নিলো। তাঁরা আল্লাহ্ তাআলার দরবারে কাকুতি-মিনতি করে রহমত ও মাগফেরাতের প্রার্থনা করতে লাগলেন। জালিমদের অত্যাচার ও উৎপীড়ন থেকে রক্ষিত থাকার জন্য আবেদন-নিবেদন করতে লাগলেন।

ঘটনার এই অংশ পবিত্র কুরআনে বিবৃত হয়েছে এভাবে—

فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ () وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ () فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ () وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (سورة يونس)

'ফেরআউন ও তার পারিষদবর্গ নির্যাতন করবে এই আশঙ্কায় মুসার (বনি ইসরাইলের) সম্প্রদায়ের একদল ব্যতীত[৬৬] আর কেউ তার প্রতি ঈমান আনে নি। বস্তুত, ফেরআউন ছিলো দেশে পরাক্রমশালী এবং সে অবশ্যই সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত। মুসা বলেছিলো, "হে আমার সম্প্রদায়, যদি তোমরা আল্লাহতে ঈমান এনে থাকো, যদি তোমরা আত্মসমর্পণকারী হও, তবে তোমরা তাঁরই ওপর নির্ভর করো (তোমাদের মনে ফেরআউনের ভয়ের স্থান দিয়ো না)।" তখন তারা বললো, "আমরা আল্লাহর ওপর নির্ভর করলাম। হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে জালিম সম্প্রদায়ের উৎপীড়নের পাত্র করো না; এবং আমাদেরকে তোমার অনুগ্রহে কাফের সম্প্রদায় থেকে রক্ষা করো।"' [সুরা ইউনুস : আয়াত ৮৩-৮৬]

মোটকথা, ফেরআউন মুসা আ. আধ্যাত্মিক শক্তির এই প্রকাশ দেখে অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। যদিও সে জাদুকরদের ওপর তার চরম ক্ষোভ ও ক্রোধ ঝাড়তে লাগলো, কিন্তু সে-মুহূর্তে হযরত মুসা আ.-কে কিছু বলার সাহস পেলো না। তার সভাসদবৃন্দ ও রাজকর্মচারীরা এই

---

[৬৬] হযরত মুসা আ.-এর প্রতি প্রথম দিকে বনি ইসরাইলের কিছু সংখ্যক যুবক ঈমান

দাবি জানালো যে, আপনি মুসাকে হত্যা করে ফেলেন না কেনো? তাকে ও তার সম্প্রদায়কে কি এই সুযোগ দেয়া হচ্ছে যে, তারা মিসরে ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়াবে এবং আপনাকে ও আপনার দেবতাগণকে পদাঘাত করতে থাকবে? ফেরআউন বললো, তোমরা ঘাবড়াচ্ছো কেনো? আমি বনি ইসরাইলের শক্তি বৃদ্ধি পেতে দেবো না। প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার যোগ্যই তাদের রাখবো না। এখনই এই নির্দেশ জারি করে দিচ্ছি—তাদের নবজাত পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করে ফেলো এবং কন্যাদেরকে তাদের থেকে সেবা গ্রহণের জন্য জীবিত থাকতে দাও।

কুরআন মাজিদ ঘটনার এই অংশটুকু বিবৃত করেছে এভাবে—

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ (سورة الأعراف)

'ফেরআউনের সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বললো, "আপনি কি মুসাকে ও তার সম্প্রদায়কে (মিসর) রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে এবং আপনাকে ও আপনার দেবতাগণকে বর্জন করতে দেবেন?" সে বললো, "আমরা তাদের (নবজাত) পুত্রদেরকে হত্যা করবো এবং তাদের নারীদেরকে (বাঁদি বানানোর জন্য) জীবিত রাখবো আর আমরা তো তাদের ওপর প্রবল (তারা আমাদের হাতে সম্পূর্ণ নিঃসহায় ও অক্ষম)।"' [সুরা আ'রাফ : আয়াত ১২৭]

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ () إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ () فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (سورة مؤمن)

'আমি আমার নিদর্শন ও স্পষ্ট প্রমাণসহ মুসাকে প্রেরণ করেছিলাম, ফেরআউন, হামান ও কারুনের কাছে। কিন্তু তারা বলেছিলো, "এই লোকটা তো এক জাদুকর, চরম মিথ্যাবাদী।" এরপর মুসা আমার কাছ থেকে সত্য নিয়ে তাদের কাছে উপস্থিত তারা (ফেরআউন, হামান ও কারুন) বললো, "মুসার সঙ্গে যারা ঈমান এনেছে, তাদের পুত্র-সন্তানদেরকে হত্যা করো এবং তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখো।" কিন্তু কাফেরদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবেই।' [সুরা মুমিন : আয়াত ২৩-২৫]

যেনো এটা ফেরআউনের দ্বিতীয় ঘোষণা ছিলো, যা সে বনি ইসরাইলের পুত্রসন্তানদের হত্যা করার বিষয়ে এই ঘোষণা দিয়েছিলো।

হযরত মুসা আলাইহিস সালাম ও বনি ইসরাইল

ইতিহাসের এটি একটি সর্বজনস্বীকৃত বিষয় যে, যখন কোনো জাতির ওপর দাসত্বের অবস্থায় কয়েক শতাব্দী অতিবাহিত হয়, তখন তাদের দুরবস্থা, নিকৃষ্ট স্বভাব ও হীনতার সীমা এখানেই শেষ হয়ে যায় না যে, তারা অর্থকড়িহীন, দুর্দশাগ্রস্ত এবং অলস ও অস্থিরচিত্ত; বরং তাদের কর্মশক্তি বিনষ্ট হওয়ার চেয়েও বেশি তাদের চিন্তাশক্তি নিষ্ক্রিয়, অকর্মণ্য ও অকেজো হয়ে পড়ে। তাদের মধ্য থেকে সাহস ও বীরত্ব লুপ্ত হয়ে যায় এবং তারা হীনতা ও নীচতার মধ্যেই তৃপ্ত থাকে। হতাশা তাদের স্বভাব হয়ে দাঁড়ায়। অপমান ও দুর্দশাগ্রস্ততাকে ধৈর্য ও অল্পেতুষ্টি মনে করে মেনে নেয়। যদি কোনো সংশোধনকারী অথবা নবী ও রাসুল মানসিক নীচতা ও কর্মের হীনতা থেকে বের করার জন্য তাদেরকে ডাকেন এবং দৃঢ় চেতনা ও সাহসিকতার ওপর আনার প্রস্তুতি নিতে চান, তবে তা তাদের জন্য সর্বাপেক্ষা কঠিন এবং তা কাজে পরিণত করা একটি অসম্ভব বিষয় বলে মনে হয়। আবার কোনো কোনো সময় তারা এ-পথের কষ্ট-ক্লেশ ও যন্ত্রণা লক্ষ করে ঘাবড়ে যায় এবং নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক লড়াই বাঁধিয়ে দেয়। আবার কখনো তারা তাদের মুক্তিদাতার প্রতি সন্দেহের চোখে তাকাতে থাকে। আর যদি এভাবে-সেভাবে যে-কোনো ধরনের চেষ্টা-প্রচেষ্টায় তাদের স্বার্থ ও কল্যাণ লাভ হয়, তখন তারা পদমর্যাদা ও গাম্ভীর্যকে ছাড়িয়ে উচ্ছ্বাস ও উল্লাস প্রকাশ করতে থাকে। আর যদি এই পথে কোনো পরীক্ষা ও বিপদ-আপদের প্রশ্ন এসে পড়ে, তখন সংশোধনকারী অথবা নবী ও রাসুলকে দোষারোপ করতে শুরু করে—আমাদেরকে তুমি অযথা এই বিপদের মধ্যে ফাঁসিয়েছো। আমরা তো আমাদের উৎপীড়িত ও নির্যাতিত অবস্থার মধ্যেই ধৈর্য ধারণ করছিলাম এবং আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছিলাম।

ঠিক এই অবস্থাই ছিলো হযরত মুসা আ.-এর সঙ্গে বনি ইসরাইলের। যেমন : হযরত মুসা আ. সত্য প্রচার থেকে শুরু করে মিসর থেকে বের

হওয়া পর্যন্ত যেসব অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে তা এই বিষয়ের জীবন্ত সাক্ষী।

হযরত মুসা আ. যখন ফেরআউন ও তার সভাসদবর্গের কথোপকথনের বিষয়ে জানতে পারলেন, তখন তিনি বনি ইসরাইলদেরকে একত্র করে ধৈর্য ও একমাত্র আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল (তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ) হওয়ার দীক্ষা দিলেন। বনি ইসরাইল তাঁর কথা শুনে বললো, হে মুসা, আমরা আগে থেকেই বিপদে জর্জরিত ছিলাম। এখন তোমার আগমনে কিছুটা আশার আলো দেখতে পেয়েছিলাম। কিন্তু তোমার আগমনের পরেও তো সেই একই বিপদই থেকে গেলো। এ তো মনে বিশাল কঠিন বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

মুসা আ. তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুতি কখনো মিথ্যা হতে পারে না। ঘাবড়িও না, তোমরাই সফলকাম হবে। জমিনের (ভূ-পৃষ্ঠের) মালিক ফেরআউন বা তার সম্প্রদায় নয়, রাব্বুল আলামিন অর্থাৎ বিশ্বজগতের প্রতিপালকই একমাত্র স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী। সুতরাং তিনি তাঁর বান্দাগণের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তার মালিক বানিয়ে দেন। আর শুভ ফল ও শুভ পরিণতি একমাত্র খোদাভীরু ও মুত্তাকি বান্দাদের জন্যই হয়ে থাকে।

কুরআন মাজিদে এই ঘটনা বিবৃত হয়েছে এভাবে—

قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ () قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

(سورة الأعراف)

মুসা তার সম্প্রদায়কে (বনি ইসরাইলকে) বললো, “আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো এবং ধৈর্য ধারণ করো; জমিন তো আল্লাহরই। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা ওটার উত্তরাধিকারী করেন এবং শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য।” তারা বললো, “আমাদের কাছে তোমার আসার আগে আমরা নির্যাতিত হয়েছি এবং তোমার আসার পরেও (তোমার আসার আগেও আমরা বিপদের মধ্যেই ছিলাম, তোমার আসার পরেও আমরা বিপদের মধ্যেই আছি)।” সে বললো, “শিগগিরই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করবেন এবং তিনি

তোমাদেরকে জমিনে তাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। এরপর তোমরা কী করো তা তিনি লক্ষ করবেন।"' [সুরা আ'রাফ : আয়াত ১২৮-১২৯]

এরপর মুসা আ. মুসলমানদের উদ্দেশে বললেন, ফেরআউনের অবিরাম অত্যাচারের ধারা এখনো শেষ হয় নি। বনি ইসরাইল ও কিবতি সম্প্রদায়ের মুমিনদের স্বাধীনতার সঙ্গে মিসর থেকে চলে যাওয়ার ব্যাপারে সে সম্মত নয়। সুতরাং, আল্লাহ তাআলার মীমাংসা হওয়া পর্যন্ত তোমরা মিসর ভূমিতেই নিজ নিজ গৃহকে নামাযের স্থান বানিয়ে নাও। কেবলামুখী হয়ে এক আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হয়ে যাও। এটা আল্লাহ তাআলার ওহিরই সিদ্ধান্ত। মুসা আ. সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর দরবারেও দোয়া করলেন, হে আমার প্রতিপালক, ফেরআউন ও তার সম্প্রদায়কে আপনি যে-ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তারা সেগুলোর জন্য কৃতজ্ঞ হওয়ার পরিবর্তে আপনার বান্দাদের ওপর বলপ্রয়োগ এবং নির্যাতন ও উৎপীড়ন করতে বদ্ধপরিকর রয়েছে। তারা নিজেরাও আপনার সত্য পথকে অবলম্বন করে না এবং অন্যদেরকেও অবলম্বন করতে দেয় না। তারা বলপ্রয়োগ, কঠোরতা ও নির্যাতনের মাধ্যমে মানুষের সত্যপথ অবলম্বনে বাধা-বিঘ্নতা সৃষ্টি করছে। সুতরাং আপনি তাদেরকে জুলুম ও অত্যাচারের মজা দেখিয়ে দিন। যে-ধন ও ঐশ্বর্যের জন্য তারা গর্ব করে বেড়ায় ও অহমিকা প্রকাশ করে আপনি তা ধ্বংস ও বরবাদ করে দিন। আর যেভাবে তারা ঈমানের সত্যতাকে পদাঘাত করছে, আপনি তাদেরকে এখন ঈমানের দৌলতের পরিবর্তে এমন এক মর্মন্তুদ শাস্তি দিন, যেনো তাদের কাহিনি পরবর্তী লোকদের জন্য উপদেশ হয়ে যায়।

ঘটনার এই অংশটুকু কুরআন মাজিদ বর্ণনা করছে এভাবে—

وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ () وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ () قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (سورة يونس)

'আমি মুসা ও তার ভাইকে প্রত্যাদেশ করলাম, "মিসরে তোমাদের সম্প্রদায়ের জন্য গৃহ স্থাপন করো এবং তোমাদের গৃহগুলোকে

ইবাদতগৃহ[৬৭] করো, সালাত কায়েম করো এবং মুমিনদের সুসংবাদ দাও।" মুসা বললো, "হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি ফেরআউন ও তার পারিষদবর্গকে পার্থিব জীবনে শোভা ও সম্পদ (ভোগবিলাস ও জাঁকজমকের বস্তু ও উপকরণরাশি) দান করেছো যার দ্বারা, হে আমাদের প্রতিপালক, তারা মানুষকে তোমার পথ থেকে ভ্রষ্ট করে। হে আমাদের প্রতিপালক, ওদের সম্পদ বিনষ্ট করো, ওদের হৃদয় কঠিন করে দাও (মোহর মেরে দাও), ওরা তো মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত ঈমান আনবে না।" আল্লাহ তাআলা বললেন, "তোমাদের উভয়ের দোয়া কবুল করা হলো, এখন তোমরা দৃঢ়পদ থাকো (নিজেদের পথে অটল থাকো) এবং তাদের অনুসরণ করো না যারা অজ্ঞ (যারা আমার কর্মপন্থা সম্পর্কে কিছু জানে না)।"' [সুরা ইউনুস : আয়াত ৮৭-৮৮]

ফেরআউন যদিও তার সভাসদবৃন্দের কাছে নিশ্চিন্ততা প্রকাশ করেছিলো, কিন্তু হযরত মুসা আ.-এর আধ্যাত্মিক শক্তির প্রবলতার কল্পনা তাকে ভেতরে ভেতরে গলিয়ে ফেলছিলো। বনি ইসরাইলের নবজাত পুত্রসন্তানদেরকে হত্যার নির্দেশ জারি করেও তার মনে সুখ ছিলো না। অবশেষে সে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো যে, মুসাকে হত্যা করা ছড়া এই বিষয়ের অবসান ঘটবে না। তাই সে নেতৃবৃন্দ এবং সভাসদবৃন্দকে একদিন বলতে লাগলো, মুসাকে যদি আমরা এই স্বাধীনভাবেই ছেড়ে রাখি, তবে আমার আশঙ্কা হয়, সে ধীরে ধীরে তোমাদের ধর্মের পরিবর্তন ঘটিয়ে ফেলবে। মিসরের সমগ্র ভূমিতে ফেতনা-ফাসাদ বিস্তার করে বেড়াবে। এখন এটাই সঠিক মনে হচ্ছে যে, মুসাকে হত্যা করা হোক।

হযরত মুসা আ. যখন এই সংবাদ জানতে পারলেন, তিনি বললেন, আমি এমন গর্বিত ও দাম্ভিক লোককে ভয় করি যে-লোক আল্লাহর হিসাব-নিকাশের দিনকে ভয় করে না। আমার পৃষ্ঠপোষক তো রয়েছেন সেই মহান সত্তা, যিনি আমারও প্রতিপালক এবং তোমাদের সবারই প্রতিপালক। আমি কেবল তাঁরই আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

ঘটনার এই অংশ কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এভাবে—

---

[৬৭] বনি ইসরাইল (ইহুদিদের)-এর প্রতি মসজিদে সালাত আদায় করার হুকুম ছিলো; কিন্তু ফেরআউনের অত্যাচারের ভয়ে মসজিদে যাতায়াত কষ্টসাধ্য হওয়ায় ঘরের নির্দিষ্ট স্থানে সালাত আদায়ের অনুমতি দেয়া হয়েছিলো।

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ () وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ (سورة مؤمن)

'ফেরআউন বললো, "আমাকে ছেড়ে দাও আমি মুসাকে হত্যাই করে ফেলি এবং সে (সাহায্যের জন্য) তার প্রতিপালকের শরণাপন্ন হোক। আমি আশঙ্কা করি যে, সে তোমাদের দীনের পরিবর্তন ঘটাবে অথবা সে পৃথিবীতে (মিসরে) বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।" মুসা (এসব কথা শুনে) বললো, "যারা বিচার দিবসে বিশ্বাস করে না, সেইসব উদ্ধত ব্যক্তি থেকে আমি আমার ও তোমাদের প্রতিপালকের শরণাপন্ন হয়েছি।"' [সুরা মুমিন : আয়াত ২৬-২৭]

ফেরআউন ও তার সভাসদবর্গ যখন এই কথোপকথনে লিপ্ত ছিলো, তাদের মজলিসে তখন একজন মিসরীয় মুমিন লোকও উপস্থিত ছিলেন। তিনি তখন পর্যন্ত তাঁর ইসলাম গ্রহণকে গোপনই রেখে আসছিলেন। তিনি তাদের আলোচনা শুনে তার কওমের সেই লোকগুলোর মোকাবিলায় মুসা আ.-এর পক্ষ থেকে প্রতিবাদ করার চেষ্টা শুরু করলেন। তিনি তাদেরকে বুঝালেন, তোমরা এমন একজন লোককে হত্যা করতে যাচ্ছো যিনি এই সত্য কথাটি বলেন যে, আমার প্রতিপালক আল্লাহ। তিনি তোমাদের সামনে তাঁর সত্যতার পক্ষে উৎকৃষ্ট প্রমাণসমূহ এবং নিদর্শন উপস্থিত করেছেন। আর ধরে নিলাম, তিনি যদি মিথ্যাবাদীও হন, তবে তাঁর মিথ্যা দ্বারা তো তোমাদের কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। আর যদি তিনি সত্যবাদী হয়ে থাকেন, তবে তোমরা তিনি যে-আযাবের সতর্কবাণী শোনান তা ভয় করো। তিনি তা আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদেরকে শুনাচ্ছেন।

ফেরআউন মুমিন লোকটির কথা কেটে দিয়ে বললো, আমি তোমাকে সে-পরামর্শই দিচ্ছি, আমার ধারণায় আমি যা সঠিক বুঝছি এবং আমি তোমাদের কল্যাণের কথাই বলছি।

মুমিন ব্যক্তি শেষ উপদেশের পুনরায় বললেন, হে আমার সম্প্রদায়, আমার আশঙ্কা হয়, পাছে আমাদের অবস্থা অতীতকালের সেই সম্প্রদায়গুলোর মতো না হয়ে যায় যারা নুহের সম্প্রদায়, সামুদ সম্প্রদায় ইত্যাদি নামে অভিহিত ছিলো বা যেসব শক্তি তাদের পরে এসেছিলো। আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের ওপর কখনো জুলুম করেন

বরং সেই সম্প্রদায়গুলোর বিনাশ ঘটেছিলো তাদের এ-জাতীয় াধ্যতামূলক কর্মকাণ্ডের কারণেই যা তোমরা আজ মুসার বিরুদ্ধে চিন্তা ছো। তোমরা তো আজ পার্থিব মান-মর্যাদার চিন্তায় বিভোর রয়েছো, র আমি তোমাদের জন্য ওই দিবসের আশঙ্কা করছি যেদিন কেয়ামত ঘটিত হবে এবং সবাই একে অন্যকে ডাকবে। কিন্তু তখন আল্লাহর যাব থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করার জন্য আর কেউই থাকবে না।

আমার সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ, তোমাদের অবস্থা তো হলো এই, মিসর শে যখন হযরত ইউসুফ আ. আল্লাহ তাআলার পয়গাম শুনিয়েছিলেন, নো তোমরা, অর্থাৎ তোমাদের পূর্বপুরুষেরা এই দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে তত ছিলো এবং তাঁর ওপর ঈমান আনে নি। আর যখন ইউসুফ আ.- ইন্তেকাল হয়ে গেলো, তখন তারা বলতে লাগলো, আল্লাহ এখন র তাঁর কোনো রাসুল প্রেরণ করবেন না। এই একই ব্যবহার তোমরা ন মুসার সঙ্গে করছো। আল্লাহর ওয়াস্তে একটু বুঝতে চেষ্টা করো ং সরল ও সত্যপথ অবলম্বন করো।

: ঘটনা কুরআন মাজিদ বিবৃত করেছে এভাবে—

وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَ يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ () يَا لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ () وَقَالَ الَّذِي آمَ قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ () مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ () وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ التَّنَادِ () يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَ مِنْ هَادٍ () وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَا بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ () الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ

عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ (سورة مؤمن)

'ফেরআউনের বংশের এক ব্যক্তি[৬৮]—যে মুমিন ছিলো এবং নিজের ঈমান গোপন করে রাখতো—বললো, তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এইজন্য হত্যা করবে যে সে বলে, "আমার প্রতিপালক আল্লাহ", অথচ সে তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদের কাছে এসেছে? সে মিথ্যাবাদী হলে তার মিথ্যাবাদিতার জন্য সে দায়ী হবে (মিথ্যার প্রতিফল তারই ওপর বর্তাবে), আর যদি সে সত্যবাদী হয়, সে তোমাদেরকে যে-শাস্তির কথা বলে, তার কিছু তো তোমাদের ওপর আপতিত হবেই। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারী ও (নির্লজ্জ) মিথ্যাবাদীকে সৎপথে পরিচালিত করেন না। হে আমার সম্প্রদায়, আজ কর্তৃত্ব তোমাদের, দেশে তোমরাই প্রবল; কিন্তু আমাদের ওপর আল্লাহর শাস্তি এসে পড়লে কে আমাদেরকে সাহায্য করবে?" ফেরআউন বললো, "আমি যা বুঝি, আমি তোমাদেরকে তা-ই বলছি। আমি তোমাদেরকে কেবল সৎপথই দেখিয়ে থাকি।" মুমিন ব্যক্তিটি বললো, "হে আমার সম্প্রদায়, আমি তোমাদের জন্য পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের শাস্তির দিনের অনুরূপ দুর্দিনের আশঙ্কা করি—যেমন ঘটেছিলো, নুহ, আদ, সামুদ এবং তাদের পূর্ববর্তীদের ব্যাপারে। আল্লাহ তো বান্দাদের প্রতি কোনো জুলুম করতে চান না। হে আমার সম্প্রদায়, আমি তোমাদের জন্য আশঙ্কা করি আর্তনাদ দিবসের[৬৯], যেদিন তোমরা পেছনে ফিরে পলায়ন করতে চাইবে। আল্লাহর শাস্তি থেকে তোমাদের রক্ষা করার কেউ থাকবে না। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোনো পথপ্রদর্শক নেই। পূর্বেও তোমাদের (পূর্বপুরুষদের) কাছে ইউসুফ এসেছিলো স্পষ্ট নিদর্শনসহ; কিন্তু সে তোমাদের কাছে যা নিয়ে এসেছিলো তোমরা তাতে বারবার সন্দেহ পোষণ করতে। পরিশেষে যখন ইউসুফের মৃত্যু হলো, তখন তোমরা বলেছিলে, তার পরে আল্লাহ আর কোনো রাসুল প্রেরণ করবেন না।" এইভাবে আল্লাহ বিভ্রান্ত করেন সীমালঙ্ঘনকারী ও

---

[৬৮] ইনি ছিলেন ফেরআউনের জ্ঞাতি ভাই।

[৬৯] تناد অর্থ আহ্বান করা। কেয়ামত দিবসে ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষ আর্তনাদ করতে থাকবে, তাই তা আর্তনাদ দিবস (يَوْمَ التَّنَادِ)।

সংশয়বাদীদেরকে—যারা নিজেদের কাছে কোনো দলিল-প্রমাণ না থাকলেও আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়। তাদের এই কর্ম (ঝগড়া ও বিতণ্ডা) আল্লাহ ও মুমিনদের দৃষ্টিতে অতিশয় ঘৃণার্হ। এইভাবে আল্লাহ প্রত্যেক উদ্ধত ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়কে মোহর করে দেন।' [সূরা মুমিন : ২৮-৩৫]

وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ () يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ () مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ () وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ () تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ () لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ () فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (سورة مؤمن)

'মুমিন ব্যক্তিটি বললো, "হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আমার অনুসরণ করো, আমি তোমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করবো। হে আমার সম্প্রদায়, এই পার্থিব জীবন তো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু এবং আখেরাতই হচ্ছে চিরস্থায়ী আবাস। কেউ মন্দ কাজ করলে সে কেবল তার কর্মের অনুরূপ শাস্তি ভোগ করবে এবং পুরুষ ও নারীর মধ্যে যারা মুমিন হয়ে সৎকর্ম করে তারা প্রবেশ করবে জান্নাতে, ওখানে তাদেরকে দেয়া হবে অপরিমিত জীবনোপকরণ। হে আমার সম্প্রদায়, কী আশ্চর্য! আমি তোমাদেরকে আহ্বান করছি মুক্তির দিকে, আর তোমরা আমাকে ডাকছো আগুনের দিকে। তোমরা আমাকে বলছো আল্লাহকে অস্বীকার করতে এবং তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে, যার সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান নেই; পক্ষান্তরে আমি তোমাদেরকে আহ্বান করছি পরক্রমশালী, ক্ষমাশীল আল্লাহর দিকে। নিঃসন্দেহে তোমরা আমাকে আহ্বান করছো এমন একজনের দিকে যে দুনিয়া ও আখেরাতে কোথাও আহ্বানযোগ্য নয়। (ইবাদতের যোগ্য নয়।) বস্তুত, আমাদের প্রত্যাবর্তন তো আল্লাহর কাছে এবং সীমালঙ্ঘনকারীরাই জাহান্নামের অধিবাসী। আমি তোমাদেরকে যা বলছি, তোমরা তা অচিরেই স্মরণ করবে এবং আমি

আমার ব্যাপার আল্লাহর কাছে অর্পণ করছি; আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন।" [সুরা মুমিন : আয়াত ৩৮-৪৪]

যখন ফেরআউন ও তার সভাসদবর্গ এই মুমিন লোকটির এসব কথা শুনলো, তখন তাদের মনোযোগ মুসা আ. থেকে ফিরে এসে মুমিন লোকটির প্রতি নিবদ্ধ হলো। তারা ভাবলো প্রথমে এই লোকটিরই কর্ম খতম করে দিতে হবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের এই অপবিত্র ইচ্ছা পূর্ণ হতে দিলেন না।

এই ঘটনাটুকু কুরআন মাজিদ বর্ণনা করছে এভাবে—

فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ () النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (سورة مؤمن)

"এরপর আল্লাহ তাকে[৭০] (মুমিন লোকটিকে) তাদের ষড়যন্ত্রের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করলেন এবং কঠিন শাস্তি পরিবেষ্টন করলো ফেরআউনের সম্প্রদায়কে। তাদেরকে উপস্থিত করা হয় আগুনের সামনে (বারযাখে) সকাল সন্ধ্যায়[৭১] এবং যেদিন কিয়ামত ঘটবে সেদিন (তাদের উদ্দেশে বলা হবে) বলা হবে 'ফেরআউনের সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ করো কঠিন শাস্তিতে।'" [সুরা মুমিন : আয়াত ৪৫-৪৬]

তাওরাতে পূর্ববর্ণিত ঘটনাগুলোর অধিকাংশই উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্তু দুটি বিষয় উল্লেখ করা হয় নি : ১. ফেরআউনের দ্বিতীয় নির্দেশ জারির বিষয়টি উল্লেখ করা হয় নি, যা সে বনি ইসরাইলের নবজাত পুত্রসন্তানদেরকে হত্যা করার ব্যাপারে জারি করেছিলো। ২. এই ঘটনার কথাও উল্লেখ করা হয় নি যে, ফেরআউনের সম্প্রদায়ের কেউ কেউ হযরত মুসা আ.-এর প্রতি ঈমান এনেছিলো। তাদের মধ্য থেকে একজন মুমিন লোক ফেরআউন ও তার স্প্রদায়কে হযরত মুসা আ.-কে হত্যা করা থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। তাদেরকে দীনের দাওয়াত দিয়েছিলেন এবং সত্যকে গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন।

---

[৭০] হযরত মুসা আ.-কে, ভিন্নমতে ফেরআউনের সম্প্রদায়ের যে-লোকটি ঈমান এনেছিলেন তাঁকে।

[৭১] এই আয়াতে কবরের আযাবের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

তাওরাতে দ্বিতীয় ঘটনাটির উল্লেখ না করার কারণ বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটা মনে হয় যে, বনি ইসরাইলের ওপর ফেরআউন ও তার সম্প্রদায়ের লোকদের অত্যাচার ও উৎপীড়নে ফেরআউন ও তার গোষ্ঠীর প্রতি বনি ইসরাইলের মর্মযাতনা ও ক্রোধ এতটাই চরমে পৌঁছেছিলো যে, শেষ পর্যন্ত তা শত্রুতা ও হিংসার রূপ ধারণ করেছিলো। সুতরাং, শত্রুতাভাব ও হিংসা তাদেরকে অনুমতি দেয় নি যে, তারা ফেরআউনের সম্প্রদায়ের কোনো এক ব্যক্তির জন্যও এই প্রমাণ রাখে যে, তার মধ্যে সত্যের সংরক্ষণ এবং সচ্চরিত্রতার আত্মা জীবন্ত ছিলো।

ফেরআউনের প্রভুত্ব ও খোদায়ির দাবি

হযরত মুসা আ.-কে পরাভূত করার জন্য যখন ফেরআউন ও তার সভাসদবর্গের কোনো চক্রান্ত ও প্রতারণা এবং ক্রোধ ও হিংসা কোনো কাজে এলো না এবং তাঁকে হত্যা করার সংকল্প করা সত্ত্বেও হত্যা করার সাহস হলো না, তখন ফেরআউন নিজের মনের ঝাল মেটাবার জন্য এই পন্থা অবলম্বন করলো যে, সে একদিকে মুসা আ.-কে অপমান ও অপদস্থ করার পেছনে লেগে গেলো এবং অপরদিকে এই ঘোষণা জারি করলো যে, তোমাদের সর্বোচ্চ খোদা ও মাবুদ আমি ছাড়া কেউ নেই। মুসা অদৃশ্য খোদাকে প্রতিপালক বলে থাকে আর আমি বিপুল প্রতাপ এবং প্রচণ্ড জাঁকজমক ও অহমিকার সঙ্গে তোমাদের সামনে বিদ্যমান।

মুসা আ.-এর সুস্পষ্ট প্রমাণ ও নিদর্শনসমূহ দেখে মিসরীয়দের অন্তরে যা-কিছু প্রভাব ও ক্রিয়া হয়েছিলো, ফেরআউনের এই ঘোষণার পর থেকে তা ধীরে ধীরে লোপ পেতে লাগলো এবং তা পার্থিব প্রতাপ ও প্রতিপত্তি এবং মান-মর্যাদার লোভের নিচে চাপা পড়ে গেলো। এইভাবে মিসরীয়রা সবাই পুনরায় হযরত মুসা আ. ও বনি ইসরাইলের বিরোধিতায় ফেরআউনের সঙ্গী হয়ে গেলো।

এই ঘটনা কুরআন মাজিদ বর্ণনা করেছে এভাবে—

وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ () أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ () فَلَوْلَا

أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ () فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (سورة الزخرف)

'ফেরআউন তার সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বলে ঘোষণা করলো, "হে আমার সম্প্রদায়, মিসর রাজ্য কি আমার নয়? আর এই নদীগুলো আমার পাদদেশে প্রবাহিত; তোমরা কি তা (এসব প্রতাপ ও প্রতিপত্তি) দেখো না? আমি তো শ্রেষ্ঠ এই ব্যক্তি থেকে, যে হীন এবং স্পষ্ট (ও বিশুদ্ধ) কথা বলতে অক্ষম! (যদি মুসা আল্লাহর কাছে সম্মানিত ও মর্যাদাবানই হয়ে থাকে তবে) মুসাকে কেনো দেয়া হলো না স্বর্ণ-বলয় অথবা কেনো তার সঙ্গে এলো না ফেরেশতাগণ দলবদ্ধভাবে?" এইভাবে সে তার সম্প্রদায়কে হতবুদ্ধি করে দিলো, ফলে তারা তার কথা মেনে নিলো। তারা তো ছিলো এক সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।' [সুরা যুখরুফ : আয়াত ৫২-৫৪]

ফেরআউন এখানে দুটি বিষয়কে উন্নত ও মর্যাদাশীল হওয়ার মানদণ্ড নির্ধারণ করেছে। সাধারণত পার্থিব জগৎকে জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য মনে করে থাকে তাদের অবস্থা এমনই হয়ে থাকে। একটি হলো ধন-সম্পদ, আরেকটি হলো দুনিয়ার মান-মর্যাদা ও জাঁকজমক। এই এ-দুটি বিষয়ই ফেরআউনের কাছে বিপুল পরিমাণে ছিলো আর হযরত মুসা আ.-এর কাছে ছিলো না।

হযরত শাহ আবদুল কাদির দেহলবি (নাওওয়ারাল্লাহু মারাকাদাহু) এই দুটি কথাকে তাঁর বিখ্যাত তাফসির মুযিহুল কুরআন-এ বর্ণনা করেছেন এভাবে—

"সে নিজে মণিমুক্তা-খচিত কঙ্কন পরতো। আর যে-সভাসদ ও আমিরের প্রতি সে সন্তুষ্ট হতো তাকে সে স্বর্ণের কঙ্কন পরাতো। আর সেনাদল তাদের সামনে সারিবদ্ধ হয়ে দণ্ডায়মান থাকতো।"[৭২]

এ-কারণেই সে এই দুটি বিষয়ের উল্লেখ করেছে যে, মুসার খোদা যদি আমার থেকে ভিন্ন অন্যকোনো সত্তা হয়ে থাকে, তবে সে মুসার ওপর আসমান থেকে কেনো স্বর্ণের কঙ্কন বর্ষণ করে না? আর কেনো তার মজলিসে ফেরেশতারা সারিবদ্ধ হয়ে দণ্ডায়মান থাকে না? যেহেতু ফেরআউনের সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে ধর্মীয় ও পার্থিব মান-মর্যাদার মাপকাঠি

[৭২] মুযিহুল কুরআন, হযরত শাহ আবদুল কাদির দেহলবি রহ., সুরা যুখরুফ।

লো এগুলোই, তাই ফেরআউনের কৌশল তাদের ওপর কার্যকরী হয়ে লো। ফলে তারা ঐকমত্যের সঙ্গে পুনরায় ফেরআউনের আনুগত্যের াষণা করে দিলো। এই হতভাগারা এতটুকু বুঝলো না যে, আল্লাহ আলার দরবারে সম্মানের মাপকাঠি হলো সততা, পবিত্রতা ও কনিষ্ঠতা এবং আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতামূলক ইবাদত; দুনিয়ার ধন-শ্বর্য, মান-মর্যাদা ও জাঁকজমক নয়। অবশ্য যে-ব্যক্তি মৌলিক সম্মান াভ করে, তারপর আল্লাহ তাআলা এসব বস্তুও তার পদতলে বিছিয়ে দন। যারা কেবল পার্থিব মর্যাদা ও মাহাত্ম্যে গর্বিত, তারা চিরস্থায়ী পেমান ও লাঞ্ছনা ছাড়া কিছুই লাভ করতে পারে না। অবশেষে এই বস্থাই ঘটেছিলো হযরত মুসা আ. ও বনি ইসরাইলের এবং ফেরআউন ও তার সম্প্রদায়ের।

এই মর্মে কুরআন মাজিদ বলছে—

فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ () فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ

(سورة الزخرف)

যখন তারা আমাকে ক্রোধান্বিত করলো, আমি তাদেরকে (তাদের দুষ্কৃতিসমূহের) শাস্তি দিলাম এবং নিমজ্জিত করলাম তাদের সবাইকে। তারপর পরবর্তীদের জন্য আমি তাদেরকে করে রাখলাম অতীত ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত।' [সুরা যুখরুফ : আয়াত ৫৫-৫৬]

ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى () فَحَشَرَ فَنَادَى () فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى () فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى () إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى (سورة النازعات)

'এরপর সে পেছনে ফিরে প্রতিবিধানে সচেষ্ট হলো। সে (তার সম্প্রদায়ের) সবাইকে সমবেত করলো এবং উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করলো, আর বললো, "আমি তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক।" এরপর আল্লাহ তাকে দুনিয়া ও আখেরাতে কঠিন শাস্তিতে পাকড়াও করলেন। যে ভয় করে তার জন্য অবশ্যই এতে শিক্ষা রয়েছে।' [সুরা নাযি'আত : আয়াত ২২-২৬]

মিসরীয়দের ওপর আল্লাহর শাস্তি

মোটকথা, হযরত মুসা আ.-এর ওয়াজ ও নসিহত এবং তাবলিগ ও দাওয়াতের কোনো ক্রিয়াই হলো ফেরআউন ও তার সম্প্রদায়ের ওপর। আর অল্প কয়েকজন ছাড়া সাধারণ মিসরবাসীরা সবাই তাদের অনুসরণ

করলো। কেবল তা-ই নয়, ফেরআউনের নির্দেশে বনি ইসরাইলের নবজাত পুত্রসন্তানদেরকে খুন করে ফেলতে লাগলো। হযরত মুসা আ.-কে অপমান ও অপদস্থ করা হতে লাগলো। আর ফেরআউন তার প্রভুত্ব ও খোদায়ির প্রচার জোরেশোরে শুরু করে দিলো। তখন মুসা আ.-এর প্রতি ওহি এলো যে, তুমি ফেরআউন ও তার সম্প্রদায়কে জানিয়ে দাও, যদি তোমাদের নীতি এমনই থাকে, তবে অচিরেই তোমাদের ওপর আল্লাহর শাস্তি নেমে আসবে।

যখন তারা এ-কথার প্রতিও মনোযোগ দিলো না তখন তাদের ওপর একাদিক্রমে আল্লাহর আযাব আসতে লাগলো। তা দেখে ফেরআউন ও তার সম্প্রদায় এই পন্থা অবলম্বন করলো যে, যখন আল্লাহ তাআলার আযাব কোনো এক আকৃতিতে প্রকাশ পেতো তখন ফেরআউন ও তার সম্প্রদায় মুসা আ.-এর দরবারে ওয়াদা করতো যে, আচ্ছা, আমরা ঈমান আনবো। তুমি তোমার খোদার দরবারে দোয়া করে এই আযাব দূর করে দাও। যখন সেই আযাব দূর হয়ে যেতো, তারা আবারো নাফরমানি ও অবাধ্যতায় মত্ত হয়ে যেতো। এরপর আল্লাহর আযাব যখন অন্য এক আকৃতিতে আসতো, তখন তারা বলতো, আচ্ছা, আমরা বনি ইসরাইলকে স্বাধীন করে দেবো এবং তাদেরকে তোমার সঙ্গে রওয়ানা করিয়ে দেবো। দোয়া করো, যেনো আমাদের ওপর থেকে এই আযাব দূরীভূত হয়ে যায়। হযরত মুসা আ.-এর দোয়ায় তারা পুনরায় শাস্তি থেকে অব্যাহতি লাভ করতো এবং আযাব দূর হয়ে যেতো। তখন আবারো তারা আগেই মতোই কোমর বেঁধে বিরুদ্ধাচরণ ও নাফরমানিতে লেগে যেতো। এইভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিভিন্ন নিদর্শন প্রকাশ পেলো এবং ফেরআউন ও তার সম্প্রদায়কে বার বার অবকাশ দেয়া হলো। কিন্তু যখন তারা এটিকেও বিদ্রূপ ও ঠাট্টা এবং মজার বিয়ষ বানিয়ে নিলো, তখন আল্লাহ তাআলার সর্বশেষ আযাব এলো এবং ফেরআউন এবং তার উদ্ধত নেতৃবৃন্দ ও সভাসদবর্গের সবাইকে সমুদ্রে নিমজ্জিত করে দেয়া হলো।

আল্লাহর নিদর্শনসমূহের বিস্তারিত ব্যাখ্যা

হযরত মুসা আ.কে বহু নিদর্শন (মুজেযা) দেয়া হয়েছিলো। সুরা বাকারা, সুরা আ'রাফ, সুরা নামল, সুরা কাসাস, সুরা বনি ইসরাইল, সুরা তোয়া-

হা, সুরা যুখরুফ, সুরা মুমিন, সুরা কামার ও সুরা নাযিয়াতের বিভিন্ন বর্ণনাশৈলীতে সেসব নিদর্শনের উল্লেখ রয়েছে। যেমন : সুরা বনি ইসরাইলে বলা হয়েছে—

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا () قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا (سورة بني إسرائيل
(

'তুমি বনি ইসরাইলকে জিজ্ঞেস করে দেখো আমি মুসাকে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম; যখন সে তাদের কাছে এসেছিলো, ফেরআউন তাকে বলেছিলো, "হে মুসা, আমি মনে করি তুমি তো জাদুগ্রস্ত।" মুসা বলেছিলো, "তুমি অবশ্যই অবগত আছো যে, এইসব স্পষ্ট নিদর্শন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালকই অবতীর্ণ করেছেন—প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ। হে ফেরআউন, আমি তো দেখছি (এসব নিদর্শন অস্বীকার করার কারণে) তোমার ধ্বংস আসন্ন।"' [সুরা বনি ইসরাইল : আয়াত ১০১-১০২]

সুরা তোয়া-হা, সুরা নামল, সুরা নাযিআতে সংখ্যার কথা না বলে কেবল 'নিদর্শনসমূহ' কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে। আবার কোনো স্থানে 'স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ' (أيات بينات), কোনো স্থানে 'বিস্তারিত নিদর্শনসমূহ' (أيات مفصلات), কোনো স্থানে 'শ্রেষ্ঠ নিদর্শনসমূহ' (الأيات الكبرى) এবং কোনো স্থানে শুধু 'আমার নিদর্শনসমূহ' (أياتنا) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এই বিস্তারিত ও মোটামুটি বিবরণ ছাড়াও উপরিউক্ত সুরা সমূহে পৃথক পৃথক নিদর্শন ও মুজেযাসমূহের উল্লেখ রয়েছে। যদি এর সবগুলোকে একস্থানে একত্র করা হয়, তবে নিম্নবর্ণিত তালিকাটি সাজানো যায়।

১. লাঠি, যা নিক্ষেপ করলে সাপ হয়ে যেতো; ২. শুভ্র হাত, যা জামার ভেতর থেকে বের করে আনলে উজ্জ্বল দেখাতো; ৩. দুর্ভিক্ষ; ৪. শস্যহানি; ৫. ঝড়-তুফান; ৬. পঙ্গপাল; ৭. উকুন; ৮. ব্যাঙ[৭৩]; ৯.

[৭৩] ব্যাঙ ও উকুনের শাস্তির অবস্থা প্রসঙ্গে মুফাস্‌সিরগণ বলেন, সব ধরনের পাত্র, পানাহার, বিশ্রাম ও ঘুমানোর এমন কোনো বস্তু বা এমন কোনো জায়গা অবশিষ্ট ছিলো

রক্ত[৭৪]; ১০. সমুদ্র-বিদারণ, অর্থাৎ লোহিত সাগর খণ্ডিত হয়ে শুকনো রাস্তা বের হওয়া; ১১. মান্না[৭৫] ও সালওয়া[৭৬]; ১২. গামাস বা মেঘের ছায়া; ১৩. লাঠির আঘাতে পাথর থেকে ঝরনা প্রবাহিত হওয়া; ১৪. তুর পাহাড় সমূলে উৎপাটিত হয়ে মাথার ওপর আসা; ১৫. তাওরাত নাযিল হওয়া।

উপরিউক্ত বিভিন্ন প্রকারের বিবরণ ও বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে মুফাস্‌সিরগণ এ-ব্যাপারে সিদ্ধান্তহীনতায় রয়েছে যে, কোন্ পন্থা অবলম্বন করলে تِسْعَ آيَاتٍ বা নয়টি নিদর্শনও নির্ধারিত হয় এবং অন্যান্য নিদর্শন ও মুজেযার বিবরণও শুদ্ধ নিয়মে থেকে যায়। কাজি নাসিরুদ্দিন বায়যাবি এবং অন্য কতিপয় মুফাস্‌সির এই ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন যে, সুরা বনি ইসরাইলের মধ্যে যে-নয়টি নিদর্শনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা দ্বারা ওইসব নিদর্শন উদ্দেশ্য নয় যা ফেরআউন ও কওমের বিরুদ্ধে তিরস্কার, শাস্তি ও উপদেশের জন্য পাঠানো হয়েছিলো। বরং এই নয়টি নিদর্শন দ্বারা ওইসব আহকাম উদ্দেশ্য যা লোহিত সাগর পার হওয়ার পর বনি ইসরাইলকে প্রদান করা হয়েছিলো। তাঁরা তাদের এই ব্যাখ্যার সমর্থনে হযরত সাফওয়ান বিন আস্‌সাল রা. থেকে বর্ণিত হাদিস উদ্ধৃত করেছেন। হাদিসটির সারমর্ম এই : একবার দুজন ইহুদি পরস্পর পরামর্শ করলো যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওতের দাবির সত্যতা পরীক্ষা করে দেখা হোক। পরামর্শের পর তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "আল্লাহ তাআলা মুসা আ.-কে যে-নয়টি নিদর্শন দান করেছিলেন তা ব্যাখ্যা করুন।" রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "সেই নয়টি নিদর্শন (আহকাম) হলো এই : ১. তোমরা আল্লাহর সঙ্গে কাউকে

না যেখানে উকুন ও ব্যাঙ কিলবিল করতো না। উকুন ও ব্যাঙ সবকিছু নষ্ট ও বরবাদ করে দিয়েছিলো।

[৭৪] রক্তের শাস্তির অবস্থা প্রসঙ্গে মুফাস্‌সিরগণ বলেন, লোহিত সাগর ও দেশের সব কূপের পানি রক্তমিশ্রিত হয়ে পড়েছিলো। ফলে কোনোভাবেই পানি করা যেতো না।

[৭৫] মান্ন একপ্রকার সুস্বাদু খাদ্য, শিশির বিন্দুর মতো গাছের পাতায় ও ঘাসের ওপর জমে থাকতো।

[৭৬] সালওয়া একপ্রকার পাখির গোশত। আল্লাহ তাআলা উভয় প্রকার খাদ্য বনি ইসরাইলের জন্য তীহ প্রান্তরে প্রেরণ করেছিলেন।

শিরক করো না; ২. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করো না, যা আল্লাহপাক নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন; ৩. চুরি করো না; ৪. ব্যভিচার করো না; ৫. জাদুকর্ম করো না; ৬. সুদ খেয়ো না; ৭. নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্য শাসকের কাছে ধন্না দিয়ো না; ৮. কোনো সতী-সাধ্বী নারীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অপবাদ দিয়ো না; ৯. যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করো না। আর হে ইহুদি সম্প্রদায়, বিশেষ করে তোমরা শনিবারের বাধ্যবধকতা লঙ্ঘন করো না।" দালাইলুন নবুওয়াহ ও সুনানে তিরমিযিতে বর্ণিত রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, নবম হুকুমটি কি এটিই ছিলো না অন্যকিছু এ-ব্যপারে রাবি শু'বা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।][৭৭]

এই মুফাস্সিরগণের উল্লিখিত ব্যাখ্যা সঠিক নয় এ-কারণে যে, সুরা বনি ইসরাইলে নয়টি নিদর্শনের উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে ফেরআউন ও হযরত মুসা আ.-এর মোকাবিলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ফেরআউন এসব নিদর্শন দেখে বলে, হে মুসা, এগুলো হলো জাদুর ইন্দ্রজাল এবং মুসা আ. বলেন, হে ফেরআউন, এগুলো আল্লাহ তাআলার নিদর্শন। আর তুমি এগুলো অবিশ্বাস করে ধ্বংসে পতিত হচ্ছো। সুতরাং, এমন ক্ষেত্রে নয়টি নিদর্শন দ্বারা নয়টি আহকাম উদ্দেশ্য করা কেমন করে সঠিক ও শুদ্ধ হতে পারে? কেননা, উল্লিখিত মুফাস্সিরগণের মতেও এই আহকামগুলো ফেরআউনের সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়ার পরেই নাযিল হয়েছিলো (তাই তা ফেরআউনের সময়কার হতে পারে না, অথচ সুরা বনি ইসরাইলে ফেরআউনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে)। বস্তুত, এই প্রশ্নটিই উত্থাপিত হয় সুনানে তিরমিযিতে বর্ণিত হাদিসের ওপরও। তা ছাড়া এ-কথাটিও সন্দেহমুক্ত নয় যে, কুরআন মাজিদের আলোচ্য আয়াতগুলোর মধ্যে তো

---

[৭৭] মূল হাদিস :

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ { أَنَّ يَهُودِيًّا قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ حَتَّى نَسْأَلَ هَذَا النَّبِيَّ فَقَالَ الْآخَرُ : لَا تَقُلْ هَذَا النَّبِيُّ فَإِنَّهُ إِنْ سَمِعَهَا صَارَتْ لَهُ أَرْبَعَةُ أَعْيُنٍ فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ { وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ } فَقَالَ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَسْحَرُوا وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا وَلَا تَمْشُوا بِبَرِيءٍ إِلَى ذِي سُلْطَانٍ لِيَقْتُلَهُ وَلَا تَقْذِفُوا الْمُحْصَنَةَ أَوْ تَفِرُّوا مِنْ الزَّحْفِ وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةً الْيَهُودَ أَنْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ

[দেখুন : সুনানে তিরমিযি : তাফসির অধ্যায়, হাদিস ৩১৪৪; দালাইলুন নবুওয়াহ, ইমাম আবু বকর আল-বায়হাকি : হাদিস ২৫২৭; মুশকিলুল আসার, ইমাম আবু জাফর আত-তাহাবি, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫। উদ্ধৃত ভাষ্য মুশলিকুল আসার থেকে গৃহীত।]

নয়টি নিদর্শনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে আর সাফওয়ান বিন আস্‌সাল রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে দশটি আহকামের[৭৮] কথা বলা হয়েছে। সুতরাং সংখ্যায় ব্যতিক্রম ঘটেছে। তারপর দশটি আহকামের নয়টিকে নিদর্শন বলে ব্যাখ্যা করা কেমন করে শুদ্ধ হতে পারে?

উল্লিখিত দুটি সন্দেহ ছাড়া সাফওয়ান রা.-এর হাদিসের ওপর ভিত্তি করে এই নয়টি নিদর্শনকে নয়টি আহকাম বলে ব্যাখ্যা করার ওপর যে-জটিলতা অবধারিত হয় তা এই যে, সুরা নামলের মধ্যে নয়টি নিদর্শনের কথা উল্লেখ করে শুভ্রোজ্জ্বল হাতকে এই নয়টি নিদর্শনের একটি বলা হয়েছে। পরিষ্কারভাবে এটাও বলা হয়েছে যে, ফেরআউন ও তার সম্প্রদায়ের উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণের জন্য এই নিদর্শন বা মুজেযাগুলো প্রেরণ করা হয়েছে। যেমন : সুরা নামলে বর্ণিত আছে—

وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ

'এবং তোমার হাত তোমার বগলে রাখো, তা বের হয়ে আসবে শুভ্র-নির্মল অবস্থায়। তা (এই নিদর্শন) ফেরআউন ও তার সম্প্রদায়ের কাছে আনীত নয়টি নিদর্শনের অন্তর্গত। তারা তো সত্যত্যাগী (ও পাপিষ্ঠ) সম্প্রদায়।' [সুরা নামল : আয়াত ১২]

অতএব, কুরআন মাজিদে পরিষ্কার বর্ণনার পর হাদিসটিও ত্রুটিমুক্ত থাকলো না (কারণ, তাতে নয়টি নিদর্শনকে নয়টি আহকাম বলা হয়েছে) এবং মুফাস্‌সিরিনের এই উক্তিও শুদ্ধ হতে পারে না। এ-কারণেই হাফেযে হাদিস ইমাদুদ্দিন বিন কাসির এই হাদিসটি সম্পর্কে বলেছেন—

فهذا حديث رواه هكذا الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن جرير في تفسيره من طرق عن شعبة بن الحجاج به وقال الترمذي حسن صحيح. وهو حديث مشكل وعبد الله بن سلمة في حفظه شئ وقد تكلموا فيه ولعله اشتبه عليه

[৭৮] তাওরাতেও এই নিদর্শনগুলোর উল্লেখ রয়েছে : তিনি সেই ফলকগুলোর ওপর প্রতিশ্রুতির কথামালা অর্থাৎ বর্ণিত আহকামগুলো লিখেছিলেন।—আত্মপ্রকাশ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৩৪, আয়াত ২৮।

التسع الآيات بالعشر الكلمات فإنها وصايا في التوراة لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعون والله أعلم.

ولهذا قال موسى لفرعون: (لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزلَ هَؤُلاءِ إلا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ بَصَائِرَ) أي: حججًا وأدلة على صدق ما جئتك به (وَإِنِّي لأظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا) أي: هالكًا.

এই হাদিসটিকে একইভাবে তিরমিযি, নাসায়ি, ইবনে মাজাহ এবং ইবনে জারির তাঁদের তাফসিরসমূহে বিভিন্ন সনদের সঙ্গে শু'বা বিন আল-হাজ্জাজ থেকে বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযি হাদিসটিকে حسن صحيح (হাসান সহিহ) বলেছেন। কিন্তু এটি একটি জটিলতাপূর্ণ হাদিস। আর রাবি আবদুল্লাহ বিন সালামার স্মরণশক্তিতে কিছুটা সমস্যা রয়েছে। মুহাদ্দিসগণ তাঁর সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন। সম্ভবত (রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বর্ণিত) দশটি আহকামকে নয়টি নিদর্শন বলে তাঁর সন্দেহ হয়ে গিয়েছিলো (ফলে তিনি একটিকে অন্যটির সঙ্গে যুক্ত করে বর্ণনা করেছেন)। আর তা হলো দশটি নির্দেশ যা তাওরাতে বর্ণিত হয়েছে। ফেরআউনের ওপর দলিল-প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করার সঙ্গে এগুলোর (দশটি নির্দেশ বা আহকাম) কোনো সম্পর্ক নেই। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

এ-কারণে মুসা আ. ফেরআউনকে বলেছিলেন, "তুমি অবশ্যই অবগত আছো যে, এইসব স্পষ্ট নিদর্শন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালকই অবতীর্ণ করেছেন—প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ।" অর্থাৎ যে-সত্যের পয়গাম নিয়ে আমি এসেছি, তার সত্যায়নের জন্য প্রমাণ ও দলিল বানিয়ে পাঠিয়েছেন। "আর হে ফেরআউন, আমি তো দেখছি (এসব নিদর্শন অস্বীকার করার কারণে) তোমার ধ্বংস আসন্ন।"[৭৯] অর্থাৎ তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।

মোটকথা, কাযি বায়যাবি রহ. এবং অন্য মুফাস্‌সিরগণের উল্লিখিত ব্যাখ্যা নিশ্চিতভাবেই সন্দেহযুক্ত ও ত্রুটিপূর্ণ। আর কোনো কোনো মুফাস্‌সির উল্লিখিত ব্যাখ্যার বিপরীত নয়টি নিদর্শনের নির্দিষ্টকরণে সেই

---

[৭৯] সুরা বনি ইসরাইল : আয়াত ১০২।

নিদর্শনগুলোকেই গণনা করেছেন যা উপদেশ ও জ্ঞান লাভ এবং বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবিলায় হযরত মুসা আ.-এর সত্যতা প্রমাণের জন্য দান করা হয়েছিলো। কিন্তু তাঁদের বক্তব্যগুলোর বিভিন্ন ধরনের এবং সেগুলোতে যথেষ্ট বিশৃঙ্খলা বিদ্যমান। কেননা, তাতে লোহিত সাগর অতিক্রম করার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয় সময়ের নিদর্শগুলোকে সংমিশ্রিত করে ফেলা হয়েছে। অবশ্য এই বক্তব্যগুলোর মধ্যে প্রণিধান পাওয়ার যোগ্য হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা.-এর এই বক্তব্য যে, নয়টি নিদর্শন দ্বারা নিম্নলিখিত মুজেযাগুলো উদ্দেশ্য : ১. লাঠি; ২. শুভ্র হাত; ৩. দুর্ভিক্ষ; ৪. শস্যহানি; ৫. ঝড়-তুফান; ৬. পঙ্গপাল; ৭. উকুন; ৮. ব্যাঙ; ৯. রক্ত। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. ছাড়াও মুজাহিদ, ইকরামা, শা'বি এবং কাতাদা রহ.-ও এই মতেরই সমর্থন করেন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা.-এর ব্যাখ্যার সারমর্ম এই যে, হযরত মুসা আ.-কে যতগুলো মুজেযা দান করা হয়েছে তার কতিপয় লোহিত সাগর অতিক্রম করার পূর্ব-সময়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আর কতিপয় লোহিত সাগর অতিক্রম করার পরের সময়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। প্রথমগুলোর সম্পর্ক ওইসব ঘটনাবলির সঙ্গে যা হযরত মুসা আ. এবং ফেরআউন ও তার সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘটেছিলো এবং সত্য ও মিথ্যার লড়াইয়ের কারণ হয়েছিলো। এই অংশে আছে নয়টি মুজেযা, তার মধ্যে লাঠি ও শুভ্রোজ্জ্বল হাত সর্বশ্রেষ্ঠ মুজেযা।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى

"এরপর মুসা ফেরআউনকে দেখালো এক বড় নিদর্শন (অর্থাৎ লাঠির নিদর্শন)।" [সুরা নাযিআত : আয়াত ২০]

وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (سورة النمل)

"(হে মুসা,) এবং তোমার হাত তোমার বগলে (তোমার জামার বুকের অংশের উন্মুক্ত স্থানে) রাখো, তা বের হয়ে আসবে শুভ্র নির্মল অবস্থায়। তা ফেরআউন ও তার সম্প্রদায়ের কাছে আনীত নয়টি নিদর্শনের অন্তর্গত। তারা তো সত্যত্যাগী (ও নাফরমান) সম্প্রদায়।" [সুরা নামল : আয়াত ১২]

অবশিষ্ট সাতটি হলো শাস্তিমূলক নিদর্শন যা ফেরআউন, তার
দায় এবং মিসরবাসীর জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিলো। যেমন :
ান মাজিদে উল্লেখ করা হয়েছে—

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ () جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ () وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِن لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ () فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَا وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ (الأعراف)

া ফেরআউনের অনুসারীদেরকে দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফসলের ক্ষতির দ্বারা
ান্ত করেছি, যাতে তারা অনুধাবন করে। যখন তাদের কোনে কল্যাণ
, তারা বলতো, "এটা আমাদের প্রাপ্য।" আর যখন কোনো
্যাণ হতো তখন তারা মুসা ও তার সঙ্গীদেরকে অলক্ষুণে গণ্য
তা, তাদের অকল্যাণ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন; কিন্তু তাদের অধিকাংশ
ানে না। তারা বললো, "আমাদেরকে জাদু করার জন্য তুমি যে-
না নিদর্শন আমাদের কাছে পেশ করো না কেনো আমরা তোমাকে
স করবো না।" এরপর আমি তাদেরকে প্লাবন, পঙ্গপাল, উকুন,
ও রক্ত দ্বারা ক্লিষ্ট করি। এগুলো স্পষ্ট নির্দশন; কিন্তু তারা দাম্ভিকই
গেলো। আর তারা ছিলো এক অপরাধী সম্প্রদায়।' [সূরা আ'রাফ :
ঃ ১৩০-১৩৩]

স্পষ্ট নিদর্শনগুলোর দ্বিতীয় অংশের সম্পর্ক হযরত মুসা আ. এবং
ইসরাইলের মধ্যকার ঘটনাবলির সঙ্গে যুক্ত। তার মধ্যে কোনো
না মুজেযা বনি ইসরাইলকে ধ্বংস হওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখা এবং
আ.-এর নবুওতের সত্যতাকে সুদৃঢ় করার জন্য, যেমন : মান্না ও
ওয়া নাযিল হওয়া, মেঘ দ্বারা ছায়া প্রদান, লাঠির আঘাতে পাথর
ে বারোটি ঝরনা প্রবাহিত হওয়া। আর কোনো কোনোটি বনি
াইলের অবাধ্যাচরণের কারণে তাদের ভীতি প্রদর্শনের জন্য, যেমন :
পাহাড়ের অংশবিশেষকে তার স্থান থেকে উঠিয়ে এনে বনি
াইলের মাথার ওপর ধরে রাখা।

ান মাজিদে বর্ণিত আছে—

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ()

'আমি মেঘ দ্বারা তোমাদের ওপর ছায়া বিস্তার করলাম এবং তোমাদের কাছে মান্না ও সালওয়া (হালুয়া ও বটেরের ভাজা গোশত) প্রেরণ করলাম। বলেছিলাম, "তোমাদেরকে ভালো যা দান করেছি তা থেকে আহার করো।" তারা আমার প্রতি কোনো জুলুম করে নি; বরং তারা তাদের প্রতিই জুলুম করেছে। [সুরা বাকারা : আয়াত ৫৭]

وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

'স্মরণ করো, যখন মুসা তার সম্প্রদায়ের জন্য পানি প্রার্থনা করলো, আমি বললাম, "তুমি লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করো। ফলে তা থেকে বারোটি প্রস্রবণ প্রবাহিত হলো। প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পান-স্থান চিনে নিলো। বললাম, "আল্লাহ-প্রদত্ত জীবিকা থেকে তোমরা পানাহার করো এবং দুষ্কৃতিকারীরূপে পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে বেড়িও না।"' [সুরা বাকারা : আয়াত ৬০]

আর উভয় প্রকারের নিদর্শনগুলোর জন্য পার্থক্যনিরূপণকারী সীমারেখারূপে সেই নিদর্শনটি রয়েছে যা 'সমুদ্র-বিদারণ' অর্থাৎ লোহিত সাগরকে দ্বিখণ্ডিত করে শুকনো পথ বের করে আনা নামে আখ্যায়িত।

বস্তুত, তা ছিলো অত্যাচার ও উৎপীড়নের অবসান এবং উৎপীড়িত ও নির্যাতিত জীবনের সাহায্য ও রক্ষার জন্য একটি মীমাংসাকারী নিদর্শন। অথবা বলা যায়, লোহিত সাগর অতিক্রম করার পূর্ববর্তী ঘটনাবলির পরিণতি এবং পরবর্তী ঘটনাবলির উজ্জ্বল শুরুর জন্য তা ছিলো স্পষ্ট সীমা নিরূপণকারীর মর্যাদার অধিকারী। সুরা আ'রাফ, সুরা বনি ইসরাইল, সুরা তোয়া-হা, সুরা শুআরা, সুরা কাসাস, সুরা যুখরুফ, সুরা দুখান ও সুরা আয-যারিয়াতে এই বিষয়টিকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আর এই যাবতীয় নিদর্শন ও মুজেযা এমন একটি মহান ও উচ্চ মর্যাদাশীল নিদর্শনের পূর্বাভাস ও সূচনা ছিলো, যা এই পুরো ইতিহাসের আসল উদ্দেশ্য ও ভিত্তিমূল। তা হলো তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার নিদর্শন। যেমন : আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ

য় আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছিলাম; তাতে ছিলো পথনির্দেশ ও
া।' [সুরা মায়িদা : আয়াত ৪৪]

কথা, হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা.-এর উল্লিখিত হাদিসটি
বিষয়ের জন্য একটি মীমাংসাকারী বাণী। এ-কারণেই হাফেয
দুদ্দিন বিন কাসির এ-প্রসঙ্গে বলেছেন—

وهذا القول ظاهر جلي حسن قوي.

বক্তব্যটি সুস্পষ্ট, পরিষ্কার, উত্তম এবং শক্তিশালী।'[৮০]

হোক। ফেরআউনের অবিরাম অবাধ্যাচরণ, অত্যাচার ও উৎপীড়ন,
্যর সঙ্গে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ এবং নাফরমানির কারণে আল্লাহ তাআলার
থেকে মিসরবাসীর ওপর বিভিন্ন ধরনের ধ্বংসাত্মক শাস্তি আসছিলো
বিরতি দিয়ে দিয়ে ওইসব নিদর্শন ও মুজেযা প্রকাশ পাচ্ছিলো।
টি শাস্তি এলে সবাই হা-হুতাশ শুরু করতো এবং হযরত মুসা আ.-
বলতো, যদি তুমি এবার তোমার খোদার কাছে প্রার্থনা করে এই
াবকে দূর করে দাও, তবে আমরা সবাই ঈমান আনবো। এরপর
শাস্তি দূরীভূত হতো, তখন পুনরায় তারা আবাধ্যাচরণ ও আত্যাচার
করে দিতো। অবশেষে দ্বিতীয়বার আযাব এসে পড়তো। তখন
ার সেই পূর্বের অবস্থাই ঘটতো।

ঘটনার বিস্তারিত উল্লেখ একটু আগে সুরা আ'রাফের আয়াতগুলোতে
হয়েছে।

আয়াতগুলোতে বর্ণিত নিদর্শনসমূহের মধ্যে 'উকুন' ও 'ব্যাঙ'
র্কে জীবনচরিতকারগণ এই দুটি বস্তুর অবস্থা এমন ছিলো যে,
আউন ও তার সম্প্রদায়ের পানাহারের বস্তুসমূহ এবং ব্যবহারের

াফসিরে ইবনে কাসির, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১১; সুরা বনি ইসরাইলের আয়াত ১০১-
তাফসির।

আলোচনা বোঝার জন্য বিশেষভাবে রুহুল মা'আনি, তাফসিরে ইবনে কাসির,
সিরুল কাবির এবং বাহরুল মুহিত অধ্যয়ন করা জরুরি। তাহলে বুঝা যাবে যে,
ারের চূড়ান্ত মত কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচায়ক। ذَلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ
مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْ 'তা আল্লাহরই অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন।
হ তো মহা অনুগ্রহশীল।' [সুরা জুমআ : আয়াত ৪]

দ্রব্যগুলোর মধ্যে এমন কোনোটা ছিলো না যাতে উকুন ও ব্যাঙের অস্তিত দেখা যেতো না। এমনকি ফেরআউন ও তার সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলো এবং তারা ভগ্নহৃদয় হয়ে গেলো। আর রক্ত সম্পর্কে লিখেছেন যে, নীলনদের পানি লোহিত বর্ণ ধারণ করেছিলো। পানির স্বাদ পানিকে পান করার অযোগ্য করে তুলেছিলো। পানির মাছগুলো মরে গিয়েছিলো। তাওরাতের বর্ণনা থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়।

এ-বিষয়ে কুরআন মাজিদ বর্ণনা করছে—

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا () قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا (سورة بَنِي إِسْرَائِيلَ)

'তুমি বনি ইসরাইলকে জিজ্ঞেস করে দেখো আমি মুসাকে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম; যখন সে তাদের কাছে এসেছিলো, ফেরআউন তাকে বলেছিলো, "হে মুসা, আমি মনে করি তুমি তো জাদুগ্রস্ত।" মুসা বলেছিলো, "তুমি অবশ্যই অবগত আছো যে, এইসব স্পষ্ট নিদর্শন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালকই অবতীর্ণ করেছেন—প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ। হে ফেরআউন, আমি তো দেখছি (এসব নিদর্শন অস্বীকার করার কারণে) তোমার ধ্বংস আসন্ন।"' [সুরা বনি ইসরাইল : আয়াত ১০১-১০২]

وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى (طه)

'আমি তো তাকে (ফেরআউনকে) আমার সমস্ত নিদর্শন দেখিয়েছিলাম; কিন্তু সে মিথ্যা আরোপ করেছে ও অমান্য করেছে।' [সুরা তোয়া-হা : আয়াত ৫৬]

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ () وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (سورة النمل)

'এরপর যখন তাদের কাছে আমার স্পষ্ট নিদর্শন এলো, তারা বললো, "এ তো সুস্পষ্ট জাদু।" তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলোকে প্রত্যাখ্যান করলো, যদিও তাদের অন্তর এগুলোকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিলো। দেখো, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিলো।' [সুরা নামল : আয়াত ১৩-১৪]

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ () وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (سورة القصص)

'মুসা যখন তাদের কাছে আমার স্পষ্ট নিদর্শনগুলো নিয়ে এলো, তারা বললো, "এ তো অলীক ইন্দ্রজাল মাত্র! আমাদের পূর্বপুরুষদের কালে কখনো এমন কথা শুনি নি।" মুসা বললো, "আমাদের প্রতিপালক সম্যক অবগত, কে তার তাঁর কাছ থেকে পথনির্দেশ এনেছে এবং আখেরাতে কার পরিণাম শুভ হবে। জালিমরা কখনো সফলকাম হবে না।"' [সুরা কাসাস : আয়াত ৩৬-৩৭]

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ () فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ () وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ () وَقَالُوا يَا أَيُّهَ السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ () فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ (سورة الزخرف)

'আমি মুসাকে আমার নিদর্শনসহ ফেরআউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিলো, "আমি তো জগৎসমূহের প্রকিপালকের প্রেরিত (রাসুল)।" সে তাদের কাছে আমার নিদর্শনসহ আসামাত্র তারা তা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতে লাগলো। আমি তাদেরকে এমন কোনো নিদর্শন দেখাই নি, যা তার অনুরূপ নিদর্শন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়। আমি তাদেরকে (পার্থিব) শাস্তি দিলাম যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে। তারা বলেছিলো, "হে জাদুকর, তোমার প্রতিপালকের কাছে তুমি আমাদের জন্য (নবুওতের পদের ভিত্তিতে) তা প্রার্থনা করো যা তিনি তোমার সঙ্গে অঙ্গীকার করেছেন, (যেনো এই বিপদ দূর হয়ে যায়) তাহলে অবশ্যই আমরা সৎপথ অবলম্বন করবো।" এরপর যখন আমি তাদের থেকে শাস্তি বিদূরিত করলাম, তখনই তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে বসলো।' [সুরা যুখরুফ : আয়াত ৪৬-৫০]

وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ () كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ

'ফেরআউনের সম্প্রদায়ের কাছেও এসেছিলো সতর্কবাণী; কিন্তু তারা আমার সব নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করলো, এরপর পরাক্রমশালী ও

শক্তিমানরূপে আমি তাদেরকে সুকঠিন শাস্তি দিলাম।' [সুরা কামার : আয়াত ৪১-৪২]

فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى () فَكَذَّبَ وَعَصَى

'মুসা তাকে (ফেরআউনকে) বড় নিদর্শন দেখালো। তখন সে (মুসাকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো এবং অবাধ্যাচরণ করলো।' [সুরা নাযিআত : আয়াত ২০-২১]

বনি ইসরাইলের মিসর ত্যাগ এবং ফেরআউনের পশ্চাদ্ধাবন

বিষয়টি যখন এ-পর্যন্ত গড়ালো তখন আল্লাহ তাআলা মুসা আ.-কে নির্দেশ দিলেন, এখন সময় এসে গেছে, বনি ইসরাইলকে মিসর থেকে বের করে বাপ-দাদার দেশে নিয়ে যাও।

মিসর থেকে ফিলিস্তিন বা কিনআন ভূমির দিকে যাওয়ার দুটি রাস্তা ছিলো। একটি পথ ছিলো সরাসরি স্থলভাগের ওপর দিয়ে, এটি ছিলো নিকটবর্তী পথ। আর দ্বিতীয়টি ছিলো লোহিত সাগরের পথ। অর্থাৎ, লোহিত সাগর অতিক্রম করে 'সুর' এবং 'তীহ' বা 'সাইনা' প্রান্তরের পথ এবং এটি দূরবর্তী পথ। কিন্তু আল্লাহ তাআলার হেকমতের চাহিদা হলো এই যে, স্থলভাগের সরাসরি নিকটবর্তী পথটি ছেড়ে লোহিত সাগর অতিক্রম করে দূরবর্তী পথ দিয়ে যাওয়া হোক।

বর্ণিত ঘটনাবলির প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে, এই সঠিক পথটিকে আল্লাহ তাআলা এইজন্য প্রাধান্য দিয়েছে যে, স্থলভাগের পথটিকে অতিক্রম করার সময় ফেরআউন এবং তার সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ অপরিহার্য হয়ে পড়তো। কেননা, ফেরআউন ও তার সম্প্রদায় বনি ইসরাইলিদেরকে প্রায় ধরেই ফেলেছিলো। যদি সমুদ্রের মুজেযাটি না ঘটতো, তবে ফেরআউন বনি ইসরাইলিদেরকে মিসরে ফিরিয়ে নিতে সক্ষম হতো। আর কয়েক শতাব্দীর দাসত্ব বনি ইসরাইলিদেরকে কাপুরুষ ও দুর্বলচিত্ত বানিয়ে দিয়েছিলো। তারা ভয় ও আতঙ্কের কারণে কোনোক্রমে ফেরআউন ও তার সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতো না। তাওরাতের বর্ণনা থেকে এই ব্যাখ্যার সমর্থন পাওয়া যায় :

"আর ফেরআউন যখন তাদেরকে মিসর থেকে চলে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করলো, তখন আল্লাহ তাদেরকে ফিলিস্তিনের পথে নিলেন না, যদিও এ-পথই ছিলো নিকটবর্তী। কেননা, আল্লাহ তাআলার এমন ইচ্ছা

ছিলো না যে, তারা যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখে পস্তাতে থাকে এবং ফেরআউনের সঙ্গে মিসরে ফিরে যায়। বরং আল্লাহ তাআলা তাদেরকে লোহিত সাগর ও সাইনা প্রান্তরের ঘোরা পথ দিয়ে নিয়ে গেলেন।"[৮১]

তা ছাড়া ফেরআউন ও তার সম্প্রদায়কে মহান মুজেযার মাধ্যমে অত্যাচারী ও প্রবল প্রতাপশালী শক্তির কবল থেকে নির্যাতিত ও নিপীড়িত সম্প্রদায়কে মুক্তি প্রদানের উদ্দেশে অসাধারণ ঘটনা প্রকাশ করাও ছিলো উদ্দেশ্য। এ-কারণেই এই পথটিকে যথাযথ মনে করা হয়েছে।

মোটকথা, হযরত মুসা ও হারুন আ. বনি ইসরাইলকে নিয়ে রাতের বেলাতেই লোহিত সাগরের পথ ধরলেন। রওয়ানা হওয়ার পূর্বে তারা মিসরীয় রমণীদের অলঙ্কার ও মূল্যবান কাপড়সমূহও—যা এক উৎসব উপলক্ষে বনি ইসরাইলিরা ফেরআউনের সম্প্রদায় থেকে ধার নিয়েছিলো—ফেরত দিতে সক্ষম হয় নি। এই আশঙ্কায় যে, ফেরআউনের সম্প্রদায় হয়তো আসল ব্যাপার টের পেয়ে যাবে।

এদিকে গুপ্তচরেরা ফেরআউনকে জানালো যে, বনি ইসরাইলিরা মিসর থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্য শহর থেকে বের হয়ে গেছে। ফেরআউন তখনই এক বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে রাআ'মসিস থেকে বের হলো এবং বনি ইসরাইলিদের পশ্চাদ্ধাবন করলো। ভোর হওয়ার একটু আগে সে তাদের কাছাকাছি পৌঁছে গেলো।

তাওরাতের ভাষ্য অনুসারে শিশু ও গবাদি পশু ব্যতীত বনি ইসরাইলের সদস্যের সংখ্যা ছিলো ছয় লাখ। ভোর হওয়ার সময় যখন তারা পেছনের দিকে ফিরে তাকালো, দেখতে পেলো ফেরআউন সেনাবহিনীসহ তাদের মাথার ওপর উপস্থিত। তারা ঘাবড়ে গিয়ে মুসা আ.-কে বললো :

"মিসরে কি কবরের জায়গা ছিলো না যে তুমি আমাদের মারার জন্য এই প্রান্তরে নিয়ে এসেছো? তুমি আমাদের সঙ্গে এটা কী করলে যে আমাদেরকে মিসর থেকে বের করে আনলে? মিসরে থাকাকালে আমরা কি তোমাকে বলতাম না যে আমাদেরকে এখানেই থাকতে দাও, আমরা

---

[৮১] তাওরাত : আত্মপ্রকাশ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১৩, আয়াত ১৭-১৮।

মিসরীয়দের সেবাই করতে থাকি? আমাদের জন্য প্রান্তরে মৃত্যুবরণ করার চেয়ে মিসরীয়দের সেবা করাই উত্তম হতো।"[৮২]

ফেরআউনের নিমজ্জন

হযরত মুসা আ. তাদেরকে সান্ত্বনা প্রদান করে বললেন, ভয় করো না। আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুতি সত্য। তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে মুক্ত করবেন। অবশেষে তোমরাই সফলকাম হবে। এরপর হযরত মুসা আ. আল্লাহর দরবারে হাত উঠিয়ে দোয়া করলেন। আল্লাহর ওহি মুসা আ.-কে নির্দেশ দিলো, তোমা লাঠি দ্বারা সমুদ্রের পানির ওপর আঘাত করো। তাহলে সমুদ্রের মধ্যস্থলে শুকনো পথ বের হবে। যখন মুসা আ. লোহিত সাগরের বুকে তাঁর লাঠি দিয়ে আঘাত করলেন, সঙ্গে সঙ্গে পানি দুই ভাগ হয়ে দুই পাশে পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে গেলো। মধ্যস্থলে রাস্তা প্রকাশিত হলো। মুসা আ.-এর আদেশে বনি ইসরাইলিরা তাতে নেমে পড়লো। শুকনো পথের মতো তার উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে সাগরের অপর পারে চলে গেলো। ফেরআউন এই দৃশ্য দেখে তার সম্প্রদায়কে বললো, এ তো আমারই মহিমা যে, তোমার বনি ইসরাইলকে গিয়েই ধরে ফেলবে। সুতরাং, তোমরা এগিয়ে চলো। ফেরআউন ও তার সেনাবাহিনী বনি ইসরাইলের পিছে পিছে সে-পথেই নেমে পড়লো। কিন্তু আল্লাহ তাআলা অপার মহিমা দেখুন, বনি ইসরাইলিরা সবাই যখন নিরাপদে অপর পারে গিয়ে পৌঁছে গেলো, তখন আল্লাহ তাআলার নির্দেশে সাগরের পানি পুনরায় তার আসল অবস্থায় ফিরে এলো। এদিকে ফেরআউন ও তার গোটা সেনাবাহিনী, যারা তখনো মধ্য-সাগরে ছিলো, পানিতে নিমজ্জিত হয়ে গেলো।

ফেরআউন যখন ডুবতে লাগলো এবং আযাবের ফেরেশতাদেরকে চোখের সামনে দেখতে লাগলো, তখন ডেকে ডেকে বলতে লাগলো, "আমি সেই 'ওয়াহদাহু লা-শারিকা লাহু' একক সত্তার প্রতি ঈমান আনছি, যাঁর ওপর বনি ইসরাইল ঈমান এনেছে আর আমি আল্লাহর একান্ত অনুগত বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত।" কিন্তু এই ঈমান যেহেতু প্রকৃত

---

[৮২] তাওরাত : আত্মপ্রকাশ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১৪, আয়াত ১১-১২।

ঈমান ছিলো না; বরং আগের সময়ের মতো প্রতারণা ও ধোঁকা দিয়ে মুক্তিলাভের জন্য একটি অস্থিরতাসূচক উক্তি ছিলো।

آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (سورة يونس)

'এখন! (এখন এ-কথা বলছো!) ইতোপূর্বে তো তুমি অমান্য করেছো এবং তুমি অশান্তি সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।' [সূরা ইউনুস : আয়াত ৯১]

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা বেশ ভালোভাবেই জানেন যে, তুমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং ফেতনা-ফাসাদ বিস্তারকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

প্রকৃতপক্ষে ফেরআউনের এই সম্বোধন ছিলেন তেমনই এক প্রকারের সম্বোধন যা ঈমান আনা ও দৃঢ় বিশ্বাস লাভের উদ্দেশ্যে নয়; বরং এই সম্বোধন তা-ই যা আল্লাহ আযাব স্বচক্ষে দেখার পর বাধ্যতামূলক ও স্বাধীন ইচ্ছাহীন অবস্থায় মুখ থেকে বেরিয়ে যায়। বস্তুত, সচক্ষে আযাব দেখার পর ফেরআউনের এই ঈমান আনার ঘোষণা হযরত মুসা আ.-এর সেই দোয়ারই ফল ছিলো যা পঠকগণ পেছনের পৃষ্ঠাগুলোতে পাঠ করেছেন—

فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ () قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا

'তারা তো (নিজেদের চোখে) মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত ঈমান আনবে না। তিনি বললেন, "তোমাদের দুইজনের দোয়া কবুল করা হলো।"' [সূরা ইউনুস : আয়াত ৮৮-৮৯]

এখানে ফেরআউনের সম্বোধনের উত্তরে আল্লাহ তাআলার দরবার থেকে আরো একটি জবাব এই দেয়া হয়েছিলো যে—

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ

আজ আমি তোমার দেহটি রক্ষা করবো, যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাকো। অবশ্যই মানুষের মধ্যে অনেকে আমার নিদর্শন সম্পর্কে গাফেল।' [সূরা ইউনুস : আয়াত ৯২]

অতএব, যদি প্রাচীনকালের মিসরীয় শিলালপির বিষয়বস্তু বিশুদ্ধ হয়ে থাকে যে, মিনফাতাহ (দ্বিতীয় রিমসিস)-ই মুসা আ.-এর যুগে ফেরআউন ছিলো, তবে তো নিঃসন্দেহে আজ পর্যন্ত তার লাশ সংরক্ষিত আছে। কিছুক্ষণ সমুদ্রে নিমজ্জিত থাকার ফলে মাছ তার নাক খেয়ে ফেলেছিলো

এবং আজো তা মিসরীয় প্রত্নতত্ত্বের (Egyptology) জাদুঘরে সাধারণ ও বিশিষ্ট সর্বস্তরের দর্শকের জন্য বিনোদনের বস্তু হয়ে আছে।
আর যদি মেনে নেয়া হয় যে, এই লাশটি সেই ফেরআউনের নয়, তবুও আয়াতটি ভাবার্থ নিজের স্থানে সঠিক রয়েছে। কারণ, তাওরাতে স্পষ্ট বর্ণিত আছে যে, বনি ইসরাইলিরা স্বচক্ষে দেখেছিলো যে, সাগরে নিমজ্জিত মিসরীয়দের লাশ সাগরের তীরে পড়েছিলো :
"আর ইসরাইলিরা মিসরীয়দেরকে সমুদ্রের তীরে মরে পড়ে থাকতে দেখেছিলো।"[৮৩]

সমুদ্র-বিদারণ

কুরআন মাজিদ মিসর থেকে বনি ইসরাইলের যাত্রা, সমুদ্রে ফেরআউনের নিমজ্জিত হওয়া এবং বনি ইসরাইলের মুক্তিলাভের ঘটনাগুলোকে খুব সংক্ষেপে বর্ণনা করেছে; বরং ঘটনাগুলোর একান্ত জরুরি অংশগুলোই আলোচনা করেছে। অবশ্য ঘটনাবলি-সম্পর্কিত উপদেশ, জ্ঞানলাভ ও নসিহতের বিষয়গুলোকে একটু বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছে। যেমন : আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى () فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ () وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى (سورة طه)

'আমি অবশ্যই মুসার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছিলাম এই মর্মে যে, "আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাতের বেলা (মিসর থেকে) বের হয়ে যাও এবং তাদের জন্য সাগরের মধ্য দিয়ে একটি শুকনো পথ তৈরি করো। পেছন থেকে এসে তোমাকে ধরে ফেলা হবে এই – আশঙ্কা করো না এবং ভয়ও করো না।" এরপর (যখন মুসা আ. তাঁর বনি ইসরাইলকে নিয়ে বের হয়ে গেলেন তখন) ফেরআউন তার সৈন্যবাহিনীসহ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলো, তারপর সমুদ্র তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করলো। (অর্থাৎ তাদের ওপর যা ঘটার ছিলো ঘটে গেলো।) আর

[৮৩] তাওরাত : আত্মপ্রকাশ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১৪, আয়াত ৩১।

ফেরআউন তার সম্প্রদায়কে (নাজাত ও মুক্তি থেকে) পথভ্রষ্ট করেছিলো এবং সৎপথ দেখায় নি।' [সুরা তোয়া-হা : আয়াত ৭৭-৭৯]

وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ () فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ () إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ () وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ () وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ () فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ () وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ () كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ () فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ () فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ () قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ () فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ () وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ () وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ () ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ () إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ () وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

(سورة الشعراء)

'আমি মুসার প্রতি ওহি প্রেরণ করেছিলাম এই মর্মে, "আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাতের বেলা বের হও, তোমাদের তো পশ্চাদ্ধাবন করা হবে। (ফেরআউন ও তার সম্প্রদায় তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করবে।) তারপর ফেরআউন শহরে শহরে লোক সংগ্রহকারী পাঠালো (যেনো কিবতিদেরকে বনি ইসরাইলের পশ্চাদ্ধাবন করার জন্য ডেকে একত্র করা হয় এবং তাদেরকে উত্তেজিত করা হলো) এই বলে, 'এরা (বনি ইসরাইল) তো ক্ষুদ্র একটি দল, এরা তো আমাদের ক্রোধ উদ্রেক করেছে; (আমাদের অন্তর্দাহ সৃষ্টি করেছে) এবং আমরা তো সবাই সবসময় শঙ্কিত।" (অথবা আমরা সবসময় সতর্ক আছি। মোটকথা, কিবতিরা দলে দলে এসে ফেরআউনের সঙ্গে যোগদান করলো এবং সবাই মিলে রাতের বেলাতেই পলায়নপর বনি ইসরাইলিদের পশ্চাদ্ধাবন করলো। আল্লাহ বলেন,) পরিণামে আমি ফেরআউনের গোষ্ঠীকে বহিষ্কৃত করলাম তাদের উদ্যানরাজি ও প্রস্রবণ থেকে এবং ধন-ভাণ্ডার ও সুরম্য সৌধমালা থেকে। এমনই ঘটেছিলো (এভাবে কিবতিরা ঘর-বাড়ি, বাগ-বাগিচা, ফসলি ভূমি, ধন-ভাণ্ডার ইত্যাদি পেছনে ফেলে বনি ইসরাইলের পশ্চাদ্ধাবন করলো। তাদের ভাগ্যে আর ফিরে আসা হলো না। যেনো এটা আল্লাহ তাআলারই সিদ্ধান্ত ছিলো।) এবং বনি ইসরাইলকে করেছিলাম এই সমুদয়ের অধিকারী। তারা সূর্যোদয়ের সময় তাদের

পেছনে এসে পড়লো। তারপর যখন দুই দল পরস্পরকে দেখলো, তখন মুসার সঙ্গীরা বললো, “আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম।” মুসা বললো, “কখনোই নয়! আমার সঙ্গে আছেন আমার প্রতিপালক; সত্বর তিনি আমাকে পথনির্দেশ করবেন।” তখন আমি মুসার প্রতি ওহি প্রেরণ করলাম, “তোমার লাঠি দিয়ে সমুদ্রে আঘাত করো। ফলে তা বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক ভাগ পাহাড়ের মতো হয়ে গেলো; আমি ওখানে উপনীত করলাম অপর দলটিকে, এবং আমি উদ্ধার করলাম মুসা ও তার সঙ্গী সবাইকে, তারপর নিমজ্জিত করলাম অপর দলটিকে। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুমিন নয়। তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।' [সুরা শুআরা : আয়াত ৫২-৬৮]

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ () وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ (سورة الأعراف)

'সুতরাং আমি তাদেরকে (তাদের মন্দ কাজের কারণে) শাস্তি দিয়েছি এবং তাদেরকে (সেই অপরাধের প্রতিফলস্বরূপ) অতল সমুদ্রে নিমজ্জিত করেছি। কারণ তারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করতো। যে-সম্প্রদায়কে দুর্বল গণ্য করা হতো তাদেরকে আমি আমার কল্যাণপ্রাপ্ত রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী করি; এবং বনি ইসরাইল সম্পর্কে (হে নবী) তোমার প্রতিপালকের শুভ বাণী সত্যে পরিণত হলো, যেহেতু তারা ধৈর্য ধারণ করেছিলো, আর ফেরআউন ও তার সম্প্রদায়ের শিল্প এবং যেসব প্রাসাদ তারা নির্মাণ করেছিলো (শক্তি ও মর্যাদার জন্য যা-কিছু তারা করেছিলো) তা ধ্বংস করেছি।' [সুরা আ'রাফ : আয়াত ১৩৬-১৩৭]

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ () آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ () فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ (سورة يونس)

'আমি বনি ইসরাইলকে সমুদ্র পার করালাম এবং ফেরআউন ও তার সৈন্যবাহিনী ঔদ্ধত্যসহ সীমালঙ্ঘন করে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলো। অবশেষে যখন সে নিমজ্জমান হলো তখন বললো, "আমি বিশ্বাস করলাম বনি ইসরাইল যাতে বিশ্বাস করে। নিশ্চয় তিনি ব্যতীত অন্যকোনো ইলাহ নেই এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।" (আল্লাহ তাআলা বললেন,) "এখন! (এখন এ-কথা বলছো!) ইতোপূর্বে তো তুমি অমান্য করেছো এবং তুমি অশান্তি সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। আজ আমি তোমার দেহটি রক্ষা করবো, যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য (আল্লাহ তাআলার কুদরতের একটি) নিদর্শন হয়ে থাকো। অবশ্যই মানুষের মধ্যে অনেকে আমার নিদর্শন সম্পর্কে গাফেল।' [সুরা ইউনুস : আয়াত ৯০-৯২]

وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ () فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (سورة القصص)

'ফেরআউন ও তার বাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহঙ্কার করেছিলো এবং তারা মনে করেছিলো যে, তারা আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে না। সুতরাং আমি তাকে ও তার বাহিনীকে ধরলাম এবং তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। দেখো, জালিমদের পরিণাম কেমন (ভীষণ ও ভয়ঙ্কর) হয়ে থাকে!' [সুরা কাসাস : আয়াত ৩৯-৪০]

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ () أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ () وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ () وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ () وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ () فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ () فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ () وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ () كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ () وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ () وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ () كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ () فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ () وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ () مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ (سورة الدخان)

'এদের পূর্বে আমি ফেরআউনের সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছিলাম এবং তাদের কাছেও এসেছিলো এক সম্মানিত রাসুল। সে বলেছিলো, "আল্লাহর বান্দাদেরকে আমার কাছে প্রত্যর্পণ করো। আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসুল। এবং তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করো না, আমি তোমাদের কাছে উপস্থিত করছি স্পষ্ট প্রমাণ। তোমরা যাতে আমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে না পারো, তার জন্য আমি আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালকের শরণ নিচ্ছি। যদি তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন না করো, তবে তোমার আমার থেকে দূরে থাকো।" এরপর মুসা তার প্রতিপালকের কাছে নিবেদন করলো, "এরা তো এক অপরাধী সম্প্রদায়।" আমি বলেছিলাম, "তুমি আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাতের বেলা (মিসর থেকে) বের হয়ে পড়ো, তোমাদের পশ্চাদ্‌ধাবন করা হবে। (ফেরআউন ও তার বাহিনী তোমাদের পশ্চাদ্‌ধাবন করবে।) সমুদ্রকে স্থির থাকতে দাও,[৮৪] তারা এমন এক বাহিনী যারা নিমজ্জিত হবে।" তারা (মিসর থেকে বের হওয়ার সময়) পেছনে রেখে গিয়েছিলো কত উদ্যান ও প্রস্রবণ; কত শস্যক্ষেত্র ও সুরম্য প্রাসাদ, কত বিলাস উপকরণ, সেগুলোতে তারা আনন্দ পেত। এমনটাই ঘটেছিলো এবং আমি এই সমুদয়ের উত্তরাধিকারী করেছিলাম ভিন্ন সম্প্রদায়কে। আকাশ এবং পৃথিবী কেউ-ই তাদের জন্য চোখের পানি ফেলে নি এবং তাদেরকে অবকাশও দেয় হয় নি। আমি তো উদ্ধার করেছিলাম বনি ইসরাইলকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি থেকে ফেরআউনের; সে তো ছিলো পরাক্রান্ত সীমালঙ্ঘনকারীদের মধ্যে।' [সুরা দুখান : আয়াত ১৭-৩১]

فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا () وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا (سورة بَنِي إِسْرَائِيلَ)

---

[৮৪] হযরত মুসা আ. যখন বনি ইসরাইলসহ সমুদ্র অতিক্রম করছিলেন তখন তাদের জন্য সমুদ্রকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিলো।—২: ৫০ তাদের সমুদ্র অতিক্রম করার পর মুসা আ.-কে বলা হয়েছিলো, সমুদ্রকে সেই অবস্থায় থাকতে দাও, যাতে ফেরআউন ও তার বাহিনী তাতে প্রবেশ করে।—৭ : ১৩৬

'এরপর ফেরআউন তাদেরকে দেশ থেকে উচ্ছেদ করার সংকল্প করলো; তখন আমি ফেরআউন ও তার সঙ্গীগণ সবাইকে নিমজ্জিত করলাম। এরপর আমি বনি ইসরাইলকে বললাম, "তোমরা ভূপৃষ্ঠে বসবাস করো এবং যখন কেয়ামতের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে তখন তোমাদের সবাইকে আমি একত্র করে উপস্থিত করবো।"' [সূরা বনি ইসরাইল : আয়াত ১০৩-১০৪]

وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ () فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ () فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ (سورة الذاريات)

'এবং আমি নিদর্শন রেখেছি মুসার বৃত্তান্তে, যখন আমি তাকে স্পষ্ট প্রমাণসহ ফেরআউনের কাছে প্রেরণ করেছিলাম, তখন সে ক্ষমতার দম্ভে মুখ ফিরিয়ে নিলো এবং বললো, "এই ব্যক্তি হয় এক জাদুকর, না হয় এক উন্মাদ।" সুতরাং আমি তাকে এবং তার দলবলকে শাস্তি দিলাম এবং তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম, সে তো ছিলো তিরস্কারযোগ্য।' [সূরা যারিয়াত : আয়াত ৩৮-৪০]

অবশ্য তাওরাত উপরে বর্ণিত ঘটনাবলি ছাড়াও আরো অনেক কিছু বিস্তারিত বিবরণসহ উল্লেখ করেছে। বনি ইসরাইলের যাত্রা করা এবং তাদের বিশ্রাম গ্রহণের বহু স্থানের নামও উল্লেখ করেছে। দুনিয়াবাসী তার কিছুই জানে না।

তাওরাতের বর্ণনার সারমর্ম এই :

"ফেরআউন এবং তার সম্প্রদায়ের ওপর আল্লাহ তাআলার প্রেরিত শাস্তির ধারা শুরু হয়ে গেলো এবং হযরত মুসা আ.-এর কথা অনুসারে একের পর এক নিদর্শন প্রকাশ পেতে লাগলো। তখন ফেরআউন হযরত মুসা আ.-কে ডেকে বললো, বনি ইসরাইলকে মিসর থেকে বের করে নিয়ে যাও। কিন্তু তাদের চতুষ্পদ ও গৃহপালিত পশুগুলোকে এখানেই ছেড়ে যেতে হবে। হযরত মুসা আ. এই শর্ত মানতে অস্বীকৃতি জানালেন এবং বললেন, এই পশুগুলোকে রেখে দেয়ার অধিকার তোমার নেই। ফেরআউন তখন ক্রোধান্বিত হয়ে বললো, তবে বনি ইসরাইলিরাও মিসর থেকে বের হতে পারবে না। আর এরপর থেকে তুমি কখনো আমার সামনে এসো না। অন্যথায় তুমি আমার হাতে মারা যাবে। হযরত মুসা আ. বললেন, হ্যাঁ, এ তুমি ঠিকই বলেছো। এখন থেকে আমি কখনো আর তোমার সামনে আসবো না। আমার খোদার মীমাংসাও এটাই।

আর তিনি আমাকে বলে দিয়েছেন যে, তোমার এবং তোমার সম্প্রদায়ের ওপর এমন কঠিন বিপদ আসবে যে, তোমার এবং কোনো মিসরবাসীর প্রথম সন্তান জীবিত থাকবে না।

হযরত মুসা আ. ফেরআউনের সঙ্গে এমন কথোপকথনের পর তার দরবার থেকে বের হয়ে এলেন। তিনি বনি ইসরাইলের উদ্দেশে বললেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ফেরআউনের হৃদয় কঠিন হয়ে পড়েছে। সে এখন তোমাদেরকে মিসর থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত যেতে দেবে না, যতক্ষণ আরো অধিক নিদর্শন না দেখে ছাড়ে। যার ফলে সমগ্র মিসরবাসীর মধ্যে ক্রন্দন ও বিলাপ শুরু হয়ে যায়। কিন্তু তোমাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করা উচিত। কেননা, মিসর থেকে বের হওয়ার সময় চলে এসেছে। আর আল্লাহ তাআলা মুসা আ.-এর মাধ্যমে বনি ইসরাইলকে মিসর থেকে বের হওয়ার পূর্বে কুরবানি ও ঈদ উৎসব উদ্‌যাপনের আদেশ করলেন এবং তার শর্ত ও নিয়মও বলে দিলেন। মুসা আ. তাদেরকে এটাও বললেন, তোমরা তোমাদের নারীদেরকে বলো, তারা যেনো মিসরীয় নারীদের কাছে গিয়ে ঈদ উৎসবের জন্য তাদের কাছ থেকে তাদের স্বর্ণ ও রুপার অলঙ্কার এবং মূল্যবান কাপড়-চোপড় ধার চেয়ে আনে। মিসরীয় রমণীরা অবশেষে তাদেরকে অলঙ্কারসমূহ প্রদান করে। এরপর আল্লাহ তাআলার কাজ এমন হলো যে, এক রাতে ফেরআউন থেকে শুরু করে সাধারণ মিসরবাসী সবার প্রথম সন্তান মরে গেলো এবং সব পরিবারে কান্না ও বিলাপের রোল পড়ে গেলো। এই ঘটনা দেখে মিসরবাসীরা ফেরআউনের কাছে দৌড়ে গেলো। তারা ফেরআউনকে বাধ্য করলো যে, এই মুহূর্তে বনি ইসরাইলকে মিসর থেকে বের করে দাও। যাতে এই অমঙ্গলজনক দুর্বিপাক এখন থেকে দূরীভূত হয়ে যায়। এদের কারণেই আমাদের ওপর এসব বিপদ আসছে।

তখন ফেরআউন হযরত মুসা আ.-কে বললো, এই মুহূর্তে তোমরা এই দেশ থেকে বের হয়ে যাও। তোমাদের চতুষ্পদ জন্তু, গৃহপালিত পশু এবং যাবতীয় আসবাবপত্র সঙ্গে করে নিয়ে যাও। বনি ইসরাইলিরা তখন রাআ'মসিস (উৎসবের শহর) ত্যাগ করে বেরিয়ে এলো। তখন তাদের শিশু ও গৃহপালিত পশু ছাড়া ছয় লাখ লোক ছিলো। যখন তার বের হয়ে এলো, তখন মিসরীয়দের অলঙ্কারগুলোও ফেরত দিতে পারলো না এবং মিসরীয়রাও তা দাবি করলো না।

বনি ইসরাইল যখন অরণ্যের পথ ধরার পর ফেরআউন ও সভাসদবর্গ তাদের সিদ্ধান্তের জন্য ভীষণভাবে আফসোস করতে লাগলো। তারা পারস্পরিক বলাবলি করতে লাগলো, আমরা অযথাই এমন ভালো ভালো চাকর-গোলাম ও দাস-দাসী হাতছাড়া করলাম। ফেরআউন তখন নির্দেশ দিলো, এই মুহূর্তেই সরদারদেরকে, মিসরীয় যুবকদেরকে এবং সেনাবাহিনীকে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলো। মোটকথা, ফেরআউন প্রতাপ ও প্রতিপত্তির সঙ্গে বীরবিক্রমে রথে আরোহণ করে বের হয়ে পড়লো এবং বনি ইসরাইলিদের পশ্চাদ্ধাবন করলো।

বনি ইসরাইল 'রাআ'মাসিস' থেকে 'সিকাত', 'সিকাত' থেকে 'আইতাম', 'আইতাম' থেকে মোড় ঘুরে 'আহদাল' এবং লোহিত সাগরের মধ্যবর্তী 'ফি-হাইখারুত'-এর নিকটবর্তী 'লাআলে-সাফওয়ান'-এর সামনে তাঁবু ফেলেছিলো। বনি ইসরাইলের এই পূর্ণ সফরে আল্লাহ তাআলা তাদের সঙ্গে থাকলেন এবং তিনি নুরের স্তম্ভের আলো দ্বারা রাতের বেলাতেও তাদেরকে পথপ্রদর্শন করতেন এবং দিনের বেলা তাদের সামনে সামনে থাকতেন। মোটকথা, ভোরের আলো প্রকাশ পেতেই ফেরআউন ও তার বাহিনি লোহিত সাগরের তীরে এসে বনি ইসরাইলের নাগাল পেলো। বনি ইসরাইল পেছনের দিকে তাকিয়েই দেখলো যে, ফেরআউন তার সেনাবাহিনীসহ তাদের কাছে এসে পৌঁছে গেছে। তখন তারা ভগ্নহৃদয় ও ভীত হয়ে হযরত মুসা আ.-এর সঙ্গে বিতণ্ডা শুরু করে দিলো। মুসা আ. তাদেরকে অনেক সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তোমাদের শত্রুর দল ধ্বংস হবে এবং তোমরা নিরাপত্তা ও শান্তির সঙ্গে মুক্তি পাবে। এরপর তিনি আল্লাহ তাআলার দরবারে মুনাজাত করতে লাগলেন।

আল্লাহ তাআলা মুসাকে বললেন, তুমি আমার কাছে ফরিয়াদ কেনো করছো? বনি ইসরাইলকে বলো, তারা সামনের দিকে অগ্রসর হোক আর তুমি তোমার লাঠি উঠিয়ে তোমার হাত সমুদ্রের ওপর বাড়াও এবং সমুদ্রকে দুই অংশে ভাগ করে দাও। তখন বনি ইসরাইল সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে শুকনো ভূমির ওপর হেঁটে অপর পারে চলে যাবে। এরপর হযরত মুসা আ. নিজে সমুদ্রের ওপর হাত বাড়ালেন। আল্লাহ তাআলার সারা রাতব্যাপী পুবালি বায়ু চালালেন এবং সমুদ্রের পানি দুই দিকে সরিয়ে দিয়ে তাকে শুকনো জমিনে পরিণত করে দিলেন। পানি দুই

ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলো এবং বনি ইসরাইল সমুদ্র-গর্ভ দিয়ে শুকনো জমিনের ওপর হেঁটে পার হয়ে গেলো।
আল্লাহ তাআলার সমুদ্রের মধ্যস্থলে মিসরীয়দেরকে ডুবিয়ে দিলেন। পানি ফেরআউন ও তার সম্প্রদায়ের ওপর নিজের স্থানে ফিরে এলো এবং তাদের রথসমূহকে, আরোহীদেরকে এবং ফেরআউনের গোটা সেনাবাহিনীকে—যারা বনি ইসরাইলের পশ্চাদ্‌ধাবন করেছিলো—সমুদ্রে নিমজ্জিত করে দিলো। তাদের একজনকেও অবশিষ্ট রাখলো না। অথচ বনি ইসরাইলিরা সমুদ্রের মধ্যভাগে শুকনো জমিনের ওপর দিয়ে হেঁটে সমুদ্র পার হয়ে গেলো। পানি তাদের ডানদিকে ও বামদিকে প্রাচীরের মতো দণ্ডায়মান থাকলো। আর আল্লাহ তাআলা মিসরীয়দের ওপর তাঁর যে-মহাশক্তি প্রকাশ করলেন, বনি ইসরাইল তা দেখলো এবং তারা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করলো এবং তাঁর ওপর ও তাঁর বান্দা মুসার ওপর ঈমান আনলো।"[৮৫]

তাওরাতের এসব বিস্তারিত বিবরণে যদিও ভালো-মন্দ ও জানাশোনার বাইরে অনেক কথা রয়েছে, কিন্তু এ-সম্পর্কে কুরআন মাজিদ এবং তাওরাতের মূল উদ্দেশ্য একই। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা ফেরআউন ও তার নিষ্ঠুর অত্যাচার ও উৎপীড়ন থেকে মুসা আ. এবং বনি ইসরাইলকে এক বিরাট মুজেযা মাধ্যমে মুক্তি দিয়েছেন। কুরআন মাজিদ বলে, এই মুজেযাটি এভাবে প্রকাশিত হয়েছিলো যে, আল্লাহর নির্দেশে মুসা আ. লোহিত সাগলের ওপর লাঠি দিয়ে আঘাত করলেন, ফলে সাগরের পানি মধ্যস্থলে শুকনো করে দিয়ে দুই দিকে পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে গেলো।

فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ

'তারপর আমি মুসার প্রতি ওহি করলাম, "তোমার লাঠি দিয়ে সমুদ্রে আঘাত করো।" ফলে তা বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক ভাগ বিশাল পাহাড়ের মতো হয়ে গেলো।' [সুরা শুআরা : আয়াত ৬৩]

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ

[৮৫] তাওরাত : আবির্ভাব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১৪, আয়াত ১৫-৩১।

'যখন তোমাদের জন্য সাগরকে বিভক্ত করেছিলাম এবং তোমাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম ও ফেরআউনের সম্প্রদায়কে নিমজ্জিত করেছিলাম আর তোমরা তা প্রত্যক্ষ করছিলে।' [সুরা বাকারা : আয়াত ৫০]

তাওরাত এই বক্তব্যেরও সমর্থন করছে। তাওরাতে উল্লেখ আছে :

"তুমি তোমার লাঠি উত্তোলন করো, তোমার হাতকে সমুদ্রের ওপর বাড়াও এবং তাকে দুই ভাগে বিভক্ত করো। ... আর পানি তাদের ডানে ও বামে দেয়ালের মতো থাকলো।"

অবশ্য তাওরাতে এই কথাটুকু অতিরিক্ত বাড়ানো হয়েছে যে, "সারারাত পুবালি ঝড়ো হাওয়া চালিয়ে এবং সমুদ্রকে পেছনের দিকে সরিয়ে তাকে শুষ্ক জমিনে পরিণত করা হলো।" অতএব, তাওরাতের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন এবং বিভিন্ন বছরের বিভিন্ন রকমের অনুবাদের প্রতি লক্ষ করলে কুরআন মাজিদের বর্ণনাকেই নির্ভরযোগ্য ধরা হবে। কেননা, শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সবাই এ-কথায় একমত যে, পবিত্র কুরআন সব ধরনের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন থেকে সুরক্ষিত রয়েছে। এই মর্মে আল্লাহ তাআলা বলেন—

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

'কোনো মিথ্যা তাতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না—সামনে থেকেও না, পেছন থেকেও না। তা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসার্হ আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।' [সুরা হা-মীম আস-সাজদা : আয়াত ৪২]

তা ছাড়া তাওরাতের উল্লিখিত সংযোজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধনের উত্তম উপায় এটাও হতে পারে যে, হযরত মুসা আ. হাত বাড়িয়ে লাঠি চালানোর ফলে প্রথমে সাগর দুই ভাগে বিভক্ত হলে গেলো। এরপর যখন লাখ লাখ মানুষ তার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে শুরু করলো, তখন জমিনের আদ্রতাকে শুষ্ক করার জন্য অনবরত পুবালি ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত হতে থাকলো। জমিন শুকিয়ে গেলে শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত এবং মানুষ থেকে পশু পর্যন্ত কারো পথ অতিক্রমে কোনো ধরনের অসুবিধা ও কষ্ট হলো না।

দুর্ভাগ্যবশত মুসলমানের মধ্যে কিছু মানুষ এমনও আছে যারা 'জ্ঞান'-এর নামে ধর্মের প্রতিটি বিষয়কে 'মাদ্দিয়াত' বা বস্তুবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ দেখতে চায় এবং এই কারণে তারা আল্লাহ প্রদত্ত মুজেযাগুলোকে—যা

নবী ও রাসুলগণের সত্যতার সমর্থনে ও প্রমাণে প্রকাশিত হয়—অস্বীকার করে থাকে। মুজেযা অস্বীকার করার অর্থ তা-ই যা পেছনের পাতাগুলোতে মুজেযার আলোচনা প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। অর্থাৎ তারা আল্লাহ তাআলার কোনো কাজকেই কোনো অবস্থাতেই এই অনুভূতিগ্রাহ্য ও জড়বস্তুর দুনিয়ার কারণ ও উপকরণ থেকে মুক্ত বলে মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। কারণ, তাদের এই নাস্তিকতা ও খোদাদ্রোহিতার ভিত্তি প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্যের নাস্তিকতা ও খোদাদ্রোহিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর তাদের মন ও মস্তিষ্ক পাশ্চাত্যেরই প্রভাবে প্রভাবিত ও বশীভূত। এর অনিবার্য ফল বস্তুবাদের ওপর বিশ্বাস ও নির্ভর ব্যতীত আর কিছুই হতে পারে না।

অন্য ক্ষেত্রগুলোর মতো এই ক্ষেত্রেও তারা চেষ্টা করেছে যে, কী প্রকারে ফেরআউনের নিমজ্জনের বিষয়টিও রুহানি মুজেযা থেকে বের হয়ে জড় কারণ ও উপকরণের অধীন চলে আসে। ভারত উপমহাদেশে মুসলমানদের পার্থিব উন্নতির জন্য কর্মশীল ব্যক্তিত্ব মরহুম স্যার সৈয়দ আহমদ খানও আরবি ভাষার বিদ্যা ও ধর্মীয় জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা সত্ত্বেও উপরিউক্ত বিশ্বাসকে প্রচলিত করার ক্ষেত্রে অগ্রপথিক ছিলেন। খুব সম্ভব তিনি ইউরোপের বর্তমান জীবনব্যবস্থার সঙ্গে ইসলামের ঐক্য সাধন করতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু বস্তুবাদের এই খোলস ইসলামের দেহাবয়বের সঙ্গে খাপ খায় নি। ফলে তিনি খোলসের সংশোধনের পরিবর্তে ইসলামেরই চিত্র ও দেহাবয়বের সংশোধন শুরু করে দিলেন। অবশ্য তিনি এতে কৃতকার্য হতে পারেন নি।

নিঃসন্দেহে ইসলাম এমন একটি রুহানি ধর্ম যা রুহানিয়্যাত বা আধ্যাত্মিক চেতনার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পার্থিব জীবনেও মানুষের উন্নতি, সফলতা এবং কল্যাণ নিশ্চিতকরণের দায়িত্ব বহন করে। এ-কারণেই প্রত্যেক যুগেই ইসলামের কোলে নানাবিধ বিদ্যার প্রতিপালন ও উন্নতি ঘটেছে। আর জ্ঞান ও বিজ্ঞান সবসময় ইসলামের অনুগ্রহের ছায়াতলে ক্রমবিকাশ ও উৎকর্ষ লাভ করেছে। কিন্তু বস্তুবাদী বিদ্যাসমূহের সীমা বস্তুবাদ, চাক্ষুষ দর্শনযোগ্য ও অনুভূতিগ্রাহ্য বিষয় থেকে এক বিন্দুও সামনে অগ্রসর হতে পারে নি। আর আজকের বিজ্ঞান এবং অতীতের দর্শন উভয়টিই এ-কথা স্বীকার করে যে, আমাদের সীমা অনুভূতিগ্রাহ্য পদার্থের ওপারে আর নেই। অর্থাৎ অনুভবযোগ্য বিষয় ও জড়পদার্থের

দেয়ালের পেছনে কী আছে, তারা সে সম্পর্কে নিজেদের অজ্ঞতা তো প্রকাশ করছে; কিন্তু তারা তা অস্বীকার করে না।

ইসলামের দাবি এই যে, অতীত ও বর্তমান কালে বিদ্যাসমূহ যখন থিওরি ও চিন্তাধারা থেকে অগ্রসর হয়ে অনুভূতিগ্রাহ্যতা ও চাক্ষুষ দর্শনের সীমা পর্যন্ত পৌঁছেছে, তখন তাদের একটি বিষয়ও এমন পাওয়া যায় নি যা ইসলামের মূলনীতির বিরোধী অথবা ইসলামে তার অস্বীকৃতি পাওয়া যায়। তবে এমতাবস্থায়, ভবিষ্যতের দিনগুলোতে যে-পর্যন্ত বিদ্যার থিওরি ও চিন্তাধারায় পরিবর্তন ঘটতে থাকবে এবং বিদ্যাগত অনুসন্ধান ও গবেষণা এক স্থান ত্যাগ করে ভিন্ন অবস্থান নির্মাণ করবে, তখন ইসলামকে সেগুলোর সাদৃশ ও অনুরূপ করার চেষ্টা বৃথা। কারণ, চাক্ষুষ দর্শনের সীমায় পৌঁছার পর নিঃসন্দেহে তাদের মীমাংসা কুরআনের মীমাংসার চেয়ে এক ইঞ্চিও অগ্রসর হতে পারবে না।

অবশ্য ইসলাম বা সত্যধর্ম এমন কতগুলো বিষয়কেও স্বীকার করে যা বস্তুবাদী দুনিয়ার ওপারের জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। যেমন : আখেরাত, হাশর-নাশর, জান্নাত, জাহান্নাম, ফেরেশতা, ওহি, নবুওত ও মজেযা। কিন্তু এই স্বীকৃতি এই শর্তের সঙ্গে যে, এগুলোর মধ্যে কোনো বিষয়ই জ্ঞানের বিরোধী অর্থাৎ জ্ঞানের দৃষ্টিতে অসম্ভব নয়। তারপরও জ্ঞানের পক্ষে সেগুলোর রহস্য ও মূলতত্ত্বের উপলব্ধি শুধু এই পরিমাণই হতে পারে, ধর্ম নিজের ধ্রুব জ্ঞান (আল্লাহর ওহি)-এর দ্বারা যে-পরিমাণ তা বিবৃত করেছে। আর এই বিষয়গুলোকে উপলব্ধি করার জন্য ওহি ব্যতীত জ্ঞানের কাছে অন্যকোনো উপায় নেই।

যাইহোক। সৈয়দ আহমদ সাহেব তাফসিরে আহমদিতে এই জায়গাটুকুর তাফসির করেছেন এমন : সমুদ্রে বনি ইসরাইলের নিমজ্জিত হওয়া এবং বনি ইসরাইলিদের রক্ষা পাওয়া 'মুজেযা' ছিলো না; বরং তা সাধারণ পার্থিব কারণ ও উপকরণের ধারাবাহিকতায় সমুদ্রের জোয়ার-ভাটার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যাপার। অর্থাৎ, এই অবস্থা ঘটেছিলো যে, যখন বনি ইসরাইল লোহিত সাগর অতিক্রম করেছিলো তখন তার পানি সঙ্কুচিত হয়ে ছিলো এবং পেছনে সরে গিয়ে ভাটার রূপ ধারণ করেছিলো। ফেরআউন যখন এমন সহজভাবে বনি ইসরাইলকে সমুদ্র পার হয়ে চলে যেতে দেখলো, তখন সেও তার সেনাবাহিনীকে সমুদ্রে প্রবেশ করার জন্য নির্দেশ দিলো। কিন্তু ততক্ষণে বনি ইসরাইল পার হয়ে গিয়েছিলো

এবং ফেরআউনের সেনাবাহিনী তখনো সমুদ্রের শুকনো স্থান অতিক্রম করছিলো। ঠিক এ-সময় সাগরের জোয়ার আসার সময় হলে গেলো। ফেরআউন ও তার লোকজন ও সেনাবাহিনী এতটুকু অবকাশও পেলো না যে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে অথবা পেছনের দিকে সরে আসবে। ফলে সবার সলিলসমাধি ঘটলো।

সৈয়দ আহমদ সাহেব তাঁর এই ধারণা অনুসারে বনি ইসরাইলের সমুদ্র পার হওয়া সম্পর্কে একটি মানচিত্রও দিয়েছেন। তাতে তিনি এ-বিষয়টি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, বনি ইসরাইল লোহিত সাগরের উত্তর দিকের মুখের দিকে গমন করে সাগর পার হয়েছিলো।

কিন্তু আফসোসের সঙ্গে বলতে হয় যে, কুরআন মাজিদের বর্ণনা চরমভাবে তা অস্বীকার করছে এবং সৈয়দ আহমদ সাহেবের কথাকে কোনোভাবেই খাপ খাওয়ানো যাচ্ছে না।

অবশ্য যে-জায়গা দিয়ে বনি ইসরাইল লোহিত সাগর অতিক্রম করেছিলো, বিশেষভাবে সেই জায়গাটুকু নির্দিষ্ট করা অসম্ভব। কেননা, এ-প্রসঙ্গে তাওরাতই অতীতযুগের ইতিহাসের প্রাচীন ভাণ্ডার। কিন্তু তাওরাতে বর্ণিত স্থানগুলো বর্তমান যুগের মানুষের কাছে কতগুলো অজ্ঞাত নাম ছাড়া কিছু নয়।

অবশ্য কুরআন মাজিদ ও তাওরাতের যৌথ বর্ণনা ও আয়াতগুলো থেকে এটা নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করা যেতে পারে যে, বনি ইসরাইল লোহিত সাগরের কোন্ পাশ ও মুখ দিয়ে অথবা মধ্যস্থলের কোন্ অংশ দিয়ে অতিক্রম করেছিলো।

এটা বোঝার জন্য নিম্নে অঙ্কিত মানচিত্রটির সেই অংশের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন যেখানে লোহিত সাগর—বাহরে কুলযুম বা Red Sea অঙ্কিত রয়েছে। লোহিত সাগর প্রকৃতপক্ষে আরব সাগরের একটি শাখা। এর পূর্ব দিকে আরব দেশ এবং পশ্চিম দিকে মিসর অবস্থিত। উত্তর দিকে এর দুটি শাখা বেরিয়ে গেছে। একটি শাখা (আকাবা উপসাগর) সাইনা উপদ্বীপের পূর্বদিকে এবং দ্বিতীয় শাখা (সুয়েজ উপসাগর) সাইনার পশ্চিম দিকে অবস্থিত। এই দ্বিতীয় শাখাটি (পশ্চিম শাখা) প্রথম শাখা (পূর্ব শাখা) থেকে বড় এবং তা উত্তর দিকে বহুদূর পর্যন্ত চলে গেছে। বনি ইসরাইল এরই মধ্যাংশ দিয়ে সাগর অতিক্রম করেছে। এই শাখাটির উত্তর দিকে মোহনার সামনে অন্য একটি সাগর অবস্থিত। তা

হলো বাহরে রুম বা ভূমধ্য সাগর (the Mediterranean Sea)। ভূমধ্য সাগর এবং লোহিত সাগরের এই উত্তর দিকের মোহনার মধ্যস্থলে সামান্য একটু শুকনো জমিনের অংশ রয়েছে। এটাই সেই পথ, যে-পথে মিসর থেকে ফিলিস্তিন ও কিনআনগামী যাত্রীদেরকে লোহিত সাগর পার হওয়ার প্রয়োজন পড়তো না এবং সেকালে এই পথটিকে নিকটবর্তী পথ বলে মনে করা হতো। আর বনি ইসরাইলিরা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় এই পথ অবলম্বন করে নি। বর্তমানে সেই শুষ্ক ভূমিটুকু খনন করে লোহিত সাগরকে ভূমধ্য সাগরের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়া হয়েছে। এই খণ্ডটুকুর নাম সুয়েজ প্রণালি। আর লোহিত সাগরের উত্তর দিকের মোহনায় সুয়েজ নামে একটি শহর রয়েছে। এটি মিসরের বন্দর এলাকা বলে গণ্য হয়।

তারপর কুরআন মাজিদের সুরা বাকারা ও সুরা শুআরার যে-আয়াতগুলো এ-ব্যাপারে বিবরণ পেশ করলে সে-আয়াতগুলোর প্রতি আর একবার গভীর মনোযোগ দেয়া উচিত। এ-আয়াতগুলোতে পরিষ্কারভাবে দুটি বিষয়ের আলোচনা রয়েছে। একটি হলো فلق يا فرق بحر অর্থাৎ সমুদ্র খণ্ডিত হওয়া বা তাকে খণ্ডিত করে দেয়া। আর দ্বিতীয় বিষয়টি হলো উভয় পাশে পানির পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এবং মধ্যস্থলে রাস্তা সৃষ্টি হওয়া। যেমন কুরআন মাজিদ বলছে—

فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ

'ফলে তা বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক ভাগ পাহাড়ের মতো হয়ে গেলো।'

এখানে فرق শব্দের অর্থ দ্বিখণ্ডিত করে পৃথক করা। বিশেষ করে فرق-এর সম্পর্ক যদি بحر অর্থাৎ সমুদ্রের সঙ্গে হয়, তখন খণ্ডিত করে ভিন্ন ভিন্ন দুই অংশে বিভক্ত করে দেয়াই অর্থ হবে। যেমন : অভিধানে আছে فرق البحر অর্থ فلقه অর্থাৎ, সমুদ্রকে পৃথক পৃথক দুইভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে। আর মাথার সিঁথিকে فرق বলা হয় এইজন্য যে, তা মাথার চুলগুলোকে দুইভাগে বিভক্ত করে মধ্যস্থল প্রকাশ করে।

আর فلق সম্পর্কে অভিধানে উল্লেখ আছে যে, فلق الشيء অর্থ شقه অর্থাৎ, বস্তুটিকে বিদীর্ণ করেছে বা ফাটিয়েছে বা দ্বিখণ্ডিত করেছে বা ভেঙে

ফেলেছে। فلق-এর আরেক অর্থ প্রভাব উদ্ভাসিত করেছে। আর انفلق। অর্থ انشق। অর্থাৎ, বস্তুটি ফেটে গেছে, বিদীর্ণ হয়েছে, দ্বিখণ্ডিত হয়েছে বা ভেঙে গেছে।— فلق الشيء فانفلق 'সে বস্তুটিকে দ্বিখণ্ডিত/বিদীর্ণ করেছে ফলে তা দ্বিখণ্ডিত/বিদীর্ণ হয়েছে।' এ-কারণেই পাথরের মধ্যকার ফাটলকে فلق বলা হয়। এভাবে বিরাট পাহাড়কে طود বলা হয়। যেমন : অভিধানে উল্লেখ করা হয়েছে, الطود - الجبل العظيم। অর্থাৎ, طود মানে বিরাট পাহাড়।

আভিধানিক অর্থ বিশ্লেষণের পর উল্লিখিত দুটি আয়াতের পরিষ্কার অর্থ হলো এই যে, সাগরের পানি সুনিশ্চিতভাবে দ্বিখণ্ডিত হয়ে গিয়েছিলো এবং ফাঁকা জায়গায়র উভয় পাশে পানি দুটি বিরাট দণ্ডায়মান পাহাড়ের মতো হয়ে গিয়েছিলো এবং মধ্যস্থলে রাস্তা সৃষ্টি হয়েছিলো। এটা তখনই সম্ভব হতে পারে যখন বনি ইসরাইল সাগরের এমন অংশ দিয়ে পার হয়ে থাকবে যা মোহনা ও তীরের সামনে অংশ হবে না ; বরং পানির এমন অংশ হবে যা মধ্যখানে ফেটে গিয়ে দুই ভাগে বিভক্ত হতে পারে। অন্য শব্দে এভাবে বলা যেতে পারে যে, কুরআন মাজিদ পরিষ্কার ভাষায় এটা ঘোষণা করছে যে, বনি ইসরাইল স্থলভাগের পথ দিয়ে এসে লোহিত সাগরের মোহনা বা তার কিনারা দিয়ে সাগর অতিক্রম করে নি; বরং সাগরের মধ্যভাগের কোনো অংশ দিয়ে অতিক্রম করেছিলো এবং সাইনা প্রান্তরে পৌঁছেছিলো। বলাবাহুল্য, জোয়ার-ভাটা সাগরের দৈর্ঘ্যের অংশে মোহনার দিকে হয়ে থাকে। সাগরের প্রস্থের দিক দিয়ে কখনো এমন হয় না যে, পানি দুই দিকে কুঞ্চিত হয়ে যায় এবং মধ্যভাগে শুষ্ক রাস্তা সৃষ্টি হয়। সুতরাং আল্লহ তাআলার এই মহান মুজেযাকে অবিশ্বাস করে একে দৈনন্দিন বস্তুবাদী কারণ ও উপকরণের আওতায় আনার চেষ্টা করা কুরআনের বর্ণনার সম্পূর্ণ বিপরীত এবং কুরআনকে বিকৃত করারই শামিল।

তা ছাড়া বনি ইসরাইলিদের এই সাগর অতিক্রম করার ঘটনায় তাওরাত লোহিত সাগরের পুব পাশের ও পশ্চিম পাশের যেসব স্থানের নাম উল্লেখ করেছে এবং সাগর অতিক্রম করা সম্পর্কে যেসব বিবরণ দিয়েছে, তা থেকেও এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বনি ইসরাইলের এই সাগর-অতিক্রম

না থাকতো, তারপরও আমাদের জন্য আল্লাহ তাআলার ওহির মীমাংসাই একটি বাকশীল মীমাংসা। আর মুমিনগণের ঈমান বাতিল ব্যাখ্যাসমূহ থেকে ভিন্ন মূলতত্ত্বের সঙ্গেই দৃঢ়ভাবে সম্পর্কযুক্ত রয়েছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ও চূড়ান্ত আকিদা এই যে, মুসা আ.-এর নবুওতের সত্যতা প্রমাণের জন্য একটি মহান মুজেযা ছিলো। এই মুজেযা এক নিমিষের মধ্যে যাবতীয় বস্তুবাদী হুমকি-ধমকি ও উপকরণের অহমিকাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে এবং উৎপীড়িত সম্প্রদায়কে অত্যাচারী সম্প্রদায়ের কবল থেকে মুক্তি দিয়েছে।

কুরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ () ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ () إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ () وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (سورة الشعراء)

'এবং আমি উদ্ধার করলাম মুসা ও তার সঙ্গী সবাইকে, তারপর নিমজ্জিত করলাম অপর দলটিকে (মুসা আ.-এর শত্রুদেরকে)। এতে অবশ্যই (আল্লাহ তাআলার) নিদর্শন (মুজেযা) রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুমিন নয়। তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।' [সূরা শুআরা : আয়াত ৬৫-৬৮]

ঘটনার এসব বিস্তারিত আলোচনার পর গ্রন্থিত মানচিত্রটিকে সামনে রাখলে বর্ণিত তথ্যসমূহ সুন্দরভাবে স্পষ্ট হতে পারে। আর মুজেযা অস্বীকারকারীগণ এই ঘটনার মূল সত্যের পর পর্দা ফেলে তাকে আচ্ছাদিত করার জন্য যে-বাতিল ব্যাখ্যাসমূহ প্রদান করেছেন তার স্বরূপ উত্তমরূপেই উদ্‌ঘাটিত হয়ে যাচ্ছে।

ফেরআউন, ফেরআউনের সম্প্রদায় এবং কেয়ামতের আযাব

হযরত মুসা আ. ও ফেরআউনের মধ্যকার এই ঘটনা কোনো মামুলি বা সাধারণ ঘটনা নয়; বরং তা সত্য-মিথ্যার লড়াইগুলোর মধ্যে একটি মহান লড়াই। একদিকে অহঙ্কার ও গর্ব, উৎপীড়ন ও অত্যাচার, প্রতাপ ও অহমিকার লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হওয়া আর অপর দিকে নিপীড়নগ্রস্ততা, আল্লাহর ইবাদত এবং ধৈর্য ও দৃঢ় সংকল্পের জয় ও সফলতার বিচিত্র চিত্র। এ-কারণে আল্লাহ তাআলা ফেরআউন ও ফেরআউনের সম্প্রদায়কে পার্থিবভাবে ধ্বংসের পর উপদেশ ও জ্ঞান লাভের জন্য এ-

কথার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করলেন যে, এই জাতীয় লোকদের জন্য পরকালের অনন্ত জীবনে কেমন মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে এবং আল্লাহর লানতের কেমন শিক্ষামূলক উপকরণ প্রস্তুত রয়েছে। যাতে সুস্থবিবেক, সচ্চরিত্র ও পুণ্যবান মানুষেরা তা অনুধাবন করেন এবং অসৎ কাজ থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখেন এবং অন্য লোকদেরকেও পাপ থেকে রক্ষিত থাকার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেন।

এই প্রসঙ্গে কুরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ () إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ () يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ () وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ (سورة هود)

'আমি তো মুসাকে আমার নিদর্শনাবলি ও স্পষ্ট প্রমাণসহ পাঠিয়েছিলাম, ফেরআউন ও তার সম্প্রদায়ের কাছে। কিন্তু তারা ফেরআউনের কার্যকলাপের অনুসরণ করতো এবং ফেরআউনের কার্যকলাপ ভালো ছিলো না। সে কেয়ামতের দিনে তার সম্প্রদায়ের অগ্রভাগে থাকবে (যেভাবে দুনিয়াতে পথভ্রষ্টতায় আগে আগে ছিলো) এবং সে তাদেরকে নিয়ে আগুনে প্রবেশ করবে। (দেখো) যেখানে তাদের প্রবেশ করানো হবে তা কত নিকৃষ্ট স্থান! এই দুনিয়ায় তাদেরকে করা হয়েছিলো অভিশাপগ্রস্ত (ফলে তাদের আলোচনা কখনো পছন্দনীয়রূপে হবে না) এবং অভিশাপগ্রস্ত হবে তারা কেয়ামতের দিনেও (কেননা, তারা তখন চিরকালীন শাস্তি ভোগ করার উপযোগী হবে)। কত নিকৃষ্ট সে পুরস্কার যা তাদেরকে দেয়া হবে।' [সুরা হুদ : আয়াত ৯৬-৯৯]

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ () وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ (سورة القصص)

'তাদেরকে আমি নেতা (অগ্রনায়ক/অগ্রপথিক) করেছিলাম; তারা লোকদেরকে জাহান্নামের দিকে আহ্বান করতো; কিয়ামতের দিন তাদেরকে সাহায্য করা হবে না। এই পৃথিবীতে আমি তাদের পেছনে লাগিয়ে দিয়েছি অভিসম্পাত এবং কেয়ামতের দিন তারা হবে ঘৃণিত (দুর্দশাগ্রস্ত)।' [সুরা কাসাস : আয়াত ৪১-৪২]

فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ () النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (سورة مؤمن)

'এরপর আল্লাহ তাকে[৮৬] তাদের ষড়যন্ত্রের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করলেন এবং কঠিন শাস্তি পরিবেষ্টন করলো ফেরআউনের সম্প্রদায়কে। তাদেরকে উপস্থিত করা হয় আগুনের সামনে (বারযাখে) সকাল সন্ধ্যায়[৮৭] এবং যেদিন কিয়ামত ঘটবে সেদিন বলা হবে "ফেরআউনের সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ করো কঠিন শাস্তিতে।"' [সুরা মুমিন : আয়াত ৪৫-৪৬]

إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ () طَعَامُ الْأَثِيمِ () كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ () كَغَلْيِ الْحَمِيمِ () خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ () ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ () ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ () إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ (سورة الدخان)

'নিশ্চয়ই যাক্কুম বৃক্ষ হবে—পাপীর খাদ্য। গলিত তামার মতো, তাদের ফেটে ফুটতে থাকবে ফুটন্ত পানির মতো। ওকে ধরো এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে,[৮৮] এরপর তার মাথার ওপর ফুটন্ত পানি ঢেলে শাস্তি দাও—এবং (বলা হবে,) "আস্বাদ গ্রহণ কর, তুই তো ছিলি সম্মানিত, অভিজাত! এটা তো তা-ই, যে-বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করতে (ধোঁকায় পতিত ছিলে)।"' [সুরা দুখান : আয়াত ৪৩-৫০]

লোহিত সাগর পার হওয়ার পর বনি ইসরাইলের প্রথম দাবি

তাওরাতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, বনি ইসরাইলিরা যখন নিরাপত্তার সঙ্গে সমুদ্র পার হয়ে গেলো এবং তারা নিজের চোখে ফেরআউন ও তার বাহিনীকে নিমজ্জিত হতে এবং তারপর তাদের লাশগুলোকে তীরের ওপর ভাসতে দেখলো, স্বভাবতই তারা সীমাহীন আনন্দ ও উল্লাস প্রকাশ করলো। আর নারীরা বিশেষ করে দফ[৮৯] বাজিয়ে আনন্দ-সংগীত

---

[৮৬] হযরত মুসা আ.-কে, ভিন্নমতে ফেরআউনের সম্প্রদায়ের যে-লোকটি ঈমান এনেছিলেন তাঁকে।

[৮৭] এই আয়াতে কবরের আযাবের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

[৮৮] জাহান্নামের প্রহরী ফেরেশতাদেরকে এই নির্দেশ দেয়া হবে।

[৮৯] করতাল বা ঢোল জাতীয় বাদ্যযন্ত্র।

গাইলো এবং উচ্ছ্বাস ও উল্লাসের প্রমাণ দিলো। এসবকিছু হয়ে যাওয়ার পর হযরত মুসা আ. কওমকে একত্র করে বললেন, আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, তুমি তোমার কওমকে বলো, "আমিই (আল্লাহই) সেই সত্তা, যিনি তোমাদেরকে এই মহাবিপদ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। সুতরাং, তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো এবং একমাত্র আমারই ইবাদত করো।"

হযরত মুসা আ. তখন তাঁর কওমকে সঙ্গে নিয়ে শুর প্রান্তর থেকে সিন বা সাইনার পথ ধরলেন। সাইনার দেবমন্দিরসমূহে মূর্তিপূজকেরা তখন মূর্তিপূজায় রত ছিলো। বনি ইসরাইল মূর্তিপূজার দৃশ্য দেখে বলতে লাগলো, আমাদের জন্যও এমন উপাস্য (প্রতিমা) গড়ে দাও। তাহলে আমরা এদের মতো সেই উপাস্যের পূজা করবো। হযরত মুসা আ. তাঁর কওমের মুখে এই শিরকি গর্হিত দাবি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি বনি ইসরাইলকে খুব ধমক দিলেন, লজ্জা দিলেন, তিরস্কার করলেন। তাদের বললেন, হে দুর্ভাগার দল, এক আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে মূর্তিপূজার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছো এবং আল্লাহ তাআলার সব নেয়ামতকে ভুলে বসেছো, যা তোমরা নিজেদের চোখে দেখেছো?

জাতিগত হীনতা প্রকাশ

পৃথিবীর ইতিহাসে আমাদের সামনে এমন একটি জাতির চিত্র ফুটে উঠছে যারা প্রায় সাড়ে চারশো বছর মিসরের অত্যাচারী ও উৎপীড়ক বাদশাহ ও মিসরীয় জাতির হাতে দাস ও নির্যাতিতের জীবনযাপন করে এসেছে। তারা এক শক্তিশালী ও প্রবলতর সম্প্রদায়ের কাছে কঠিন থেকে কঠিনতর দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা ও অত্যাচারের শিকার হয়ে এসেছে। এমনি সময়ে সেই জীবন্মৃত জাতির মধ্য থেকে বজ্রধ্বনি ও সূর্যকিরণের মতো এক মনোনীত ব্যক্তি তাদের সামনে আসেন। তাঁর সত্যের আওয়াজ ও পথপ্রদর্শনের ঘোষণায় বাতিল ও অত্যাচারী শাসকবৃন্দ কেঁপে ওঠে এবং কুফরি ও জুলুমের প্রাসাদে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। তিনি পৃথিবীর একটি সংহত ও সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির মোকাবিলায় এই ঘোষণা প্রচার করেন যে, আমি এক আল্লাহ তাআলার প্রেরিত রাসুল এবং দূত। তোমাদেরকে হেদায়েতের অনুসরণ এবং নিপীড়িত গোষ্ঠীর স্বাধীনতার বাণী শোনাতে এসেছি। ফেরআউনি শক্তি তাদের যাবতীয় বস্তুগত কারণ ও উপকরণের

সঙ্গে তাঁর মোকাবিলা করে। কিন্তু প্রত্যেক বারেই তাদের পরাজয়ের মুখ দেখতে হয়। অবশেষে সত্যের সাফল্য ও মিথ্যার ধ্বংসের এমন বিস্ময়কর চিত্র সামনে এসে উপস্থিত হয় যে, বস্তুগত শক্তি লোহিত সাগরে নিমজ্জিত হয়ে যায়। আর দাস ও অত্যাচারিত জাতি এবং পার্থিব উপকরণ ও উপায়সমূহ থেকে বঞ্চিত গোষ্ঠীকে স্বাধীনতার সংগীত গাইতে দেখা যায়।

এরাই হলো বিস্ময়কর ও অভিনব স্বভাব ও প্রকৃতির ছাঁচে ঢালাই করা জাতি 'বনি ইসরাইল'। তারা সত্য-মিথ্যার এসব লড়াইকে প্রত্যক্ষ দর্শন করার পর এবং সত্যের সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মুক্তিলাভের কৃতজ্ঞতা হিসেবে হযরত মুসা আ.-এর সর্বপ্রথম এই দাবি জানাচ্ছে যে, আমাদেরকে এমন উপাস্যই (মূর্তিই) বানিয়ে দাও, যাদেরকে এসব পূজারীরা দেবমন্দিরে বসে পূজা করছে।

সত্য কথা এই যে, বনি ইসরাইল যদিও নবীগণের বংশধর ছিলো এবং তখনও তাদের মধ্যে তার চিহ্ন ও লক্ষণসমূহ একটি সীমা পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিলো, যা তারা তাদের পূর্বপুরুষগণ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয়েছিলো। তারপরও কয়েক শতাব্দীব্যাপী মিসরীয় মূর্তিপূজকদের মধ্যে বসবাস করা এবং তাদের শাসকসুলভ ক্ষমতার অধীন দাস ও গোলাম থাকার কারণে তাদের মধ্যে মূর্তিপূজার আবেগ যথেষ্ট পরিমাণই প্রবেশ করেছিলো। আজ মূর্তিপূজকদের দেখে সেই আবেগই তাদের মধ্যে উথলে উঠলো এবং তারা মুসা আ.-এর কাছে এমন গর্হিত দাবি করে বসলো।

এই ঘটনা কুরআন মাজিদে বর্ণিত হয়েছে এভাবে—

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ () إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ () قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (سورة الأعراف)

'আর আমি বনি ইসরাইলকে সমুদ্র পার করিয়ে দিই; তারপর তারা প্রতিমাপূজায় রত এক জাতির কাছে উপস্থিত হয়। (তা দেখে) তারা (বনি ইসরাইলিরা) বললো, "হে মুসা, তাদের দেবতার (প্রতিমাসমূহের)

মতো আমাদের জন্যও একটি দেবতা গড়ে দাও।" সে বললো, "তোমরা তো এক মূর্খ সম্প্রদায়। এইসব লোক যাতে লিপ্ত রয়েছে তা তো বিধ্বস্ত হবে এবং তারা যা করছে সেটাও অমূলক।" সে আরও বললো, "আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের জন্য কি আমি অন্য ইলাহ খুঁজবো অথচ তিনি তোমাদেরকে বিশ্বজগতের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন?"' [সুরা আ'রাফ : আয়াত ১৩৮-১৪০]

বনি ইসরাইলের অন্যান্য দাবি এবং স্পষ্ট নিদর্শনসমূহের প্রকাশ

বনি ইসরাইল লোহিত সাগর অতিক্রম করে প্রথমে যে-ভূখণ্ডে পা রাখলো তা ছিলো তা ছিলো আরব দেশ। তা লোহিত সাগরের পূর্ব অংশে অবস্থিত। তা বিস্তীর্ণ মরুময় স্থান, পানি ও তৃণলতাহীন প্রান্তর থেকে শুরু হয়েছে। তাওরাতের ভাষায় তা শুর বা সিন প্রান্তর অথবা সাইনা উপত্যকা (তীহ) নামে বিখ্যাত। তুর পর্বত পর্যন্ত তার সীমা বিস্তৃত। এটি গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চল। যত দূর যাওয়া যায় পানি বা তৃণলতার নাম-গন্ধও পর্যন্ত নেই। এই অবস্থা দেখে বনি ইসরাইলিরা ঘাবড়ে গেলো এবং হযরত মুসা আ.-এর কাছে ফরিয়াদ করতে লাগলো, আমরা পানি কোথা থেকে পান করবো? আমরা তো পিপাসায় কাতর হয়ে ছটফট করে মারা যাবো। এখানে তো পান করার জন্য একফোঁটা পানিও নেই। তখন মুসা আ. আল্লাহ তাআলার দরবারে আরজি জানালেন। আল্লাহ তাআলা ওহির মাধ্যমে তাঁকে নির্দেশ দিলেন, তুমি তোমার লাঠি দিয়ে মাটিতে আঘাত করো। হযরত মুসা আ. আল্লাহর নির্দেশ পালন করামাত্র সঙ্গে সঙ্গে বারোটি ঝরনা উৎসারিত হলো এবং বনি ইসরাইলের বারোটি গোত্রের জন্য ভিন্ন ভিন্নভাবে বারোটি প্রস্রবণ প্রবাহিত হলো। পনির দিক থেকে বনি ইসরাইল নিশ্চিত হয়ে গেলো। তারপর তারা বলতে লাগলো, পানির ব্যবস্থা তো হয়েই গেলো; কিন্তু জীবন ধারণের জন্য এটাই তো যথেষ্ট নয়। আমাদের ক্ষুধা পেয়েছে, কোথা থেকে খাবো এখন? এখানে তো কোনো উপায়ই দেখা যাচ্ছে না। হযরত মুসা আ. পুনরায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে আরজি পেশ করলেন। আল্লাহ তাআলা বললেন, হে মুসা, তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করা হলো, অস্থির হয়ো না। আমি অদৃশ্য জগৎ থেকে সবকিছুর ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

এরপর ব্যবস্থা এই হলো যে, রাত শেষ হওয়ার ভোরবেলা বনি ইসরাইলিরা দেখতে পেলো, মাটিতে ও গাছের পাতায় পাতায় আকাশ থেকে শিশিরের আকারে সাদা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বরফের টুকরোর মতো কোনো বস্তু বর্ষিত হয়ে পড়ে আছে। তারা স্বাদ গ্রহণ করে দেখলো তা অত্যন্ত মিষ্ট হালুয়ার মতো। এটা ছিলো মান্না। দিনের বেলায় প্রবল বায়ু প্রবাহিত হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই দলে দলে বটের পাখি এসে মাটির ওপর নামলো এবং চারদিকে ছড়িয়ে গেলো। বনি ইসরাইলিরা অতি সহজে হাত দিয়ে পাখিদের ধরলো এবং ভেজে ভেজে খেতে লাগলো। এটা ছিলো সালওয়া। এইভাবে কোনো ধরনের কষ্ট ও পরিশ্রম ছাড়াই প্রতিদিন তাদের জন্য এই দুই প্রকারের নেয়ামত জুটে গেলো। কিন্তু আল্লাহ তাআলা হযরত মুসা আ.-এর মারফতে বনি ইসরাইলকে সতর্ক করে দিলেন যে, তারা যেনো মান্না ও সালওয়াকে নিজেদের প্রয়োজনীয় পরিমাণ ব্যবহার করে এবং পরের দিনের জন্য যেনো সংগ্রহ করে না রাখে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এই নেয়ামত প্রতিদিনই সরবরাহ করতে থাকবেন।[৯০]

প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পানীয় বস্তু সংগ্রহ করা থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে এখন বনি ইসরাইল তৃতীয় দাবি জানালো। তারা এবার দাবি করলো, গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপে এবং ছায়াধারী বৃক্ষ ও ঘরবাড়ির শান্তি ও বিশ্রাম গ্রহণের অভাবে আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি। এমন না হয় যে, সূর্যের এই প্রখর উত্তাপ ও তীব্র কিরণ আমাদের জীবনেরই অবসান ঘটিয়ে দেয়। হযরত মুসা আ. তাদেরকে সান্ত্বনা দিলেন এবং আল্লাহর দরবারে আরজি পেশ করলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ, আপনি যখন এদের ওপর বড় বড় নেয়ামত, অনুগ্রহ ও দানের বারি বর্ষণ করলেন, তখন এই কঠিন কষ্ট থেকেও তাদের মুক্তি দিন। হযরত মুসা আ.-এর পার্থনা মঞ্জুর করা হলো। আকাশে সারি সারি মেঘমালা এসে বনি ইসরাইলের মাথার ওপর ছায়া দিয়ে দাঁড়ালো। তারা যখন যে-দিকেই যেতো, মেঘের এই শামিয়ানা তাদের মাথার ওপর সবসময় ছায়া দিয়ে থাকতো।

আল্লামা ইসমাইল আস-সুদ্দির এব বর্ণনায় উপরিউক্ত আল্লাহ তাআলার তিনটি নিদর্শনের আলোচনা একই স্থানে এইভাবে করা হয়েছে যে,

---

[৯০] তাফসিরুল কুরআনির আযিম, ইমাদুদ্দিন বিন কাসির রহ., প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৫-৯৬।

খন হযরত মুসা আ. বনি ইসরাইলকে নিয়ে তীহ ময়দানে পৌঁছলেন, ।ন বনি ইসরাইলিরা বলতে লাগলো, অনন্ত-অসীম এই প্রান্তরে কি মাদের হাশর হবে? খাবো কোথা থেকে, পান করবো কোথা থেকে ং ছায়াই বা পাবো কোথা থেকে? তখন আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য ান্না ও সালওয়া নাযিল করলেন এবং পানি পান করার জন্য বারোটি ানা উৎসারিত করলেন। আর ছায়ার জন্য মেঘমালা এসে মাথার ওপর য়া প্রদান করতে লাগলো।

বিষয়গুলো কুরআন মাজিদে বর্ণিত হয়েছে এভাবে—

وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ ا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (سورة البقرة)

ারণ (সেই ঘটনার কথা) করো, যখন মুসা তার সম্প্রদায়ের জন্য পানি র্থনা করলো, আমি বললাম, "তুমি লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করো। মি দেখবে যে, পানি তোমার সামনে উপস্থিত। মুসা আ. আল্লাহর দেশ পালন করলেন।) ফলে তা থেকে বারোটি প্রস্রবণ প্রবাহিত ।। প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পান-স্থান চিনে নিলো। (তখন মাদেরকে বলা হয়েছিলো, এই পানি ও তৃণলতাহীন প্রান্তরে মাদের জন্য জীবন-যাপনের সমস্ত বস্তুরই ব্যবস্থা হয়ে গেছে।) লাম, "আল্লাহ-প্রদত্ত জীবিকা থেকে তোমরা পানাহার করো এবং তিকারীরূপে পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে বেড়িও না।"' (অর্থাৎ, নযাপনের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জন্য ঝগড়া-কলহ করো না বা দিকে ৮ লুটতরাজ করে বেড়িয়ো না।) [সুরা বাকারা : আয়াত ৬০]

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (سورة البقرة)

(যখন তোমরা সাইনা প্রান্তরের পানি ও তৃণলতাহীন ভূমিতে সূর্যের উত্তাপে এবং খাদ্যের অভাবে ধ্বংসোম্মুখ হয়ে পড়েছিলে, তখন) মেঘ দ্বারা তোমাদের ওপর ছায়া বিস্তার করলাম এবং তোমাদের (খাদ্যরূপে) মান্না ও সালওয়া প্রেরণ করলাম। বলেছিলাম, মাদেরকে ভালো যা দান করেছি তা থেকে আহার করো।" (গভীর

চিন্তা করে দেখো) তারা আমার প্রতি কোনো জুলুম করে নি; বরং তারা তাদের প্রতিই জুলুম করেছে। [সুরা বাকারা : আয়াত ৫৭]

وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ () وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (سورة الأعراف)

'মুসার সম্প্রদায়ের মধ্যে (অবশ্যই) এমন দল রয়েছে যারা অন্যকে ন্যায়পথে পথ দেখায় এবং ন্যায়ভাবেই বিচার করে। তাদেরকে আমি বারোটি গোত্রে বিভক্ত করেছি। মুসার সম্প্রদায় যখন তার কাছে পানি প্রার্থনা করলো, তখন তার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, "তোমার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করো"; ফলে তা থেকে বারোটি প্রস্রবণ উৎসারিত হলো। প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পানস্থান চিনে নিলো। এবং মেঘ দ্বারা তাদের ওপর ছায়া বিস্তার করেছিলাম, তাদের কাছে (খাবারের জন্য) মান্না ও সালওয়া পাঠিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম, "ভালো যা তোমাদেরকে দিয়েছি তা থেকে আহার করো।" (আর তোমরা ঝগড়া-কলহে লিপ্ত হয়ো না।) তারা (নাফরমানি করে) আমার প্রতি কোনো জুলুম করে নি; কিন্তু তারা নিজেদের প্রতিই জুলুম করছিলো। [সুরা আ'রাফ : আয়াত ১৫৯-১৬০]

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى () كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى () وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى (سورة طه)

"হে বনি ইসরাইল, আমি তো তোমাদেরকে শত্রু থেকে উদ্ধার করেছিলাম, আমি তোমাদেরকে (বরকত প্রাপ্তি ও সফলকাম হওয়ার এবং তাওরাত প্রদানের) প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তুর পাহাড়ের দক্ষিণ পাশে এবং (সাইনা প্রান্তরে) তোমাদের কাছে মান্না ও সালওয়া প্রেরণ করেছিলাম। তোমাদেরকে যা দান করেছি তা থেকে ভালো বস্তু আহার করো এবং এ-বিষয়ে সীমালঙ্ঘন করো না, (এবং এ-ব্যাপারে সতর্ক

থাকো যে, নাফরমানি) করলে তোমাদের ওপর আমার ক্রোধ অবধারিত এবং যার ওপর আমার ক্রোধ অবধারিত সে তো ধ্বংস হয়ে যায়। এবং আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল তার প্রতি, যে তওবা করে, ঈমান আনে, সৎকর্ম করে ও সৎপথে অবিচলিত থাকে।' [সুরা তোয়া-হা : ৮০-৮২]

আবদুল ওয়াহ্হাব নাজ্জার মিসরি তাঁর 'কাসাসুল আম্বিয়া' গ্রন্থে লিখেছেন, "বনি ইসরাইলের ঘটনাবলির মধ্যে পানির যে-ঝরনাগুলোর আলোচনা করা হয়েছে, লোহিত সাগরের পুব দিকে মরুপ্রান্তরে উৎসারিত হয়েছিলো। সেগুলো সুয়েজ থেকে বেশি দূরে নয় এবং আজো সেগুলো 'মুসার ঝরনা' নামে বিখ্যাত। ঝরনাগুলো বর্তমানে অনেকটাই শুকিয়ে গেছে এবং কোনো কোনোটার চিহ্নও বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আবার কোনো কোনো সেসব ঝরনার ওপর খেজুরের বাগান দেখা যাচ্ছে।"

কুরআন মাজিদে বর্ণিত ঘটনাবলি থেকে মনে হয়, লাঠি দিয়ে আঘাত করে পানি প্রাপ্তির ঘটনা শুধু একবারই ঘটে নি; বরং তীহ ময়দানে বিভিন্ন জায়গায় কয়েকবার ঘটেছিলো।

যাইহোক। হযরত মুসা আ.-এর বরকতে বনি ইসরাইলিদের ওপর আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহের বারিবর্ষণ অবিরাম অব্যাহত ছিলো। আর কয়েক শতাব্দীর দাসত্বের ফলে তাদের মানসিক নীচতা ও চারিত্রিক দুর্বলতা এবং সাহসিকতা ও বীরত্বের বিলুপ্তি তাদের ওপর এক স্বতন্ত্র নৈরাশ্য ও হতাশা বিস্তার করেছিলো। আল্লাহ তাআলার এসব নিদর্শন একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত তাদের সাহসকে দৃঢ় ও তাদের হৃদয়কে শক্তিশালী করে দিয়েছিলো। কিন্তু বিচিত্র স্বভাবের জাতির ওপর তারও যথেষ্ট ক্রিয়া হলো না এবং তারা তাদের বিচিত্র স্বভাবের এক নতুন পরিচয় উপস্থাপন করলো। একদিন তারা সবাই একত্র হয়ে বললো, হে মুসা, আমরা প্রতিদিন একই ধরনের খাদ্য খেতে খেতে এখন বিরক্ত হয়ে পড়েছি। আমাদের এই মান্না ও সালওয়ার প্রয়োজন নেই। তুমি তোমার রবের কাছে দোয়া করো, যেনো তিনি ভূমি থেকে আমাদের জন্য শাক-সবজি, ক্ষীরা, কাঁকুড়, গম, রসুন, মসুর ও পেঁয়াজ ইত্যাদি দ্রব্য উৎপন্ন করে দেন, যাতে আমরা পেট ভরে খেতে পারি।

হযরত মুসা আ. তাদের এই ধরনের আচরণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তাদের বললেন, তোমরাও কেমন আশ্চর্য ধরনের নির্বোধ! একটি উত্তম

খাদ্য ত্যাগ করে সাধারণ ও নিম্নমানের বস্তুর প্রার্থী হচ্ছো? এভাবে তোমরা আল্লাহ তাআলার নেয়ামতের নিমকহারামি করছো, তার অনুগ্রহের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছো, তাঁর নেয়ামতকে অস্বীকার করছো? আচ্ছা, যদি বাস্তবিকই তোমরা এসব নেয়ামত অপছন্দ করে থাকো, আর যেসব বস্তুর নাম তোমরা উল্লেখ করলে সেগুলোর জন্যই যদি তোমরা বাড়াবাড়ি করো, তবে তা মুজেযা বা নিদর্শনের মতো আল্লাহ তাআলার দরবার থেকে তলব করার প্রয়োজন নেই। যাও, তোমরা কোনো এক জনপদের দিকে চলে যাও। ওখানে সব জায়গাতেই তোমরা এসব বস্তু প্রচুর পরিমাণে পাবে।

ঘটনার এই অংশটুকু কুরআন মাজিদে বর্ণিত হয়েছে এভাবে—

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (سورة البقرة)

'যখন তোমরা বলেছিলে, "হে মুসা, আমরা একই রকম খাদ্যে কখনো ধৈর্য ধারণ করবো না। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা করো, তিনি যেনো ভূমিজাত দ্রব্য—শাক-সবজি, কাঁকুড়, গম (বা রসুন) মসুর ও পেঁয়াজ আমাদের জন্য উৎপন্ন করেন।" মুসা বললো, "তোমরা কি উৎকৃষ্টতর বস্তুকে নিকৃষ্টতর বস্তুর সঙ্গে বদল করতে চাও? তবে কোনো নগরে অবতরণ করো। তোমরা যা চাও তা ওখানে আছে।" তারা লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্যগ্রস্ত হলো এবং তারা আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হলো। তা এইজন্য যে, তারা আল্লাহর আয়াতকে[৯১] অস্বীকার করতো এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করতো। অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘন করার জন্যই তাদের এই পরিণতি হয়েছিলো।' [সুরা বাকারা : আয়াত ৬১]

[৯১] আল্লাহর আহকাম অথবা মুসা আ.-এর মুজেযাগুলোকে অস্বীকার করতো।

তুর পাহাড়ের ওপর ইতিকাফ

হযরত মুসা আ.-এর সঙ্গে আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুতি ছিলো যে, বনি ইসরাইলিরা যখন মিসরীয় শাসনের দাসত্ব থেকে স্বাধীন হয়ে যাবে তখন তাঁকে শরিয়ত প্রদান করা হবে। এখন সেই সময় এসে পড়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছে। সুতরাং হযরত মুসা আ. আল্লাহ তাআলার ওহির ইঙ্গিতে তুর পাহাড়ে গিয়ে উপনীত হলেন এবং ওখানে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করার জন্য ইতিকাফ করলেন। এই ইতিকাফের মেয়াদ ছিলো তিরিশ দিন বা একমাস। পরে তিনি আরো দশ দিন বাড়িয়ে চল্লিশ দিন পূর্ণ করেন।

তাফসিরে রুহুল মাআনিতে এ-বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে—

وأخرج الديلمي عن ابن عباس يرفعه فَلَمَّا أَتَى رَبَّهُ أَرَادَ أَنْ يُكَلِّمَهُ فِي ثَلاثِينَ وَقَدْ صَامَهُنَّ : لَيْلَهُنَّ وَنَهَارَهُنَّ ، كَرِهَ أَنْ يُكَلِّمَ رَبَّهُ وَيَخْرُجَ مِنْ فَمِهِ رِيحَ فَمِ الصَّائِمِ ، فَتَنَاوَلَ مُوسَى شَيْئًا مِنْ نَبَاتِ الأَرْضِ فَمَضَغَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ حِينَ أَتَاهُ : أَفَطَرْتَ ؟ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالَّذِي كَانَ ، قَالَ : رَبِّ كَرِهْتُ أَنْ أُكَلِّمَكَ إِلا وَفَمِي طَيِّبُ الرِّيحِ ، قَالَ : أَوَمَا عَلِمْتَ يَا مُوسَى أَنَّ رِيحَ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدِي مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ؟ ارْجِعْ حَتَّى تَصُومَ عَشْرًا ، ثُمَّ ائْتِنِي ، فَفَعَلَ مُوسَى مَا أُمِرَ بِهِ

“দাইলামি হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং এটি মারফু বলেছেন : হযরত মুসা আ. যখন তাঁর প্রতিপালকের কাছে এলেন, তিরিশ দিনব্যাপী তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন। তিনি এই তিরিশ দিন অনবরত রোযা রেখেছেন। ফলে মুসা আ. অনুভব করলেন যে, তাঁর মুখ থেকে রোযাদারের মুখের মুখের দুর্গন্ধের মতো দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। তাই এ-অবস্থায় তিনি রাব্বুল আলামিনের সঙ্গে কথা বলতে অপছন্দ করলেন। মুসা আ. জমিনের গাছ থেকে একটি অংশ নিলেন এবং তা দিয়ে দাঁত মর্দন করলেন। তিনি তাঁর রবের কাছে যাওয়ার পর তাঁর রব তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি রোযা ভেঙে দিয়েছো? যা হয়েছে সে-সম্পর্কে আল্লাহপাক অবহিতই ছিলেন। মুসা আ. বললেন, হে আমার রব, আমার মুখ সুগন্ধময় না করে আপনার সঙ্গে কথা বলতে অপছন্দ করেছি। আল্লাহ বললেন, হে মুসা,

তুমি কি জানো না রোযাদারের মুখের গন্ধ আমার কাছে মেসকের ঘ্রাণের চেয়েও উত্তম? তুমি ফিরে যাও এবং আরো দশ দিন রোযা রাখো। তারপর আমার কাছে এসো। মুসা আ. যে-বিষয়ে আদিষ্ট হলেন, তখন তা-ই করলেন। এভাবে চল্লিশ দিন পূর্ণ হলো।"[৯২]

কিন্তু কুরআন মাজিদে শুধু এতটুকু উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই সময়সীমা প্রথমে তিরিশ দিন ছিলো। এরপর দশ দিন বাড়িয়ে চল্লিশ দিন করা হলো। কিন্তু তার কারণ বর্ণনা করা হয় নি।[৯৩]

ঘটনার এই অংশটুকু কুরআন মাজিদে বর্ণিত হয়েছে এভাবে—

وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً (سورة الأعراف)

'স্মরণ করো, মুসার জন্য আমি তিরিশ রাত নির্ধারিত করি (অর্থাৎ, পূর্ণ একমাস তুর পাহাড়ে ইতিকাফে থেকে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করতে থাকো। তারপর তোমাকে শরিয়ত প্রদান করা হবে। মুসা আ. এই মুদ্দত শেষ করলেন) এবং আরো দশ দ্বারা তা পূর্ণ করি। এইভাবে তার প্রতিপালকের নির্ধারিত সময় চল্লিশ রাতে[৯৪] পূর্ণ হয়।' [সুরা আ'রাফ : আয়াত ১৪২]

হযরত মুসা আ. যখন তুর পাহাড়ের ওপর প্রতিশ্রুত ইতিকাফের মুদ্দত পালন করতে গেলেন তখন তার সহোদর বড়ভাই হারুন আ.-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে গেলেন এ-ব্যাপারে যে, তিনি বনি ইসরাইলকে সত্যপথের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখবেন এবং প্রতিটি ব্যাপারে তাদের দেখাশোনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।

---

[৯২] রুহুল মাআনি ফি তাফসিরিল কুরআনিল আযিম ওয়াস সাবয়িল মাসানি, আবুস সানা শিহাবুদ্দিন মাহমুদ আল-আলুসি, সুরা আ'রাফ, আয়াত ১৪২। কিন্তু হাদিসের বর্ণনাকারীদের নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেছেন তাদের কাছে দাইলামি নির্ভরযোগ্য নন।—গ্রন্থকার।

[৯৩] আত্মিক পরিশুদ্ধির জন্য সুফিয়ানে কেরামের চিল্লা পালন করার নিয়ম খুব সম্ভব এই ঘটনা থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে। অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত, কোনো কাজে আল্লাহ পক্ষ থেকে দৃঢ়তা লাভের জন্য সাধারণত এই চিল্লা পালন করা কল্যাণকর।

[৯৪] হযরত মুসা আ.-কে তাওরাত প্রাপ্তির জন্য প্রথমে তিরিশ দিন, আরও পরে দশ দিন বৃদ্ধি করে মোট চল্লিশ দিন সিয়ামসহ ইতিকাফের মতো একই স্থানে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় থাকতে হয়েছিলো।

]-বিষয়টি কুরআন মাজিদ বর্ণনা করছে এভাবে—

وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ

(سورة الأعراف)

এবং মুসা তার ভাই হারুনকে বললো, "আমার অনুপস্থিতিতে আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করবে, সংশোধন এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করবে না।"' [সুরা আ'রাফ : আয়াত ১৪২]

পবিত্র সত্তার তাজাল্লি

ইতিকাফের মুদ্দত পূর্ণ হয়ে গেলো এবং আল্লাহ তাআলা হযরত মুসা আ.-কে পারস্পরিক কথোপকথনের মর্যাদা দান করলেন। হযরত মুসা আ. চরম আনন্দানুভূতি ও প্রফুল্ল চিত্ততার সঙ্গে আরজ করলেন, "হে আল্লাহপাক, আপনি যখন আমাকে আপনার বাণী শ্রবণের স্বাদ উপভোগ করালেন, তখন আর আপনাকে স্বচক্ষে দর্শনের এবং আপনার দিদার লাভের স্বাদ থেকে কেনো বঞ্চিত থাকবো? এটিও দান করে আমাকে সৌভাগ্যবান করুন।" আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে জবাব এলো, "হে মুসা, তুমি 'যাতে পাক'কে (পবিত্র সত্তাকে) দর্শন করতে সক্ষম হবে না। আচ্ছা, তবে দেখো, এই পাহাড়ের ওপর আমি আমার সত্তার নুরের তাজাল্লি প্রকাশ করবো, যদি তুমি এই তাজ্জালিকে সহ্য করে নিতে পারো, এরপর তাহলে তুমি আবেদন করো (স্বচক্ষে আমার দর্শন লাভের আবেদন করো)।" এরপর তুর পাহাড়ের অংশবিশেষের ওপর আল্লাহ তাআলার নুরের তাজাল্লি প্রকাশিত হলো। এতে পাহাড়ের ওই অংশটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেলো। হযরত মুসা আ. তা দর্শনে অপারগ ও সংজ্ঞাহারা হয়ে পড়লেন।

মুসা আ. যখন পুনরায় সংজ্ঞা ফিরে পেলেন, তিনি মহান আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও স্তুতিবাণী বর্ণনা করতে লাগলেন। তাঁর আবেদন প্রত্যাহার করে নিলেন এবং বললেন, "আমি স্বীকার করছি এবং এ-কথার ওপর ঈমান আনছি যে, আপনার সৌন্দর্যের তাজাল্লি, মারেফাত ও সত্য প্রকাশে কোনো ত্রুটি নেই। ত্রুটি কেবল আমার সত্তার অপারগতার এবং নিরুপায়তার।"

এই ঘটনা কুরআন মাজিদে নিম্নলিখিত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে—

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ(سورة الأعراف)

'মুসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলো এবং তার প্রতিপালক তার সঙ্গে কথা বললেন তখন সে বললো, "হে আমার প্রতিপালক, আমাকে দর্শন দাও, আমি তোমাকে দেখবো।" তিনি বললেন, "তুমি কখনোই আমাকে দেখতে পাবে না।[৯৫] তুমি বরং পাহাড়ের প্রতি লক্ষ করো, তা (আল্লাহ তাআলার জ্যোতি সহ্য করতে পারলে এবং) স্বস্থানে স্থির থাকলে তবে তুমি আমাকে দেখবে।' যখন তার প্রতিপালক পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করলেন তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলো এবং মুসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লো। যখন সে জ্ঞান ফিরে ফেলো তখন বললো, "মহামহিম তুমি, আমি অনুতপ্ত হয়ে তোমাতেই প্রত্যাবর্তন করলাম এবং মুমিনদের মধ্যে আমিই প্রথম।" [সুরা আ'রাফ : আয়াত ১৪৩]

তাওরাত নাযিল হওয়া

এই রহস্য উন্মোচিত হওয়ার পর হযরত মুসা আ.-কে তাওরাত প্রদান করা হলো। আল্লাহ রাব্বুল আলামি মুসা আ.-কে নির্দেশ দিলেন, এই কিতাবের বিধি-বিধানের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থেকো। তোমার সম্প্রদায় বনি ইসরাইলকে বলো, তারা যেনো এই কিতাবের ওপর এমনভাবে আমল করে যাতে, যে-নেক আমল যত অধিক আল্লাহর নৈকট্যলাভের কারণ হয়, তাকে অন্যান্য আমলের ওপর প্রাধান্য দান করে। এই কিতাবে আমি তোমাদের জন্য যাবতীয় ধর্মীয় ও পার্থিব কল্যাণকর বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি। আর হালাল ও হারাম এবং প্রশংসনীয় গুণাবলি ও নিন্দনীয় দোষাবলি—মোটকথা যাবতীয় নির্দেশ ও নিষেধকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছি এবং এটাই আমার শরিয়ত।

---

[৯৫] দুনিয়াতে দেখবে না, পরকালে জান্নাতে প্রবেশের পর সকল জান্নাতবাসী আল্লাহ তাআলার দর্শন লাভ করবে।

এই মর্মে কুরআন মাজিদ বর্ণনা করছে—

قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ () وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ (سورة الأعراف)

'তিনি (আল্লাহ তাআলা) বললেন, "হে মুসা, আমি তোমাকে আমার রিসালাত (রাসুলের মর্যাদা ও দায়িত্ব) ও আমার বাক্যালাপ দ্বারা মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি; সুতরাং আমি যা (তাওরাত কিতাব) দিলাম তা গ্রহণ করো এবং কৃতজ্ঞ হও।" আমি তার (মুসার) জন্য (তাওরাতের) ফলকগুলোতে সর্ববিষয়ে উপদেশ এবং সকল বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছি; সুতরাং সেগুলো শক্তভাবে ধরো এবং তোমার সম্প্রদায় সেগুলোর যা উত্তম[৯৬] তা গ্রহণ করতে নির্দেশ দাও। আমি শিগগিরই সত্যাত্যাগীদের (নাফরমান লোকদের) বাসস্থান তোমাদেরকে দেখাবো।' [সুরা আ'রাফ : আয়াত ১৪৪-১৪৫]

এখানে দুটি বিষয় মনোযোগ প্রদানের যোগ্য : ১. উলামায়ে ইসলাম (ইসলামের মনীষী ও তত্ত্বজ্ঞানীবৃন্দ) বলেন, তুর পাহাড়ের এই ঘটনায় যে-আহকামগুলো নাযিল হয়ে তা তাওরাত। আর উলামায়ে নাসারার (খ্রিস্টান ধর্মজ্ঞানী) বর্তমান সম্প্রদায় বলেন, এই ঘটনার আহকামগুলোর উদ্দেশ্য ওই দশটি আহকাম যা হযরত মুসা আ.-এর ধর্মে 'শরিয়ত বা আহকামে আহ্দ' নামে অভিহিত। অর্থাৎ, আল্লাহ ব্যতীত অন্যকারো ইবাদত করো না; ব্যভিচার করো না; চুরি করো না ইত্যাদি।[৯৭] আর সমসাময়িক কোনো কোনো মুফাস্সিরও আলোচ্য আয়াতটির লক্ষ্যস্থল আহকামে আহ্দকেই সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু দ্বিতীয় অভিমতটি কুরআন মাজিদ ও তাওরাত উভয়ের সাক্ষ্য থেকেই ভুল প্রমাণিত হয় এবং প্রথম

---

[৯৬] তাওরাতে যে-নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা-ই উত্তম এবং যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা-ই মন্দ। প্রদত্ত বিধানাবলির মধ্যে কিছু অতি উচ্চ পর্যায়ের, এগুলোকে পালন করা عزيمة অর্থাৎ অতি উচ্চমানের নিষ্ঠা আর সাধারণ বিধানের অনুসরণ رخصة, অর্থাৎ নিচু স্তরের নিষ্ঠা, যাকে জায়েয বলা যায়।

[৯৭] তাওরাত : নিষ্ক্রমণ পুস্তক, অনুচ্ছেদ ৩৪, আয়াত ২০।

অভিমতই শুদ্ধ ও সঠিক। কেননা, কুরআন মাজিদ সুরা বাকারায় হযরত মুসা আ.-এর ইতিকাফের মুদ্দতের উল্লেখ করে যখন আহকামগুলোর আলোচনা করেছে তখন সেগুলোকে কিতাব ও ফুরকান বলেছে। আর কুরআন মাজিদে এই দুটি বিশেষণ তাওরাতের জন্য বলা হয়েছে; 'আহকামে আহদ'-এর জন্য বলা হয় নি। যেমন : কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে—

وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ () ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ () وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (سورة البقرة)

'আর স্মরণ করো (সেই সময়ের কথা) যখন মুসার জন্য চল্লিশ রাত[৯৮] নির্ধারিত করেছিলাম, তাঁর প্রস্থানের পর তোমরা গো-বৎসকে[৯৯] উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিলে; আর তোমরা তো জালিম। এরপরও আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছি যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো। এবং স্মরণ করো (সেই সময়ের কথা) যখন আমি মুসাকে কিতাব ও ফুরকান দান করেছিলাম যাতে তোমরা হেদায়েতপ্রাপ্ত হও।' [সুরা বাকারা : ৫১-৫৩]

কুরআন মাজিদের অন্য জায়গায় আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (سورة القصص)

'আমি তো পূর্ববর্তী বহু মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করার পর মুসাকে দিয়েছিলাম কিতাব, মানবজাতির জন্য জ্ঞানবর্তিকা, পথনির্দেশ ও অনুগ্রহস্বরূপ, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।' [সুরা কাসাস : আয়াত ৪৩]

আর তাওরাত (বর্তমান যুগের বাইবেল)-এর 'সিফরে খুরুজ' (নিষ্ক্রমণ-পুস্তক); 'সিফরে ইসতিসনা' (ব্যতিক্রম-পুস্তক) ও 'কিতাবে ইয়াসু' (ইয়াসু অধ্যায়)-এ উল্লেখিত হযরত মুসা আ.-এর ইতিকাফের মুদ্দতের পর যদিও 'আহকামে আহ্দ' বা 'শরিয়ত' শব্দ পাওয়া যায়, কিন্তু

---

[৯৮] হযরত মুসা আ. আল্লাহর নির্দেশে তুর পাহাড়ে চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত ইবাদতে মশগুল থাকার পর প্রতিশ্রুত তাওরাত কিতাব লাভ করেছিলেন।

[৯৯] সামিরি নামক এক ব্যক্তি গো-বৎসের একটি প্রতিকৃতি নির্মাণ করেছিলো। তার প্ররোচনায় কিছু সংখ্যক বনি ইসরাইল এই গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিলো।

মাওলানা রহমতুল্লাহ কিরানবি রহ. তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'ইযহারুল হক'-এ আরবি, ফার্সি, উর্দু এবং প্রাচীনকালের তরজমার উদ্ধৃতি দিয়ে এ-কথা প্রমাণ করেছেন যে, তাওরাতের ওইসব নুসখা বা প্রতিলিপিতে 'আহকামে আহ্দ' ও 'শরিয়ত' শব্দ দুটির স্থরে 'তাওরাত' লিখিত পাওয়া যায়। যেমন : মাওলানা আবদুল হক রহ.-ও তাঁর তাফসিরগ্রন্থ 'তাফসিরে হক্কানি'তে ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দ ও ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে উর্দু ও ফার্সি ভাষায় মুদ্রিত বাইবেল থেকে নিম্নবর্ণিত তথ্যপ্রমাণ উদ্ধৃত করেছেন :

১। "আর ওই ফলকগুলোর ওপর এই তাওরাতের সমস্ত কথা স্পষ্ট অক্ষরে লিখো।"—[ইসতিসনা-পুস্তক, অনুচ্ছেদ ২৭, আয়াত ২৮] এখানে তাওরাত শব্দটির উল্লেখ আছে।

২। "বনি ইসরাইল হযরত মুসা আ.-এর নির্দেশ অনুসারে জবাই করার একটি স্থান নির্মাণ করলো এবং তার পাথরগুলোর ওপর তাওরাত লিখে দিলো।"—[ইয়াসু অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৮, আয়াত ১৫, ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত] এখানেও তাওরাত শব্দটির উল্লেখ আছে।

এসব তথ্যপ্রমাণ থেকে এ-কথা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, হযরত মুসা আ.-কে তুর পাহাড়ে ইতিকাফের মুদ্দতের পর যে-কাষ্ঠফলক প্রদান করা হয়েছিলো, তা তাওরাতেরই ছিলো, 'আহকামে আহ্দ'-এর নয়। আর তাওরাতের ইংরেজি অনুবাদে Law এবং আরবি ও উর্দু অনুবাদের নুসখাগুলোতে 'শরিয়ত' শব্দকে মেনে নিলেও এই শব্দগুলোও তাদের অর্থের ব্যাপকতায় তাওরাতকে বুঝাতে পারে। বস্তুত, তাওরাত, শরিয়ত, বিধান—এই শব্দ তিনটির লক্ষ্যস্থল একই বস্তু। আর প্রাচীন খ্রিস্টান দুনিয়ায় এই অর্থই গ্রহণ করা হতো; 'আহকামে আহ্দ' তারই একটি অংশ এবং এটিকে স্বতন্ত্র সাব্যস্ত বহু পরবর্তীকালের উদ্ভাবন।

সুরা আ'রাফের উপরিউক্ত আয়াতে এই বাক্যটি রয়েছে—

سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ

'অচিরেই আমি তোমাদেরকে সত্যত্যাগীদের (নাফরমান লোকদের) আবাসস্থল দেখাবো।' [সুরা আ'রাফ : আয়াত ১৪৫]

এখানে বিবেচ্য বিষয় এই যে, এই আয়াতে আবাসস্থল দ্বারা কোন্ স্থান উদ্দেশ্য। বর্ণনাকারীরা ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে বিভিন্ন জবাব দিয়েছেন : এই আবাসস্থল দ্বারা উদ্দেশ্য 'আদ' ও সামুদ' সম্প্রদায় দুটির

(বসতভূমির) ধ্বংসাবশেষ; ২. মিসর ভূমি, অর্থাৎ, বনি ইসরাইল পুনরায় তাতে প্রবেশ করবে; ৩. কাতাদা রহ. বলেন, এর দ্বারা শামদেশের পবিত্র ভূমি উদ্দেশ্য। শামদেশে তখন আমালিকা সম্প্রদায়ের দুর্দান্ত রাজাদের শাসন ছিলো। আর এখানেই বনি ইসরাইলের প্রবেশ করার কথা ছিলো।[১০০]

আবদুল ওয়াহ্হাব নাজ্জার মিসরি কাতাদা রহ.-এর বর্ণিত মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। আর আমার (গ্রন্থকার) মতে এটিই বিশুদ্ধ মত। তবে এই কথা হলো এই যে, হযরত মুসা আ. এবং বনি ইসরাইলের বৃদ্ধরা শামদেশের আবাসভূমিগুলোতে প্রবেশ করতে পারেন নি। কেননা, এই পবিত্র ভূমিতে প্রবেশের পূর্বেই হযরত মুসা আ.-এর ইন্তেকাল হয়ে গিয়েছিলো। সামনে বর্ণিত বিস্তারিত বিবরণ অনুসারে, একইভাবে বনি ইসরাইলের বৃদ্ধদের ওপর পবিত্র শামদেশের ভূমিতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছিলো। সুতরাং, আয়াতটির অর্থ হয়তো এই দাঁড়াবে যে, বনি ইসরাইলের যুবকদের—যারা সংখ্যায় অন্য সবার চেয়ে বেশি ছিলো—প্রবেশকেই সকলের প্রবেশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ-জাতীয় অর্থগ্রহণ আরবদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত রয়েছে। অথবা, আয়াতটির উদ্দেশ্য এই যে, হযরত মুসা আ. ইউশা বিন নুন ও কালিব বিন ইউকান্নাহ এবং বনি ইসরাইলের অন্য কতিপয় বীরবাহাদুরকে পবিত্র ভূমিতে পাঠিয়েছিলেন। তা এইজন্য যে, তাঁরা ওখানে গিয়ে ওখানকার বিস্তারিত অবস্থা জেনে আসবেন যে, তাঁরা কীভাবে শত্রুকে পরাজিত করে পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করতে পারেন। তাঁরা ফিরে এসে সব অবস্থা হযরত মুসা আ. ও বনি ইসরাইলের কাছে বর্ণনা করলেন। এই কয়েকজনের পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করা, পর্ববেক্ষণ করা এবং তারপর সবাইকে ওখানকার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা—আয়াতে যেনো এরই দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

কাতাদাহ রহ.-এর বক্তব্যের মোকাবিলায় দ্বিতীয় উক্তিটি এ-কারণে দুর্বল যে, এই ঘটনার পর বনি ইসরাইলের গোটা জাতি কখনো একত্র হয়ে মিসরে প্রবেশ করে নি। আর প্রথম উক্তিটি এ-কারণে গ্রহণযোগ্য নয় যে,

---

[১০০] রুহুল মাআনি ফি তাফসিরিল কুরআনিল আযিম ওয়াস সাবয়িল মাসানি, আবুস সানা শিহাবুদ্দিন মাহমুদ আল-আলুসি, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৩, সুরা আ'রাফ।

সামুদ সম্প্রদায়ের ধ্বংসাবশেষগুলো অবশ্যই সাইনা প্রান্তরের নিকটবর্তীই ছিলো; কিন্তু আদ সম্প্রদায়ের ধ্বংসাবশেষগুলো আরব দেশের পশ্চিমাংশে সাইনা প্রান্তর থেকে কয়েক মাসের দূরত্বে অবস্থিত ছিলো। সুতরাং, এ থেকে এমন কোনো কারণ আমাদের বোধগম্য হয় না, যার ফলে বনি ইসরাইলকে কেবল বিলুপ্তপ্রায় চিহ্নসমূহ এবং ধ্বংসাবশেষগুলো দেখানোর জন্য পাঠানো হয়েছিলো। আর এর জন্য আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুতি এত গুরুত্বের সঙ্গে বর্ণিত হতো না। এখানে আরেকটি অভিমত এটিও আছে যে, 'সত্যত্যাগী লোকদের আবাসস্থল' বলে 'জাহান্নাম' উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। আর কথাটি কাফেরদেরকে ভয় প্রদর্শনের জন্য বলা হয়েছে।

যাইহোক। হযরত মুসা আ.-কে তাওরাত প্রদান করা হলো। সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলে দেয়া হলো, আমার বিধান এই—হেদায়েত আসার পর এবং তার সত্যতার পক্ষে উজ্জ্বল প্রমাণসমূহ উপস্থিত হওয়ার পরও যখন কোনো সম্প্রদায় তাদের বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না, বিপথগামিতা এবং পিতৃপুরুষদের অসৎ প্রথা ও কুসংস্কারের ওপরই প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং তার ওপর বাড়াবাড়িই করতে থাকে, তবে আমিও তাদেরকে পথভ্রষ্টতা ও বিপথগামিতার ওপরই ছেড়ে রাখি এবং আমার সত্যের পয়গামে তাদের জন্য কোনো অংশই অবশিষ্ট থাকে না। কেননা, তারা নিজেদের অবাধ্যতামূলক নাফরমানির কারণে সত্য গ্রহণের যোগ্যতাকেই বিনষ্ট করে দেয়।

কুরআন মাজিদে এই মর্মার্থকে বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে—

سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ () وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (سورة الأعراف)

'পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে দম্ভ করে বেড়ায় তাদের দৃষ্টি আমার নিদর্শন থেকে (অন্যদিকে) ফিরিয়ে দেবো; তারা আমার প্রত্যেকটি নিদর্শন দেখলেও বিশ্বাস করবে না, তারা সৎপথ দেখলেও তাকে পথ বলে গ্রহণ করবে না; কিন্তু তারা ভ্রান্ত পথ দেখলে তাকে তারা পথ হিসেবে গ্রহণ করবে। তা এইজন্য যে, তারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করেছে এবং

সে-সম্পর্কে তারা ছিলো গাফিল। যারা আমার নিদর্শন ও আখেরাতের সাক্ষাৎকে অস্বীকার করে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়। তারা যা করে সে-অনুযায়ীই তাদেরকে প্রতিফল দেয়া হবে।' [সুরা আ'রাফ : আয়াত ১৪৬-১৪৭]

গো-বৎস পূজার ঘটনা

ইতোমধ্যে এর একটি বিচিত্র ও অভিনব ঘটনা ঘটলো। এটিকে যেমন বিস্ময়কর ব্যাপার বলা যায়, তেমনি আফসোসেরও বিষয় বলা যায়। এই ঘটনার মাধ্যমে বনি ইসরাইলের নীচ মানসিকতা ও চারিত্রিক হীনতা উন্মোচিত হয়ে আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একদিকে হযরত মুসা আ. তুর বা হাওরাব পাহাড়ের ওপর বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সঙ্গে একান্ত কথোপকথনে মগ্ন এবং বনি ইসরাইলের জন্য আল্লাহ তাআলার বিধান (তাওরাত) অর্জন করার কাজে ব্যস্ত। আর এদিকে নিম্নদেশে সাইনা প্রান্তরে বনি ইসরাইলিরা সামিরির নেতৃত্বে নিজেরাই নিজেদের মাবুদ (গো-বৎস) মনোনীত করে তার চারপাশে আসর বানিয়ে তার পূজা করতে লাগলো।

অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের তাফসির অনুযায়ী ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ এই : হযরত মুসা আ. যখন তাওরাত আনার জন্য তুর পাহাড়ে যেতে প্রস্তুত হলেন, তিনি বনি ইসরাইলকে বললেন, "তুর পাহাড়ে আমারা ইতিকাফের মুদ্দত (সময়সীমা) একমাস। মুদ্দত শেষ হওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে আমি তোমাদের কাছে ফিরে আসবো। হারুন আ. তোমাদের কাছে থাকলেন। তিনি তোমাদের যাবতীয় অবস্থার তত্ত্বধান করবেন। কিন্তু তাঁর তুর পাহাড়ে পৌছার পর ইতিকাফের মুদ্দত চল্লিশ দিন হয়ে গেলো। মুসা আ.-এর ফিরে আসার বিলম্ব দেখে সামিরি নামের এক ব্যক্তি সুযোগ গ্রহণ করলো। সে দেখলো যে, মুসা আ.-এর ফিরতে বিলম্ব হওয়ায় বনি ইসরাইল অস্থির হয়ে পড়েছে। এই অবস্থা দেখে সে বনি ইসরাইলকে বললো, যদি তোমরা তোমাদের ওইসব অলঙ্কার আমার কাছে নিয়ে আসো, যা তোমরা মিসরীয়দের কাছ থেকে ধার করে এনেছিলে এবং মিসর থেকে বের হয়ে আসার সময় তাড়াহুড়ার কারণে ফিরিয়ে দিতে পারো নি, তবে আমি সেগুলো দিয়ে তোমাদের জন্য একটি মঙ্গলজনক কাজ করে দেবো।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে সামিরি যদিও মুসলমান ছিলো, কিন্তু তার অন্তরে কুফরি ও শিরকের অপবিত্রতা পরিপূর্ণভাবেই ছিলো। বনি ইসরাইলিরা তাদের সব অলঙ্কার তার কাছে এনে জমা করলো। সে অলঙ্কারগুলোকে আগুনের ভাটার মধ্যে রেখে গলিয়ে ফেললো এবং ওগুলো দিয়ে গো-বৎসের অবয়ব প্রস্তুত করলো। এরপর তার থলি থেকে একমুষ্টি মাটি বের করে ওই অবয়বটির ভেতর রাখলো। এই পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে বাছুরটির মধ্যে প্রাণের লক্ষণ জেগে উঠলো এবং তা গো-বাছুরের মতো হাম্বা হাম্বা রবে ডাকতে শুরু করলো।

তখন সামিরি বনি ইসরাইলকে বললো, মুসা আ.-এর ভ্রান্তি ও ভুল হয়েছে। তিনি খোদার অন্বেষণে তুর পাহাড়ে গিয়েছেন। তোমাদের মাবুদ তো এখানেই বিদ্যমান।

একটু পূর্বে বিষয়টি খুব ভালোভাবেই বর্ণিত হয়েছে যে, কয়েক শতাব্দীব্যাপী মিসর রাজ্যের গোলামি বনি ইসরাইলের মধ্যে শিরকি আকিদা ও এবং কুসংস্কার ও প্রথার রঙ ছড়িয়ে দিয়েছিলো এবং তারা ওই রঙে যথেষ্ট পরিমাণে রঞ্জিত হয়ে গিয়েছিলো। আর গো-বাছুরের পূজা মিসরের প্রাচীনকালের একটি বিশ্বাস ছিলো । তাদের ধর্মে গো-বাছুরের পূজা ছিলো বেশ গুরুত্ব ও মর্যাদার অধিকারী। এ-কারণেই তাদের এক বড় দেবতা (হাওরাস)-এর মুখ গাভীর আকৃতির ছিলো। তাদের বিশ্বাস ছিলো যে, গাভীর মাথার ওপর ভূগোলকটি স্থাপিত রয়েছে।[১০১]

সামিরি বনি ইসরাইলকে উৎসাহ প্রদান করলো যে, তারা যেনো তার নিজ হাতে নির্মিত গো-বৎসকে তাদের উপাস্য মনে করে এবং সেটার পূজা করে। তারা সামিরির এই কথাকে সহজেই গ্রহণ করে নিলো।

হযরত হারুন আ. বনি ইসরাইলের এই কাণ্ড দেখে তাদের খুব বুঝালেন যে, তোমরা এমন করো না। এটা ভ্রষ্টতার পথ। কিন্তু তারা হযরত হারুন আ.-এর কথা মানতে অস্বীকৃতি জানালো এবং তারা বললো, আমরা যা-কিছু অবলম্বন করেছি, মুসা আ. ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা তা থেকে বিরত হবো না।

---

[১০১] মনে হয়, পৃথিবীর সকল মূর্তিপূজক দলের মধ্যে গাভীর পবিত্রতা ও গো-বৎস পূজার এক বিপুল মর্যাদা রয়েছে। এ-কারণেই হিন্দুস্তান, ইরাক, ইরান, চীন ও জাপানের মূর্তিপূজক সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে সমভাবে এর গুরুত্ব পরিলক্ষিত হয়।

বনি ইসরাইলের ব্যাপার যখন এই পর্যন্ত পৌঁছে গেলো, তখন আল্লাহ তাআলার কল্যাণকামিতা ও প্রজ্ঞার চাহিদা হলো যে তিনি মুসা আ.-কে সে-সম্পর্কে অবহিত করে দেন। সুতরাং তিনি হযরত মুসা আ.-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে মুসা, তুমি তোমার কওমকে ফেলে রেখে এখানে আসার ব্যাপারে এত তাড়াহুড়া করলে কেনো?' হযরত মুসা আ. আরজ করলেন, 'হে আল্লাহ, এইজন্য যে, আপনার কাছে তাড়াতাড়ি পৌঁছে কওমের জন্য হেদায়েত লাভ করি।' আল্লাহ তাআলা তখন বললেন, 'যাদের হেদায়েতের জন্য তুমি এত অস্থির তারা তো এমন গোমরাহির মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়েছে।' হযরত মুসা আ. এ-কথা শুনে অত্যন্ত মর্মবেদনা, ক্রোধ ও লজ্জার সঙ্গে তাঁর কওমের কাছে ফিরে এলেন। তিনি তাদের সম্বোধন করে বললেন, তোমরা এটা কী করলে? আমার এমন কী বিলম্ব হয়েছিলো যে তোমরা এমন আপদ ঘটিয়ে ফেললে? তিনি এসব কথা বলছিলেন এবং ক্ষেভে ও ক্রোধে কাঁপছিলেন। এমনকি তাঁর হাত থেকে তাওরাতের ফলকগুলো পড়ে গেলো।

বনি ইসরাইলিরা বললো, আমাদের কোনো দোষ নেই। মিসরীয়দের অলঙ্কারগুলো আমরা সঙ্গে নিয়ে বেড়াচ্ছিলাম। সেগুলোই সামিরি আমাদের থেকে চেয়ে নিয়েছে এবং এই সঙ বানিয়েছে। এভাবে সে আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে।

'শিরক' নবুওতের পদের জন্য একটি অসহ্যকর বিষয়। এটি একটি কারণ, আরো একটি কারণ এই যে, হযরত মুসা আ. অত্যন্ত গরম মেজাজের লোক ছিলেন—তিনি তার ভাই হারুন আ.-এর ঘাড় ধরে ফেললেন এবং তার দাড়ির দিকেও হাত বাড়ালেন। তখন হারুন আ. বললেন, 'হে আমার ভাই, আমার কোনোই দোষ নেই। আমি তাদেরকে যতই বুঝালাম, তারা কোনোভাবেই মানলো না। তারা আমাকে বলতে শুরু করলো, মুসা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা তোমার কোনো কথাই শুনবো না। বরং তারা আমাকে দুর্বল পেয়ে আমাকে হত্যা করার সংকল্প করেছিলো। আমি তাদের এই অবস্থা দেখে ভাবলাম, এখন যদি আমি এদের মধ্যে লড়াই বাঁধিয়ে দিই এবং পূর্ণ ঈমানদার ও এদের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধে, তাহলে পরে আমার ওপর এই দোষারোপ হতে পারে যে, আমার অনুপস্থিতিতে তুমি কওমের মধ্যে বিভেদ বাঁধিয়ে দিয়েছো। এ-কারণে আমি নীরব থেকে তোমার অপেক্ষা করতে থাকলাম। প্রিয় ভাই, তুমি

আমার মাথার চুল ধরে টেনো না এবং দাড়িও ধরো না। এভাবে তুমি অন্য লোকদের হাসার সুযোগ দিও না।

হারুন আ.-এর এই যুক্তিযুক্ত বক্তব্য শুনে তাঁর ওপর থেকে হযরত মুসা আ.-এর ক্রোধ প্রশমিত হয়ে গেলো। এখন সামিরিকে লক্ষ করে বলতে লাগলেন, 'হে সামিরি, তুমি এটা কেমন সঙ বানালে?' সামিরি জবাব দিলো, 'আমি এমন একটি বিষয় দেখতে পেয়েছি যা বনি ইসরাইলের মধ্যে আর কেউ দেখতে পায় নি। অর্থাৎ, ফেরআউনের ডুবে মরার সময় হযরত জিবরাইল আ. ঘোড়ার পিঠে চড়ে ফেরআউন ও বনি ইসরাইলের মধ্যস্থলে দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি দেখলাম যে, তাঁর ঘোড়ার খুরের আঘাতে জমিনে প্রাণের লক্ষণ সঞ্চারিত হচ্ছে এবং শুকনো মাটিতে উদ্ভিদ উৎপন্ন হচ্ছে। তখন আমি হযরত জিবরাইল আ.-এর ঘোড়ার পায়ের মাটি থেকে এক মুঠো মাটি নিয়ে নিজের কাছে রাখলাম। সেই মাটিকে আমি এই বাছুরের ভেতর নিক্ষেপ করলাম। তৎক্ষণাৎ বাছুরটির মধ্যে প্রাণের লক্ষণ সঞ্চারিত হয়ে গেলো এবং তা 'হাম্বা' 'হাম্বা' আওয়াজ দিতে শুরু করলো।'

হযরত মুসা আ. বললেন, 'আচ্ছা, তোমার জন্য পৃথিবীতে এই শাস্তি নির্ধারিত করা হলো যে, তুমি উন্মাদের মতো এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াবে। কোনো মানুষকে তোমার কাছে আসতে দেখলেই তার থেকে পলায়ন করতে করতে বলবে, দেখো, আমাকে স্পর্শ করো না। এই তো হলো তোমার পার্থিব শাস্তি। আর কিয়ামতের দিনে এমন অবাধ্য ও পথভ্রষ্টের জন্য যে-শাস্তি নির্ধারিত আছে, তা তোমার জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতির আকারে পূর্ণ হবে।

হে সামিরি, তুমি এটাও দেখে রাখো যে, তুমি যে-গোবৎসকে উপাস্য বানিয়েছিলে এবং তার চারপাশে জটলা বেঁধে পূজায় বসেছিলে, আমি এখনই ওটাকে আগুনে নিক্ষেপ করে ভস্ম করে দিচ্ছি এবং সেই ভস্মকে নদীর পানিতে ভাসিয়ে দিচ্ছি—যেনো তুই ও তোর নির্বোধ অনুসারীরা বুঝতে পারিস তোদের উপাস্যের মর্যাদা ও মূল্য এবং ক্ষমতা ও শক্তির অবস্থা হলো এই, সে অপরের দয়া ও করুণা কী করবে, সে নিজের অস্তিত্বকেই ধ্বংস ও বিনাশ থেকে রক্ষা করতে পারে না।

ওরে হতভাগার দল, তোমরা কি এই সাধারণ কথাটুকুও বুঝতে পারলে না যে, একমাত্র আল্লাহই তোমার মাবুদ ও উপাস্য, তাঁর কোনো সঙ্গীও নেই এবং শরিকও নেই। তিনি সর্ববিষয়ে জ্ঞানী ও অবহিত।

ঘটনার এই অংশ কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এভাবে—

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ () وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (سورة البقرة)

'এবং নিশ্চয় মুসা তোমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণসহ এসেছে। এরপর তার প্রস্থানের পর তোমার গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিলে। আর তোমরা তো জালিম। (তোমরা ঈমানের পথে দৃঢ় ছিলে না; তোমরা কাফের হয়ে গিয়েছিলে।) স্মরণ করো (সেই সময়ের কথা,) যখন তোমাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তুরকে তোমাদের (মাথার) ওপর উত্তোলন করেছিলাম। বলেছিলাম, "যা দিলাম তা দৃঢ়রূপে গ্রহণ করো ও শ্রবণ করো।" তারা বলেছিলো, "আমরা শ্রবণ করলাম ও অমান্য করলাম।"[১০২] কুফরির কারণে তাদের হৃদয়ে (-এর পরতে পরতে) গো-বৎসের প্রেম সিঞ্চিত হয়েছিলো । বলো, "যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকে, তবে তোমাদের ঈমান যা-কিছুর নির্দেশ দেয় তা কত নিকৃষ্ট!"'
[সূরা বাকারা : আয়াত ৯২-৯৩]

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ () وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ () وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ

[১০২] মুখে বলেছিলো "শ্রবণ করলাম" আর মনে মনে বলেছিলো "অমান্য করলাম"।

الظَّالِمِينَ () قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ () إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ () وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ () وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ (سورة الأعراف)

'মুসার সম্প্রদায় তার অনুপস্থিতিতে (তাঁর তুর পাহাড়ে চলে যাওয়ার পর) নিজেদের অলঙ্কার দিয়ে (অলঙ্কারগুলো গলিয়ে) গড়ে নিলো একটি গো-বৎস—একটি অবয়ব, যা 'হাম্বা' আওয়াজ করতো। (আফসোস তাদের বুদ্ধির ওপর!) তারা কি (এই সাধারণ বিয়ষটাও) দেখলো না যে, তা তাদের সঙ্গে কথাও বলে না এবং তাদেরকে পথও দেখায় না? তারা এটিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করলো এবং তারা ছিলো জালিম। তারা যখন অনুতপ্ত হলো ও দেখলো যে তারা (সত্য থেকে) পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, তখন তারা বললো, "আমাদের প্রতিপালক যদি আমাদের প্রতি দয়া না করেন এবং আমাদেরকে ক্ষমা না করেন তবে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবোই।" মুসা যখন ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে এলো, তাদেরকে বললো, "আমার অনুপস্থিতিতে তোমারা আমার কত নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব করেছো! তোমাদের প্রতিপালকের আদেশের পূর্বে তোমরা ত্বরান্বিত করলে?"[১০৩] এবং সে (উত্তেজিত হয়ে তাওরাত-লিখিত) ফলকগুলো ফেলে দিলো এবং তার ভাইকে চুলে[১০৪] ধরে নিজের দিকে টেনে আনলো। হারুন বললো, "হে আমার সহোদর, (আমি কী করবো?) লোকেরা তো আমাকে দুর্বল মনে করেছিলো এবং আমাকে প্রায় খুন করেই ফেলেছিলো। তুমি আমার সঙ্গে এমন করো না যাতে শত্রুরা আনন্দিত হয় এবং তুমি আমাকে জালিমদের অন্তর্ভুক্ত করো না।" মুসা বললো, "হে আমার প্রতিপালক, আমাকে ক্ষমা করুন, (কেননা, আমি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম) এবং আমার ভাইকে(-ও) ক্ষমা করুন

---

[১০৩] হযরত মুসা আ. বললেন, "আমি তোমাদের প্রতিপালকের নির্দেশ লাভের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গিয়েছি, আর তোমার আমার ফিরে আসার অপেক্ষা না করে এমন ঘৃণ্য কাজ করে ফেললে?"

[১০৪] رأس অর্থ মাথা, এখানে 'মাথার চুল'।

(কারণ তিনি পথভ্রষ্টদেরকে কঠোরভাবে বারণ করতে পারেন নি) আর আমাদেরকে আপনার রহমতের মধ্যে দাখিল করুন। তুমিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু।" যারা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে পার্থিব জীবনে তাদের ওপর তাদের প্রতিপালকের ক্রোধ ও লাঞ্ছনা আপতিত হবেই। আর এইভাবে আমি মিথ্যারচনাকারীদের (তাদের দুষ্কর্মের) প্রতিফল দিয়ে থাকি। যার অসৎকাজ করে তার পরে তওবা করলে ও ঈমান আনলে তোমার প্রতিপালক তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। মূসার ক্রোধ যখন প্রশমিত হলো, তখন সে (তাওরাতের) ফলকগুলো তুলে নিলো। যারা তাদেরকে প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য ফলকগুলোতে যা লিখিত ছিলো তাতে ছিলো পথনির্দেশ ও রহমত।' [সূরা আ'রাফ : ১৪৮-১৫৪]

وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى () قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى () قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ () فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي () قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ () فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ () أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا () وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي () قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى () قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا () أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي () قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي () قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ () قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي () قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَى

إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا () إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا (سورة طه)

(মুসা তুর পর্বতে পৌছার পর আল্লাহপাক তাকে জিজ্ঞেস করলেন,) "হে মুসা, তোমার সম্প্রদায়কে পেছনে ফেলে (এখানে আসার জন্য) তোমাকে ত্বরা করতে[১০৫] বাধ্য করলো কীসে? মুসা বললো, "এই তো তারা আমার পেছনে এবং হে আমার প্রতিপালক, আমি ত্বরায় তোমার কাছে এলাম, তুমি সন্তুষ্ট হবে এইজন্য।" আল্লাহ বললেন, "আমি তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষায় ফেলেছি তোমার চলে আসার পর, এবং সামিরি[১০৬] তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে।" এরপর মুসা তার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেলো ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে। সে বললো, "হে আমার সম্প্রদায়, (এটা তোমরা কী করলে!) তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদেরকে এক উত্তম প্রতিশ্রুতি দেন নি? তবে কি প্রতিশ্রুতিকাল তোমাদের কাছে সুদীর্ঘ হয়েছে (যে, তোমরা তা মনে রাখতে পারলে না) না তোমরা চেয়েছো তোমাদের প্রতি আপতিত হোক তোমাদের প্রতিপালকের ক্রোধ, যে-কারণে তোমরা আমার প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে?" তারা বললো, "আমরা তোমার প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করি নি তবে (অন্য একটি ঘটনা ঘটে গেলো,) আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিলো (মিসরীয়) লোকদের অলঙ্কারের বোঝা (ভারী ভারী অলঙ্কারের বোঝা যা বহন করতে আমরা ইচ্ছুক ছিলাম না) এবং আমরা তা অগ্নিকুণ্ডে[১০৭] নিক্ষেপ করি, (এটাই আমাদের অপরাধ!) অনুরূপভাবে সামিরিও নিক্ষেপ করে।" এরপর সে (সামিরি) তাদের জন্য গড়ে দিলো একটি (স্বর্ণের) গো-বৎস—এক অবয়ব, যা 'হাম্বা' আওয়াজ করতো। তারা বললো, "এটা তোমাদের ইলাহ (উপাস্য) এবং মুসারও ইলাহ, কিন্তু মুসা ভুলে গেছে।" (তাদের বুদ্ধির ওপর আফসোস!) তবে

---

[১০৫] হযরত মুসা আ. তাওরাত আনতে তুর পাহাড়ে যাওয়ার সময় সঙ্গে কয়েকজন গোত্রীয় প্রধানকে নিয়ে যান। তিনি আল্লাহর সঙ্গে কথোপকথনের আগ্রহে তাদের আগেই পাহাড়ে পৌছে যান।

[১০৬] সামিরি সামিরা গোত্রের জনৈক ব্যক্তি, মতান্তরে বনি ইসরাইলের সামিরি নামক জনৈক ব্যক্তি।—কাশ্‌শাফ, কুরতুবি ইত্যাদি।

[১০৭] এখানে 'অগ্নিকুণ্ড' শব্দটি আরবিতে উহ্য আছে।—জালালাইন, কুরতুবি ইত্যাদি।

কি তারা ভেবে (এই সাধারণ বিষয়টাও ভেবে) দেখি নি যে, তা তাদের কথায় সাড়া দেয় না এবং তাদের কোনো ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না? হারুন তাদেরকে আগেই বলেছিলো, "হে আমার সম্প্রদায়, এটা (গো-বৎস) দ্বারা তো তোমাদেরকে কেবল (ধৈর্য ও দৃঢ়তার) পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। তোমাদের প্রতিপালক তো দয়াময়; সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ করো এবং আমার আদেশ মেনে চলো।" তারা বলেছিলো, "আমাদের কাছে মুসা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এর পূজা থেকে কিছুতেই বিরত হবো না।" মুসা বললো, "হে হারুন, তুমি যখন দেখলে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তখন কীসে তোমাকে নিবৃত্ত করলো— আমার অনুসরণ করা থেকে? তবে কি তুমি আমার আদেশ অমান্য করলে?" হারুন বললো, "হে আমার সহোদর, আমার দাড়ি ও চুল ধরো না। (আমি যদি কঠোরতা না করে থাকি তবে তা কেবল এটা মনে করে যে,) আমি আশঙ্কা করেছিলাম যে, তুমি বলবে, তুমি বনি ইসরাইলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছো এবং তুমি আমার বাক্য পালনে যত্নবান হও নি।" (এরপর সামিরিকে) মুসা বললো, "হে সামিরি, তোমার ব্যাপার কী?" সামিরি বললো, "আমি দেখেছিলাম যা তারা দেখে নি। এরপর আমি সেই দূতের (ফেরেশতা জিবরাইল) পদচিহ্ন থেকে একমুষ্টি (ধুলো বা মাটি) নিয়েছিলাম এবং আমি তা (আমার বানানো বাছুরের মধ্যে) নিক্ষেপ করেছিলাম; আমার মন আমার জন্য শোভন করেছিলো এমন কাজ করা।" মুসা বললো, "দূর হও, তোমার জীবদ্দশায় তোমার জন্য এটাই থাকলো যে, তুমি বলবে, 'আমি অস্পৃশ্য' (আমাকে কেউ স্পর্শ করো না) এবং তোমার জন্য থাকলো এক নির্দিষ্টকাল, তোমার বেলায় যার ব্যতিক্রম হবে না এবং তুমি তোমার সেই ইলাহের প্রতি লক্ষ করো যার পূজায় তুমি রত ছিলে; আমরা ওটাকে জ্বালিয়ে দেবোই, এরপর ওটাকে বিক্ষিপ্ত করে সাগরে নিক্ষিপ্ত করবোই।" তোমাদের ইলাহ তো কেবল আল্লাহই, যিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই, তাঁর জ্ঞান সর্ববিষয়ে ব্যাপ্ত।" [সুরা তোয়া-হা : আয়াত ৮৩-৯৮]

উল্লিখিত আয়াতসমূহের মধ্যে নিম্নবর্ণিত আয়াতটির তাফসিরের ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে :

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ () قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي (سورة طه)

মুসা বললো, "হে সামিরি, তোমার ব্যাপার কী?" সামিরি বললো, "আমি দেখেছিলাম যা তারা দেখে নি। এরপর আমি সেই দূতের (ফেরেশতা জিবরাইল) পদচিহ্ন থেকে একমুষ্টি (ধুলো) নিয়েছিলাম এবং আমি তা নিক্ষেপ করেছিলাম; আমার মন আমার জন্য শোভন করেছিলো এমন কাজ করা।" [সুরা তোয়া-হা : আয়াত ৯৫-৯৬]

আসলে এই আয়াতের মধ্যে কয়েকটি বিষয় আলোচিত হওয়ার যোগ্য। এই বিষয়গুলোর মীমাংসার ওপরই পুরো ঘটনার তাফসির নির্ভর করছে। ১. সামিরি কোন্ বস্তু দেখতে পেয়েছিলো যা অন্যরা, অর্থাৎ বনি ইসরাইলিরা দেখতে পায় নি? ২. 'এক মুষ্টি নিয়েছিলাম' কথার উদ্দেশ্য কী? ৩. রাসুল শব্দের উদ্দেশ্য হযরত মুসা আ. না-কি ফেরেশতা? ৪. 'আমি সেই একমুষ্টি মাটি নিক্ষেপ করলাম' কথার অর্থ্য কী?

ঘটনাটির পূর্ববর্ণিত বিবরণ থেকে অধিকাংশ মুফাসসিরের সিদ্ধান্ত ও মত জানা গেছে। তবুও এখানে তা সংক্ষিপ্ত আকারে হযরত শাহ আবদুল কাদির সাহেব দেহলবি রহ.-এর ভাষায় শ্রবণ করুন :

"বনি ইসরাইল দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যাওয়া সমুদ্রের ভেতর প্রবেশ করলো। তাদের পেছনে পেছনে ফেরআউন দলবলসহ প্রবেশ করলো। যাতে ফেরআউন বনি ইসরাইল পর্যন্ত পৌছতে না পারে, এজন্য জিবরাইল আ. মধ্যস্থলে এসে দাঁড়ালেন। সামিরি চিনতে পারলো যে, ইনি হযরত জিবরাইল আ.। সে তাঁর পদচিহ্ন থেকে কিছু মাটি উঠিয়ে নিলো। এখন সে সেই মাটিটাকেই স্বর্ণনির্মিত গো-বৎসের মধ্যে নিক্ষেপ করলো। স্বর্ণের অলঙ্কারগুলো ছিলো কাফেরদের সম্পদ। ধোঁকার মধ্য দিয়ে এগুলো গ্রহণ করা হয়েছিলো। এখন তাতে বরকতময় মাটি নিক্ষিপ্ত হলো। হক ও বাতিল মিশ্রিত হয়ে একটি কারিশমার সৃষ্টি হলো। ফলে এটির মধ্যে প্রাণ সঞ্চারিত হলো এবং আওয়াজ উৎপন্ন হলো। এমন বস্তু থেকে দূরে থাকা উচিত। এগুলো থেকেই মূর্তিপূজা প্রসার লাভ করে।"

এই তাফসির প্রসঙ্গে রুহুল মাআনি ফি তাফসিরিল কুরআনিল আযিম ওয়াস সাবয়িল মাসানি-এর লেখক আবুস সানা শিহাবুদ্দিন মাহমুদ আল-আলুসি বলেন, 'আয়াতটির এই তাফসির সেই তাফসিরই বটে যা হযরত

সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন এবং উচ্চমর্যাদাশীল মুফাস্‌সিরগণ থেকে বর্ণিত হয়েছে।'[১০৮]

শাহ আবদুল কাদির দেহলবি রহ.-এর তাফসিরের বিপরীত অন্য একটি তাফসির রয়েছে। বিখ্যাত মুতাযিলি আলেম আবু মুসলিম ইসফাহানি এই তাফসির করেছেন। তিনি বলেন, "আয়াতের অর্থ হলো এই : সামিরি হযরত মুসা আ.-কে জবাব দিলো, বনি ইসরাইলের আকিদা ও বিশ্বাসের বিপরীতে আমার এমন ধারণা ছিলো যে, আপনি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নন। সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনার অনুসরণও করেছিলাম এবং আপনার কিছু আদেশ-নিষেধও মান্য করেছিলাম। কিন্তু আপনার অনুসরণের প্রতি আমার অন্তর কখনো একনিষ্ঠ হয় নি এবং অবশেষে আমি আপনার অনুসরণ ও অনুগমনকেও পরিত্যাগ করেছি। এই কর্মপন্থাকেই আমার মন আমার জন্য শোভন করে তুলেছিলো।"

আবু মুসলিম ইসফাহানির কাছে بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِه বাক্যের অর্থ যেনো এই : সামিরি বনি ইসরাইলের আকিদার বিপরীতে গিয়ে হযরত মুসা আ.-কে সত্যপথের ওপর প্রতিষ্ঠিত মনে করতো না। আর فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ বাক্যে রাসুলের অর্থ হযরত মুসা আ.। আর أَثَرِ الرَّسُولِ অর্থ তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ। শব্দের قَبْضَةً অর্থ সামান্য আনুগত্য আর فَنَبَذْتُهَا শব্দের উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করা।

আবু মুসলিম তাঁর এই তাফসিরের পক্ষে আরবি অভিধান থেকে কিছু সাক্ষ্য-প্রমাণও উপস্থিত করেছেন এবং অধিকাংশ মুফাসসিরের তফাসিরের ওপর কিছু প্রশ্নও উত্থাপন করেছেন। সাইয়িদ শিহাবুদ্দিন মাহমুদ আল-আলুসি তাঁর তাফসিরগ্রন্থে এসব প্রশ্নের বিস্তারিত জবাবও দিয়েছেন।

এতকিছু সত্ত্বেও ইমাম আবু আবদুল্লাহ আর-রাযি তাঁর আত-তাফসিরুল কাবিরে (মাফাতিহুল গাইব) আবু মুসলিম ইসফাহানির তাফসিরকেই শক্তিশালী, প্রণিধানযোগ্য ও বিশুদ্ধ বলে মেনে নিয়েছেন। তিনি বলেন :

---

[১০৮] রুহুল মাআনি ফি তাফসিরিল কুরআনিল আযিম, ১৬শ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২৯, সুরা তোয়া-

"এটা স্পষ্ট যে, আবু মুসলিম যে-তাফসির বর্ণনা করেছেন তাতে তো অবশ্যই মুফাস্সিরিনে কেরামের বিরোধিতা পাওয়া যায়; কিন্তু নিম্নবর্ণিত কয়েকটি কারণের প্রতি লক্ষ করলে তাঁর তাফসিরই সত্যের অধিক নিকটবর্তী।"[১০৯]

বর্তমান যুগের উলামায়ে কেরামের মধ্যে মাওলানা আবুল কালাম আযাদও তরজুমানুল কুরআনে ইসফাহানির তাফসিরকেই অবলম্বন করেছেন।

আলোচ্য আয়াতটি সম্পর্কে কুরআন মাজিদের পূর্বাপর আয়াতগুলো পাঠ করলে এবং এ-প্রসঙ্গে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সহিহ হাদিসগুলোর অনুসন্ধান ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করলে সত্য ও প্রাধান্যযোগ্য বক্তব্য দাঁড়ায় এটি যে, এ-বিষয়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এমন কোনো পরিষ্কার ব্যাখ্যা বর্ণিত হয় নি যার দ্বারা একটি দিকের নিশ্চয়তা পাওয়া যায় আর অপর দিকটি বাতিল বলে সাব্যস্ত হয়। সম্ভবত এ-কারণেই বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও মুফাস্সির হাফেযে হাদিস আল্লামা ইমাদুদ্দিন বিন কাসির রহ. এই প্রসঙ্গে বর্ণিত যাবতীয় রেওয়ায়েতকে সামনে রেখেছেন। তিনি জমহুর মুফাস্সিরগণের তাফসিরেরই সমর্থন করেছেন এবং আবু মুসলিম ইসফাহানির তাফসিরের সমর্থন করেন নি। এমনকি তিনি ইসফাহানির তাফসির উদ্ধৃতও করেন নি। তারপরও তিনি জমহুর মুফাস্সিরগণের তাফসিরকে তেমন মর্যাদা প্রদান করেন নি যা রুহুল মাআনির গ্রন্থাকার উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ এই যে, এখানে জমহুর মুফাস্সিরগণের তাফসিরই হাদিসের অকাট্য ভাষ্য দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং এখানে অন্য ধরনের তাফসিরের সম্ভাবনা খোদাদ্রোহিতা ও রাসুলের বিরোধিতা বলে গণ্য হবে।

যেমন : আল্লামা ইবনে কাসির উল্লিখিত আয়াতটির তাফসির বর্ণনা করার পর শুধু এতটুকু বলেছেন—

وهذا هو المشهور عند كثير من المفسرين أو أكثرهم.

---

[১০৯] আত-তাফসিরুল কাবির : মাফাতিহুল গাইব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭০।

"এই তাফসিরই বহু মুফাস্‌সির বরং অধিকাংশ মুফাসসিরের কাছে প্রসিদ্ধ।"[১১০]

একইভাবে তাঁদের সমসাময়িক বিখ্যাত মুফাস্‌সির আল্লামা আবু হাইয়ান আল-আন্দালুসি তাঁর 'তাফসিরুল বাহরিল মুহিত' কিতাবে আবু মুসলিম ইসফাহানির তাফসিরকে قِيل বা 'বলা হয়েছে'[১১১] বলে উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু তিনি তার সমালোচনায় একটি বাক্যও লেখেন নি এবং নীরবতা অবলম্বন করেছেন।

অতএব, এ-সকল উচ্চমর্যাদাশীল মুফাসিরের এ-ধরনের বক্তব্য থেকে এ-কথা প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা জমহুর মুফাস্‌সিরগণের তাফসিরকেই বিশুদ্ধ ও প্রণিধানযোগ্য মনে করছেন; কিন্তু ভিন্ন ধরনের তাফসিরের সম্ভাবনার ব্যাপারে এমন দাবি করেন না যে, তা হাদিসে বর্ণিত নিশ্চিত তাফসিরের বিরোধী এবং তাতে এই আশঙ্কা রয়েছে যে, তার অন্তরালে ধর্মদ্রোহিতা ও ধর্মহীনতা ক্রিয়াশীল।

যাইহোক। এতেও কোনো সন্দেহ নেই যে, এই আয়াতের পূর্বাপর অবস্থা এবং কবুল ও হওয়া ও না হওয়ার ব্যাপারে এখানে কুরআন মাজিদের যাবতীয় আয়াতের বর্ণনাশৈলী—উভয়টিই আবু মুসলিমের তাফসিরকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে এবং প্রকাশ করে যে, তাঁর তাফসির কোনো তাফসিরই নয়, মনগড়া ব্যাখ্যা মাত্র। কেননা, আলোচ্য আয়াতের بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِه বাক্যটিতে بصارة (দর্শন করা) দ্বারা بصارة العين (চাক্ষুষ দর্শন)-এর পরিবর্তে بصارة القلب (অন্তরের দর্শন) অর্থ করা, হযরত মুসা আ.-কে সম্বোধন করেও الرَّسُول বলে তাঁকে তৃতীয় পুরুষের স্থানে দাঁড় করানো, فَقَبَضْتُ قَبْضَةً-এর অর্থ 'একমুষ্টি' না করে 'সামান্য পরিমাণ আনুগত্য করা' বর্ণনা করা এবং فَنَبَذْتُهَا বাক্যে 'আনুগত্য পরিত্যাগ করা' অর্থ গ্রহণ করা—এগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন বাক্যের হিসেবে আরবের কথ্য ভাষায় মেনে নেয়ার যোগ্য; কিন্তু আল্লাহপাকের

---

[১১০] তাফসিরে ইবনে কাসির, সুরা তোয়া-হা।

[১১১] কারো কোনো বক্তব্যকে দুর্বল মনে করা হলে قِيل বা 'বলা হয়েছে' বলে উদ্ধৃত করা

কালামের পূর্ণ ইবারতের প্রতি লক্ষ করলে আবু মুসলিমের তাফসিরটি একটি দুর্বল ব্যাখ্যার চেয়ে অধিক মর্যাদার অধিকারী হয় না। আর আগের ও পরের আয়াতগুলো সাক্ষ্য প্রদান করছে যে, এখানে ওই অর্থই প্রবল ও অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য, যা জমহুর মুফাস্‌সিরগণ গ্রহণ করেছেন।

এখানে কি এই মৌলিক প্রশ্নটি উত্থাপিত হয় না যে, যদি সামিরির এ-কথা বলাই উদ্দেশ্য হতো—"আমি অন্তরে আপনার সত্য নবী হওয়ার বিশ্বাস পোষণ করতাম না, কিন্তু সুযোগ ও সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে কিছু দিনের জন্য আপনার আনুগত্য করছিলাম, এখন তাও পরিত্যাগ করলাম"—তবে এমন পরিষ্কার ও সাধাসিধে কথাটুকুর জন্য কুরআন মাজিদের দ্ব্যর্থবোধক ও অস্পষ্ট বিবরণ প্রকাশের প্রয়োজন হলো কেনো? যার ফলে—মাওলানা আবুল কালাম আযাদের ভাষায়—মুফাস্‌সিরগণ এই সুযোগ পেলেন যে, তাঁরা ইহুদি সমাজে প্রচলিত অলীক রেওয়ায়েতগুলোকে আলোচ্য আয়াতের সঙ্গে ঠিক ঠিকভাবে খাপ খাইয়ে দিলেন।

সুতরাং জমহুর মুফাস্‌সিরগণের তাফসির ইহুদিদের অলীক রেওয়ায়েত নয়; বরং তা কুরআনেরই বর্ণিত বয়ান এবং পরিষ্কারভাবে এদিকে ইঙ্গিত করছে যে, হযরত মুসা আ.-এর জিজ্ঞাসায় সামিরির জবাব অবশ্যই এমন কোনো ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত, যা ছিলো বিস্ময়রকর বক্রস্বভাব মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য তাকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করা হয়েছিলো।

এখন একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, এমন একটি বিচিত্র ও অভিনব ঘটনা একজন পথভ্রষ্ট লোকের হাতে কেমন করে প্রকাশ পেলো? এ-ব্যাপারে সর্বোত্তম জবাব হযরত শাহ আবদুল কাদির রহ.-এর বক্তব্য যা তাঁর বিখ্যাত তাফসিরগ্রন্থ 'মুযিহুল কুরআন' থেকে একটু আগে উদ্ধৃত করা হয়েছে। অর্থাৎ, যখন একটি বাতিলকে অপর কোনো সত্যের সঙ্গে মিশ্রিত করা হয় তখন তাদের সংমিশ্রনে একটি কারিশমা উৎপন্ন হয়। এটি সেই সংমিশ্রণেরই বিশেষত্ব এবং তারই প্রকৃত স্বভাব নামে বর্ণিত হয়ে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে করুন : আপনি গোলাবি আতরের সঙ্গে কিছু পরিমাণ বিষ্ঠা মিশ্রিত করলেন। তাতের গোলাবের উত্তম ও মনমাতানো সুগন্ধ বিষ্ঠার জঘন্য দুর্গন্ধের সঙ্গে মিলিত হয়ে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করবে যা নিঃসন্দেহে মন ও মস্তিষ্কের ওপর আসল বিষ্ঠার

দুর্গন্ধের চেয়েও অত্যন্ত নিকৃষ্ট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। অবস্থা তখন এমন হয়ে যাবে যে, একজন সুস্থ-স্বভাব মানুষ বিষ্ঠার স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা সহ্য করতে পারবে; কিন্তু মিশ্রিত এই দুর্গন্ধকে এক নিমিষের জন্য বরদাশত করতে পারবে না। এ-কারণেই ইসলাম সত্য ও মিথ্যার এমন মিশ্রণকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। কেননা, এতে কঠিন পথভ্রষ্টতা বিস্তার লাভ করে।

মোটকথা, জমহুরের তাফসিরই সঠিক এবং কুরআন মাজিদের বর্ণনার সঙ্গে পূর্ণ সামঞ্জস্য রাখে।

সামিরি কে ছিলো?

সামিরি এই অভিনব প্রতারণা একজন গবেষকের জন্য এই প্রশ্ন সৃষ্টি করে দিয়েছে যে, সামিরি ইসরাইলি ছিলো না-কি ভিন্ন কেউ? আর এই সামিরি শব্দটি তার নাম ছিলো না-কি উপাধি ছিলো?

আবদুল ওয়াহ্হাব নাজ্জার বলেন, খ্রিস্টানরা পত্রিকাসমূহে এ-ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছে যে সামিরি নামটি 'সামিররাহ' শহরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। আর সামিররাহ নামক শহরটি তখন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিতও হয় নি। সুতরাং কুরআনের এই ঘটনায় সামিরিকে উল্লেখ করার অর্থ কী?

তাদের এই জিজ্ঞাসার জবাব এই যে, সামিরি সামিররাহ শহরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয় এবং সম্পর্কযুক্ত হতেও পারে না। কেননা, মুসা আ.-এর যুগে এই শহরটির অস্তিত্ব ছিলো না। তার বহুকাল পরে তা অস্তিত্বের জগতে এসেছে। সামিরি শব্দটি বরং 'শামির' শব্দের দিকে সম্পর্কযুক্ত এবং তা ইবরানি শব্দ। শব্দটি আরবি ভাষায় রূপান্তরিত হওয়ার সময় ش (শীন) হরফটি س (সীন) হরফে পরিবর্তিত হয়েছে। ইবরানি বা হিব্রু ভাষাভাষীদের সিফরে আফরাইম ও সিবতে ইয়াহুযা নামক দুটি শাখা। এদের মধ্যে আফরাইমিরা 'সীন' উচ্চারণ করে আর ইয়াহুযারা উচ্চারণ করে 'শীন'। আর 'শামির' শব্দটিকে হিব্রু ভাষায় 'শাওমির' উচ্চারণ করা হতো। 'শামর'-এর অর্থ রক্ষণাবেক্ষণ করা, সুতরাং শাওমির বা শামির বা সামিরি-এর অর্থ রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং এই সম্পর্কের কারণেই সামিরি বলা হতো।

আবদুল ওয়াহ্হাব নাজ্জার হিব্রু ভাষার তাওরাত থেকে এই অর্থ প্রমাণের জন্য সাক্ষ্য হিসেবে একটি উদ্ধৃতিও দিয়েছেন : আল্লাহ তাআলা কাবিলকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ভাই কোথায়? তখন সে জবাব দিয়েছিলো, আমি জানি না সে কোথায়। مسو میراحی انوخی অর্থাৎ, আমি কি আমার ভাইয়ের রক্ষণাবেক্ষণকারী?[১১২]

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ বলেন :

"এখানে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, সামিরি কে ছিলো? সামিরি শব্দটি কি তার নাম ছিলো না-কি জাতিগত উপাধি ছিলো। অনুমান থেকে বলা যায় যে, এখানে সামিরি (سامری) বলতে সামিরি (سمیری) নামক সম্প্রদায়ের একজন লোক উদ্দেশ্য। কেননা, যে-সম্প্রদায়কে আমরা সামিরি (سمیری) নামে আখ্যায়িত করতে শুরু করেছি, আরবি ভাষায় প্রাচীনকাল থেকেই তার নাম সামিরি (سامری) বলা হয়েছে। এখনো ইরাকে তাদের অবশিষ্ট লোকদেরকে এই নামেই আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। এখানে কুরআন মাজিদে তাকে সামিরি বলে আখ্যায়িত করা পরিষ্কারভাবে বুঝাচ্ছে যে, সামিরি তার নাম নয়, এটি তার সম্প্রদায়সত্তার প্রতি ইঙ্গিত। অর্থাৎ, সে ইসরাইলি ছিলো না, সামিরি সম্প্রদায়ের একজন সদস্য ছিলো। হযরত ইসা আ.-এর প্রায় সাড়ে তিন হাজার পূর্বে দাজলা ও ফোরাত নদীর মধ্যবর্তী এলাকায় দুটি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় বসবাস করতো এবং তারা এক জাঁকজমকপূর্ণ সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করেছিলো। এদের মধ্যে একটি সম্প্রদায়, যারা দক্ষিণ দিক থেকে এসে এখানে বসতি স্থাপন করেছিলো, ছিলো আরব। দ্বিতীয় সম্প্রদায়টি, যাদের সম্পর্কে ধারণা করা হয় যে তারা উত্তর দিক থেকে এসেছিলো, ছিলো সামিরি। এই সম্প্রদায়েরই নামানুসারে প্রাচীন ইতিহাসের 'সামিররাহ' শহরটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো, যার অবস্থান তিল আল-আবিদে বলে জানা গেছে। এই শহর থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে নির্মিত অলঙ্কার ও স্বর্ণনির্মিত পাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে।

সামিরি সম্প্রদায়ের উৎপত্তি কী ছিলো, এ-সম্পর্কে এ-পর্যন্ত কোনো সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় নি। কিন্তু নিনোভাতে ইশোরি পলের (মৃত্যু

---

[১১২] কাসাসুল আম্বিয়া, আবদুল ওয়াহ্হাব নাজ্জার, পৃষ্ঠা ৩৬৬।

: ৬৬৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) যে-গ্রন্থাগার আবিষ্কৃত হয়েছে, তাতে কাঠের ফলকে লিখিত ভাষা-সঙ্কলনগ্রন্থও রয়েছে। এতে 'আকাদি' ও 'সামিরি' ভাষার সমার্থক শব্দসমূহ সংগ্রহ করা হয়েছে। তা থেকে জানা যায় যে, সামিরি ভাষার ধ্বনিসমূহ সামি বর্ণমালার ধ্বনি থেকে ততটা ভিন্ন নয়। খুব সম্ভব, তারাও মূলত এসব গোত্রের সঙ্গে কোনো দূরবর্তী সম্পর্কে সম্পর্কিত ছিলো, যার জন্য আমরা তাওরাতের পরিভাষা সামি গ্রহণ করেছি। যাইহোক। সামিরি সম্প্রদায়ের আসল জন্মভূমি ছিলো ইরাকে। কিন্তু কালক্রমে তারা বহু এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছিলো। অনুসন্ধানে জানা গেছে যে, মিসরের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক খ্রিস্টপূর্ব এক হাজার বছর আগেও বিদ্যমান ছিলো। সুতরাং বুঝা যায় যে, এই সম্প্রদায়েরই এক ব্যক্তি হযরত মুসা আ.-এর ভক্ত হয়ে পড়েছিলো। বনি ইসরাইল যখন মিসর থেকে বের হয়ে এলো, তখন সেই ব্যক্তিও তাদের সঙ্গে মিসর থেকে বের হয়ে এলো। এই ব্যক্তিকেই কুরআন মাজিদ সামিরি বলে উল্লেখ করেছে। গাভী, বলদ ও বাছুরের পবিত্রতায় বিশ্বাস সামিরিদেরও ছিলো, মিসরীয়দেরও ছিলো।"[১১৩]

আবদুল ওয়াহ্হাব নাজ্জার এবং মাওলানা আবুল কালাম আযাদ—এই দুজনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ পাঠ করার পর সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে, নাজ্জারের ব্যাখ্যার মোকাবিলায় মাওলানা আযাদের ব্যাখ্যা অধিকতর সঠিক ও প্রবল এবং নাজ্জারের ব্যাখ্যা একটি দূরবর্তী ব্যাখ্যা। সামির শব্দের অর্থ যদি রক্ষণাবেক্ষণকারী হয়, তবে তার নাম সামিরি হলো কেনো? নাজ্জারের ব্যাখ্যায় এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায় না। আর মাওলানা আযাদের বর্ণনায় যে-ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের সঙ্গে খ্রিস্টানদের জিজ্ঞাসার জবাব পাওয়া যায় তা-ই সঠিক।

মোটকথা এই যে, হযরত মুসা আ. এসব ব্যাপার থেকে অবসর হয়ে আল্লাহ তাআলার দরবারে মনোনিবেশ করলেন। তিনি বললেন, হে প্রতিপালক, এখন আপনার দরবারে এদের ধর্মত্যাগের শাস্তি কী? জবাব এলো, যারা এই শিরক করেছে তাদেরকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে। নাসায়ি শরিফের রেওয়ায়েতে আছে, হযরত মুসা আ. বনি ইসরাইলকে বললেন, তোমাদের তওবার জন্য কেবল একটি উপায়ই নির্ধারিত হয়েছে

---

[১১৩] তরজুমানুল কুরআন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৬৫-৪৬৬।

: অপরাধীরা তাদের জীবনকে এইভাবে ধ্বংস করে দেবে যে, যে-ব্যক্তি যার যত নিকটতম আত্মীয় হবে, সে তার আত্মীয়কে নিজ হাতে হত্যা করবে। অর্থাৎ, পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে এবং ভাই ভাইকে। শেষ পর্যন্ত বনি ইসরাইলকে এই আদেশ মান্য করতে হলো । তাওরাতে বর্ণিত আছে যে, এইভাবে তিন হাজার বনি ইসরাইল নিহত হলো। আর কোনো কোনো ইসলামি রেওয়ায়েতে নিহতের সংখ্যা এর চেয়েও অধিক উল্লেখ করা হয়েছে। ঘটনা এই পর্যন্ত পৌঁছলে হযরত মুসা আ. আল্লাহ তাআলার দরবারে সিজদায় পতিত হলেন এবং আরজ করলেন, ইয়া আল্লাহ, এখন এদের প্রতি রহম করুন এবং এদের অপরাধ ক্ষমা করে দিন। হযরত মুসা আ.-এর দোয়া কবুল হলো এবং আল্লাহ তাআলা বললেন, আমি হত্যাকারী ও নিহত উভয়কে ক্ষমা করে দিলাম। আর যারা জীবিত আছে এবং অপরাধী তাদেরকেও ক্ষমা করে দিলাম। তুমি তাদেরকে বুঝিয়ে দাও তারা যেনো ভবিষ্যতে শিরকের ধারে-কাছেও না যায়।

এই-বিষয়টি কুরআন মাজিদে বর্ণিত হয়েছে এভাবে—

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (سورة البقرة)

'আর স্মরণ করো (সেই সময়ের কথা,) যখন মুসা তার সম্প্রদায়ের লোকদের বললো, "হে আমার সম্প্রদায়, গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে তোমরা নিজেদের প্রতি ঘোর অত্যাচার করেছো[১১৪], সুতরাং তোমরা তোমাদের স্রষ্টার প্রতি ফিরে যাও এবং তোমরা নিজেদেরকে হত্যা[১১৫] করো। তোমাদের স্রষ্টার কাছে এটাই শ্রেয়। তিনি তোমাদের প্রতি

---

[১১৪] তারা গো-বৎসের পূজা করে নিজেদের প্রতি জুলুম ও অত্যাচার করেছিলো।

[১১৫] কাতলুন (قتل) শব্দের অর্থ প্রাণনাশ করা, হত্যা করা, বধ করা। অর্থাৎ, তোমাদের স্বজনদের মধ্যে যারা গো-বসৎসের পূজা করে অপরাধী হয়েছে তাদেরকে হত্যা করো। কাতলুন নাফস (قتل النفس) কুপ্রবৃত্তি দমন করা এবং আত্মাকে সংযত করা অর্থেও ব্যবহৃত হয়।—রাগিব। কেউ কেউ এখানে দ্বিতীয় অর্থও গ্রহণ করেছেন।

ক্ষমাপরবশ হবেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"' [সুরা বাকারা : আয়াত ৫৪]

এই ঘটনা সম্পর্কে তাওরাত ও কুরআনের মধ্যে বিশেষ মতবিরোধ রয়েছে। তাওরাতে বলা হয়েছে যে, হযরত হারুন আ. গো-বৎস নির্মাণ করেছিলেন :

আর লোকেরা দেখলো যে, হযরত মুসা আ. তুর পাহাড় থেকে ফিরে আসতে বিলম্ব করে ফেলেছেন। তারা তখন হারুন আ.-এর কাছে একত্র হয়ে তাঁকে বলতে লাগলো, ওঠো, আমাদের জন্য দেবতা নির্মাণ করে দাও। যা আমাদের সামনে সামনে চলবে। কেননা, আমরা জানি না যে মুসা নামের এই ব্যক্তি, যে আমাদেরকে মিসর থেকে বের করে এনেছে, তার কী হয়েছে? হারুন তাদেরকে বললেন, তোমাদের স্ত্রীদের, কন্যাদের এবং পুত্রদের কানে যেসব স্বর্ণের বালি রয়েছে, সেগুলো খুলে আমার কাছে নিয়ে এসো। তারা সবাই তাদের কান থেকে স্বর্ণের বালিগুলো খুলে হারুনের কাছে এনে উপস্থিত করলো। তিনি তাদের হাত থেকে অলঙ্কারগুলো গ্রহণ করে আগুনে গলিয়ে একটি বাছুর নির্মাণ করলেন এবং ছেনি দিয়ে ছেঁচে ওটার আকৃতি ঠিক করে দিলেন। এরপর তিনি তাদের উদ্দেশে বললেন, হে বনি ইসরাইল, এটিই তোমাদের সেই দেবতা, যা তোমাদেরকে মিসর রাজ্য থেকে বের করে এনেছে। তারপর হারুন তার জন্য একটি কুরবানির স্থান নির্ধারণ করে ঘোষণা দিলেন যে, আগামীকাল আল্লাহর উদ্দেশে এখানে ঈদ-উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।"[১১৬]

তাওরাতকে বিকৃত ও রূপান্তরিত করার সাক্ষ্য এর চেয়ে অধিক আর কী হতে পারে যে, যে-তাওরাত এই 'নিষ্ক্রমণ' অধ্যায়েই হযরত হারুন আ.-কে আল্লাহর নবী এবং হযরত মুসা আ.-এর সহকারী বলে ঘোষণা করছে, সেই তাওরাতই হারুন আ.-কে (নাউযুবিল্লাহ) কেবল মুশরিক ও মূর্তিপূজকই সাব্যস্ত করছে না; বরং শিরকের দীক্ষাদাতা ও মূর্তিপূজার পথপ্রদর্শক বলছে।

তাওরাত পাঠ করলে আপনি সহজেই এটা অনুমান করতে পারবেন যে, আহলে কিতাব ইহুদি-নাসারার বিস্ময়কর কর্মকাণ্ড এবং আল্লাহর কিতাবকে বিকৃত করার কাহিনিসমূহের মধ্যে সবচেয়ে অধিক ঘৃণ্য

কাহিনি এই যে, তারা আল্লাহ তাআলার মনোনীত যে-সকল মহামানবদেরকে নবী ও রাসুল বলে থাকে, তাদের ওপরই শিরক, কুফর এবং অসৎ চরিত্রের অপবাদ আরোপ করতে দ্বিধা করে না। যেমন : এখানে তারা সামিরির শিরকি কর্মকাণ্ডকে হযরত হারুন আ.-এর ওপর আরোপ করেছে। কুরআন মাজিদ তাদের অপবাদকে জোরেশোরে খণ্ডন করেছে এবং ঘোষণা করেছে যে, হযরত হারুন আ. এই ধরনের অপবিত্রতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। গো-বৎস নির্মাণ করা এবং গো-বৎসের পূজার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা ছিলো সামিরিরই কাজ; হযরত হারুন আ.-এর মতো উচ্চ মর্যাদাবান নবীর কাজ ছিলো না। তিনি তো কঠোরতার সঙ্গে বনি ইসরাইলকে এই অপবিত্র-ঘৃণ্য কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য চেষ্টা করেছেন; কিন্তু সেই দুর্ভাগারা কোনোক্রমেই তাঁর কথা মানে নি। যেমন : কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে—

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي () قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى (سورة طه)

'আর হারুন তাদেরকে আগেই বলেছিলো, "হে আমার সম্প্রদায়, এটা (গো-বৎস) দ্বারা তো তোমাদেরকে কেবল পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। তোমাদের প্রতিপালক তো দয়াময়; সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ করো এবং আমার আদেশ মেনে চলো।" তারা বলেছিলো, "আমাদের কাছে মুসা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এর পূজা থেকে কিছুতেই বিরত হবো না।"' [সুরা তোয়া-হা : আয়াত ৯০-৯১]

সত্তর জন সরদার মনোনয়ন

বনি ইসরাইলের এই অপরাধ যখন ক্ষমা করা হলো তখন হযরত মুসা আ. তাদেরকে বললেন, "এই যে তোমরা আমার কাছে ফলকগুলো দেখছো এটা আল্লাহ তাআলার কিতাব। তোমাদের হেদায়েত এবং ধর্মীয় ও পার্থিব জীবনের কল্যাণের জন্য আল্লাহ তাআলা এই কিতাব আমাকে দান করেছেন। এই কিতাবের নাম তাওরাত। এখন তোমাদের ওপর অবশ্য কর্তব্য ও ফরয হলো এই কিতাবকে আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাব বলে বিশ্বাস করা এবং তার নির্দেশসমূহ পালন করা।"

বনি ইসরাইল আসলে সর্বাবস্থায় বনি ইসরাইলই ছিলো। তারা বলতে লাগলো, "মুসা আমরা কীভাবে বিশ্বাস করি যে এটি আল্লাহর কিতাব। শুধু তোমার কথাতেই তো আমরা বিশ্বাস করবো না। আমরা তো এই কিতাবের ওপর তখনই বিশ্বাস স্থাপন করবো যখন আল্লাহকে আবরণহীন অবস্থায় নিজেদের চোখে দেখতে পাবো। আর আল্লাহ আমাদেরকে বলে দেবেন যে, এটা তাওরাত—আমার কিতাব; তোমরা এই কিতাবের প্রতি ঈমান আনো।"

হযরত মুসা আ. বনি ইসরাইলকে বুঝালেন যে, এটা তো একটা নির্বোধের আবদার। এই চর্মচক্ষু দিয়ে আল্লাহ তাআলাকে কে দেখেছে যে তোমরা দেখতে পাবে? এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু বনি ইসরাইল হঠকারিতায় যথারীতি অটল থাকলো। হযরত মুসা আ. তাদের এই অবস্থা দেখে একটু চিন্তা-ভাবনা করে বললেন, এটা তো সম্ভব হতে পারে না যে, তোমরা লাখ লাখ লোক এই কথার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য আমার সঙ্গে তুর পাহাড়ে গমন করো। সুতরাং এটা সমীচীন হবে যে, তোমাদের মধ্য থেকে কয়েকজন নেতৃস্থানীয় লোককে নির্বাচিত করে আমার সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। তারা যখন ফিরে এসে সত্যতার সাক্ষ্য দেবে তখন তোমরাও তা মেনে নেবে। আর যেহেতু তোমরা এখন গো-বৎসের পূজা করে খুব বড় একটি অন্যায় করে ফেলেছো, তাই লজ্জা ও অনুতাপ প্রকাশ করা এবং আল্লাহ তাআলার দরবারে ভবিষ্যতে ভালো কাজ করার প্রতিজ্ঞার জন্যও এটি সুবর্ণ সুযোগ। বনি ইসরাইল মুসা আ.-এর এই কথার ওপর সম্মত হলো।

হযরত মুসা আ. বনি ইসরাইলের বারোটি গোত্র থেকে সত্তর জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে মনোনীত করে সঙ্গে নিলেন এবং তুর পাহাড়ে গিয়ে পৌঁছালেন। তৎক্ষণাৎ শুভ্র মেঘের আকারে এক নুর এসে হযরত মুসা আ.-কে আচ্ছাদিত করে ফেললো এবং আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কথোপকথন শুরু হয়ে গেলো। হযরত মুসা আ. আল্লাহর দরবারে আরজ করলেন, আপনি বনি ইসরাইলের সব অবস্থা জানেন এবং দেখেন। তাদের হঠকারিতার কারণে সত্তর জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে বাছাই করে সঙ্গে নিয়ে আসা হয়েছে। কতই না উত্তম হতো যদি এই নুরের আবরণে আমার ও আপনার মধ্যকার কথোপকথন তারাও শুনতে পেতো এবং কওমের কাছে ফিরে গিয়ে সত্যতা প্রমাণ করার যোগ্য হতো।

আল্লাহ তাআলা হযরত মুসা আ.-এর দোয়া মঞ্জুর করলেন এবং তাদেরকে নুরের আবরণের ভেতর নিয়ে যাওয়া হলো। তারাও হযরত মুসা আ. এবং আল্লাহপাকের মধ্যকার কথাবার্তা শুনতে পেলো। এরপর নুরের আবরণ সরে গেলো এবং মুসা আ. ও ওই নেতৃবৃন্দের মধ্যে মুখোমুখি সাক্ষাৎ হলো। ওই সরদারেরা আগের মতোই তাদের হঠকারিতার ওপর গোঁ ধরে থাকলো যে, যতক্ষণ না আমরা আল্লাহ তাআলাকে অনাবৃত অবস্থায় নিজেদের চোখে দেখবো, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ঈমান আনবো না। নির্বোধের মতো এই হঠকারিতা ও একগুঁয়েমির কারণে আল্লাহপাকের ক্রোধের উদ্রেক হলো। তিনি তৎক্ষণাৎ সরদারদের ওপর শাস্তি অবতীর্ণ করলেন : এক ভয়ঙ্কর বিদ্যুৎ, বজ্রধ্বনি ও ভূমিকম্প এসে তাদেরকে গ্রাস করলো এবং জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে দিলো। হযরত মুসা আ. এই ঘটনা দেখে অত্যন্ত কাকুতি-মিনতির সঙ্গে প্রার্থনা করলেন, হে আল্লাহ, এই নির্বোধেরা বোকামি করে ফেলেছে। সে জন্য কি আপনি আমাদের সবাইকে ধ্বংস করে দেবেন? হে আল্লাহ, আপনার অনুগ্রহে তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। আল্লাহ তাআলা হযরত মুসা আ.-এর প্রার্থনা কবুল করলেন এবং তাদের সবাইকে পুনরায় জীবন দান করলেন। এভাবে যখন তারা নতুন জীবন লাভ করে জীবিত হয়ে উঠছিলো, তারা একে অন্যের নতুন জীবন লাভ করাকে স্বচক্ষে দেখছিলো।

কুরআন মাজিদে এই ঘটনাকে ব্যক্ত করা হয়েছে এভাবে—

وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ () وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ () الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي

كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (سورة الأعراف)

'মুসা তার সম্প্রদায় থেকে সত্তর জন লোককে আমার নির্ধারিত স্থানে সমবেত হওয়ার জন্য মনোনীত করলো। তারা যখন ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হলো, তখন মুসা বললো, "হে আমার প্রতিপালক, তুমি ইচ্ছা করলে আগেই তো এদেরকে এবং আমাকেও ধ্বংস করতে পারতে! (কিন্তু তোমার দয়া ও অনুগ্রহে আমাদেরকে অবকাশ দিয়েছো।) আমাদের মধ্যে যারা নির্বোধ, তারা যা করেছে সেইজন্য কি তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করবে? এ তো শুধু তোমার পরীক্ষা, যার দ্বারা তুমি যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করো এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করো। তুমিই তো আমাদের অভিভাবক; সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা করো এবং আমাদের প্রতি দয়া করো এবং ক্ষমাশীলদের মধ্যে তুমিই তো শ্রেষ্ঠ। আমাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে নির্ধারিত করো কল্যাণ, আমরা তোমার কাছে প্রত্যাবর্তন করেছি।" আল্লাহ বললেন, "আমার শাস্তি যাকে ইচ্ছা দিয়ে থাকি আর আমার দয়া—তা তো প্রতিটি বস্তুতে ব্যাপ্ত। সুতরাং আমি তা তাদের জন্য নির্ধারণ করবো যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত প্রদান করে এবং আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে। যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মি নবীর, যার উল্লেখ তাওরাত ও ইনজিল, যা তাদের কাছে আছে তাতে লিপিব্দ্ধ পায়, যে তাদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎকাজে বাধা দে, যে তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করে এবং অপবিত্র বস্তু হারাম করে এবং যে মুক্ত তাদেরকে তাদের গুরুভার থেকে ও শৃঙ্খল[১১৭] থেকে যা তাদের ওপর ছিলো। সুতরাং যারা তার প্রতি ঈমান আনে, তাকে (সত্যের পথে) সাহায্য করে এবং যে-নুর তার (নবীর) সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে তার অনুসরণ করে তারাই সফলকাম।' [সুরা আ'রাফ : আয়াত ১৫৫-১৫৭]

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ () ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (سورة البقرة)

---

[১১৭] অর্থাৎ, কঠিন বিধানাবলি—যা পূর্ববর্তী শরিয়তে ছিলো। অথবা পরাক্রমশালী শত্রুর অত্যাচার ও পরধীনতার শৃঙ্খল।

'আর স্মরণ করো (সেই সময়ের কথা,) যখন তোমরা বলেছিলে, "হে মুসা, আমরা আল্লাহকে প্রত্যক্ষভাবে না দেখা পর্যন্ত তোমাকে কখনো বিশ্বাস করবো না", তখন তোমরা বজ্রাহত হয়েছিলে[১১৮] এবং তোমরা নিজেরাই দেখছিলে। এরপর তোমাদের মৃত্যুর পর আমি তোমাদেরকে পুনর্জীবিত করলাম[১১৯] যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো।' [সূরা বাকারা : আয়াত ৫৫-৫৬]

মৃত্যুর পরে জীবন

কুরআন মাজিদ মৃত্যুর পর জীবনের সাধারণ নিয়ম এই বলেছে যে, এই পার্থিব মৃত্যুর পরে আবার পরলোকেও পুনরায় জীবন দান করা হবে। কিন্তু বিশেষ নিয়ম এই যে, কোনো কোনো সময় প্রজ্ঞা ও কল্যাণকামিতার প্রতি লক্ষ রেখে আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়াতেই মৃতকে জীবন দান করে থাকেন। আম্বিয়ায়ে কেরামের মুজেযাময় জীবনে কুরআনের সাক্ষ্য অনুযায়ী এই সত্য কয়েকবার প্রকাশিত হয়েছে।

কুরআন মাজিদ যখন 'মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের' উল্লেখ করে, তখন তার ইঙ্গিত এই যে, কুরআন এই জীবনকে بعث বা জীবিত হয়ে ওঠা বলে ব্যক্ত করে থাকে।

সুরা বাকারার এই আয়াতেও কুরআন মাজিদ বনি ইসরাইলের নেতৃবৃন্দের মৃত্যু ও ধ্বংস এবং তাদের পুনরুজ্জীবিত হওয়াকে بعث শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছে। আর لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ যেনো 'তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো' বলে এই ঘটনার মূল সত্যকে আরো অধিক পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, ঘটনা ঘটেছিলো এই, তাদের অযৌক্তিক ও ধৃষ্টতামূলক হঠকারিতার কারণে ভূমিকম্প এসে তাদের মৃত্যু ঘটিয়ে দিলো। এরপর হযরত মুসা আ.-এর বিনীত আবেদনে আল্লাহর অসীম রহমত উদ্বেলিত হয়ে উঠলো আর ওই ভস্মীভূত লোকগুলো পুনরায় জীবন দান করলো। যেনো তারা শোকর আদায় করে এবং ভবিষ্যতে

---

[১১৮] আল্লাহকে প্রকাশ্যে দেখার দাবি জানানোয় শাস্তিস্বরূপ তাদের সত্তরজন প্রতিনিধির মৃত্যু ঘটে।

[১১৯] এরপর হযরত মুসা আ.-এর দোয়ায় আল্লাহপাক তাদেরকে পুনর্জীবিত করেছিলেন।

এমন অনর্থক হঠকারিতা ও একগুঁয়েমি না করে এবং আল্লাহর সত্যিকারের আনুগত্যশীল বান্দা হয়ে যায়।

এই বিস্তারিত বিবরণের পর সহজেই এ-কথা বোধগম্য হতে পারে যে, যে-সকল সমসাময়িক মুফাস্‌সিরগণ উল্লিখিত আয়াতের তাফসিরে 'হায়াত বা'দাল মামাত' অর্থাৎ, 'মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করা' অর্থকে এড়ানোর জন্য হালকা ও সূক্ষ্ম ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন তা সঠিক নয়। তাঁরা নির্ভরযোগ্য কোনো প্রমাণ ব্যতীতই কুরআন মাজিদের স্পষ্ট ও পরিষ্কার বর্ণনাশৈলীকে মনগড়া ব্যাখ্যার ওপর কুরবান করে দিয়েছেন।

সাধারণ রহমতের ঘোষণা

সুরা আ'রাফের আয়াত—

قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ

'আল্লাহ বললেন, আমার শাস্তি যাকে ইচ্ছা দিয়ে থাকি আর আমার দয়া—তা তো প্রতিটি বস্তুতে ব্যাপ্ত।' [সুরা আ'রাফ : আয়াত ১৫৬]

এই আয়াত কুরআন মাজিদের গুরুত্বপূর্ণ আয়াতসমূহের অন্যতম। এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে যে-আযাব আগমন করে তা বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে হয়ে থাকে। অন্যথায় আযাব প্রদান আল্লাহর সিফত বা গুণ নয়; বরং রহমতই তাঁর আদি ও অনন্ত গুণ। অর্থাৎ, তাঁর রহমত গুণটি সবার জন্য ব্যাপক। বিশ্বজগতের এমন কোনো বস্তুও নেই যা তাঁর রহমতের গুণ থেকে বঞ্চিত বা শূন্য। বরং এরূপ বলুন, 'যাকে তোমরা আল্লাহর আযাব বলছো তা তোমাদের কার্যাবলির সঙ্গে সম্পর্কের বিবেচনায় আযাব। অন্যথায় অস্তিত্বের কারখানার পূর্ণ নকশার প্রতি লক্ষ করে যদি তোমরা গভীরভাবে চিন্তা করো, তবে একেও রহমত বলে দেখতে পাবে।'

এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা বলেন—

كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ

'দয়া করা তিনি তাঁর কর্তব্য বলে স্থির করেছেন।' [সুরা আন'আম : আয়াত ১২]

আর এই ব্যাপক রহমতের পূর্ণ প্রকাশস্থল ও পূর্ণ প্রতিবিম্ব সে-মহান সত্তা, যাঁর উল্লেখ সুরা আ'রাফের ওই আয়াতে এভাবে করা হয়েছে যে, তাঁর আগমনের আগেই পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে তাঁর আগমনের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে এবং তাঁর গুণাবলি ও চারিত্রিক মাধুর্যও আলোচিত হয়েছে। অন্য এক আয়াতে তাঁকে رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ 'গোটা বিশ্বের জন্য রহমত' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[১২০]

বনি ইসরাইল ও তুর পাহাড়

যাইহোক। সত্তর জন ব্যক্তি পুনরায় জীবিত হয়ে তাদের কওমের কাছে ফিরে এলো। তারা কওমের কাছে বিস্তারিত ঘটনা তুলে ধরলো এবং বললো, মুসা আ. যা বলছেন তা সত্য। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে তিনি আল্লাহর প্রেরিত রাসুল ।

তখন সুস্থ প্রকৃতির চাহিদা তো ছিলো এই, এসব ঘটনা শুনে তাদের আল্লাহপাকের শোকর আদায় করা এবং তাঁর অনুগ্রহ ও দানের প্রাচুর্যের প্রতি লক্ষ করে তাঁর প্রতি আনুগত্য ও দাসত্বের স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে অবনত মস্তকে তাঁর যাবতীয় নির্দেশ মেনে নেয়া। কিন্তু তার পরিবর্তে অবস্থা এই হলো যে, তাদের বক্রতার ওপরই অটল থাকলো এবং তাদের নেতৃবৃন্দের সত্যায়ন সত্ত্বেও তাওরাতকে মেনে নিতে বিরোধিতামূলক ইতস্তত ভাব প্রকাশ করতে শুরু করে দিলো। তারা হযরত মুসা আ.-এর কথার প্রতি কর্ণপাত করলো না।

হযরত মুসা আ. তাদের এই অবস্থা দেখে আল্লাহর দরবারে রুজু হয়ে কওমের বিপথে চলার অভিযোগ পেশ করলেন। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ঘোষণা এলো, এসব নাফরমানদের জন্য আমি তোমাকে আরো একটি দলিল (মুজেযা) প্রদান করছি। তা এই : যে-পাহাড়ের ওপর তুমি আমার সঙ্গে কথোপকথন করো, যে-পাহাড়ের ওপর তোমার কওমের মনোনীত নেতৃবৃন্দ সত্যকে দর্শন করেছে, সে-পাহাড়কেই নির্দেশ দিচ্ছি—তা যেনো তার স্থান থেকে সরে গিয়ে বনি ইসরাইলের মাথার

---

[১২০] এই আয়াতে পূর্ণ ব্যাখ্যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনী আলোচনার সময় বলা হবে।

ওপর শামিয়ানার মতো আচ্ছন্ন হয়ে থাকে এবং তার অবস্থানগত ভাষায় ঘোষণা করে যে, মুসা আ. আল্লাহ তাআলার যথার্থ নবী। নিঃসন্দেহে তাওরাত আল্লাহ তাআলার সত্য কিতাব। যদি মুসা আ. আল্লাহর সত্য নবী এবং তাওরাত সত্য কিতাব না হতো তবে তোমরা এই মুজেযা দেখতে পেতে না। এটা একমাত্র আল্লাহ তাআলার কুদরত ব্যতীত অন্যকোনো প্রকারেই সম্ভব ছিলো না।

বস্তুত, যখনই আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিজগৎ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত হলো, তৎক্ষণাৎ তুর পাহাড় তাদের মাথার ওপর এসে স্থির হয়ে গেলো এবং তা শামিয়ানার মতো দেখা যেতে লাগলো। এই অবস্থানগত ভাষায় পাহাড়টি বলতে লাগলো, হে বনি ইসরাইল, যদি তোমাদের বিবেক ও বুদ্ধি বলতে কিছু অবশিষ্ট থাকে এবং সত্য ও মিথ্যাকে পার্থক্য করার জ্ঞান থাকে, তবে সত্য শ্রবণকারী কানের দ্বারা শোনো, আমি আল্লাহ তাআলার নিদর্শন হয়ে তোমাদেরকে বিশ্বাস প্রদান করছি এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুসা আ. আমার পিঠে আরোহণ করে কয়েকবার আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কথোপকথনের সম্মান লাভ করেছেন এবং তোমাদের সৎপথ ও হেদায়েত লাভের বিধান (তাওরাত)-ও তাঁকে প্রদান করা হয়েছে আমার পৃষ্ঠদেশের ওপর। আর হে উদাসীনতা ও অবাধ্যতায় মত্ত মানুষের দল, আমার এই অবস্থান—যা তোমাদের জন্য বিস্ময়কর হয়ে আছে—তোমাদের এই বিষয়ের সাক্ষ্য যে, যখন মানুষের বক্ষের মধ্যস্থলে অন্তরের কোমলতা কঠোরতায় রূপান্তরিত হয়ে যায় তখন তা এক খণ্ড পাথর বা তার চেয়েও কঠিন হয়ে যায় এবং কোনো দিক থেকেই তার ভেতরে হেদায়েত ও নসিহত প্রবেশ করতে পারে না। দেখো, আমি পাথরখণ্ডের সমষ্টি পাহাড়; কিন্তু আল্লাহ তাআলার আদেশের সামনে আনুগত্যের মস্তক অবনত করে কেমনভাবে দাসত্ব প্রদর্শন করছি। কিন্তু তোমরা তোমাদের আমিত্বের অহঙ্কারে কোনো অবস্থাতেই 'না'কে 'হ্যাঁ' দ্বারা বদল করতে প্রস্তুত নও।

কুরআন মাজিদ এই সত্যই প্রকাশ করছে—

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً

'এর পরও তোমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেলো, তা পাথর কিংবা তার চেয়েও কঠিন।' [সুরা বাকারা : আয়াত ৭৪]

বনি ইসরাইল যখন এই নিদর্শন দেখলো—এটাকে সাময়িক ভয়ের কারণই মনে করুন বা উপস্থিত জনসমাবেশের সামনে আল্লাহ তাআলার মহান নিদর্শনের ফলই বিশ্বাস করুন—তারা তাওরাতের দিকে ঝুঁকে পড়লো এবং হযরত মুসা আ.-এর সামনে তাওরাতের আহকাম অনুযায়ী আমল করার স্বীকৃতি জানালো। তখন আল্লাহ তাআলার আদেশ এলো, হে বনি ইসরাইল, আমি তোমাদেরকে যা-কিছু দান করলাম, তাকে দৃঢ়তার সঙ্গে গ্রহণ করো এবং তাতে যেসব আহকাম রয়েছে তা পালন করো। যেনো তোমরা পরহেযগার ও মুত্তাকি হতে পারো।

কিন্তু আফসোস! বনি ইসরাইলের ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি সাময়িক ছিলো বলে প্রতীয়মান হলো এবং তারা অধিককাল তার ওপর কর্মশীল থাকতে পারলো না। তাদের চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী পুনরায় বিরোধিতা শুরু করে দিলো। কুরআন মাজিদ এই ঘটনাগুলোকে খুবই সংক্ষেপে কিন্তু পরিষ্কার ভাষায় এভাবে ব্যক্ত করেছে—

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ () ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ

(سورة البقرة)

'স্মরণ করো (সেই সময়ের কথা,) যখন তোমাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তুর পাহাড়কে[১২১] তোমাদের ওপর উত্তোলন করেছিলাম[১২২]; বলেছিলাম, "আমি যা দিলাম দৃঢ়তার সঙ্গে তা গ্রহণ করো এবং তাতে যা আছে তা স্মরণ রাখো, যাতে তোমরা সাবধান হয়ে চলতে পারো।" এর পরেই তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে! আল্লাহর অনুগ্রহ এবং অনুকম্পা তোমাদের প্রতি না থাকলে অবশ্যই তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে।' [সুরা বাকারা : আয়াত ৬৩-৬৪]

---

[১২১] সিনাই এলাকায় অবস্থিত তুর পাহাড়, যেখানে হযরত মুসা আ. আল্লাহর সঙ্গে কথোপকথন করেছিলেন।

[১২২] হযরত মুসা আ.-এর উম্মতগণ একটি ধর্মবিধান চেয়েছিলো। তাওরাতের বিধান অবতীর্ণ হলে তারা তা মানতে অস্বীকার করে। তখন তাদের মাথার ওপর পাহাড় উত্তোলন করে তাদেরকে শাস্তি দেয়ার ভয় দেখালে তারা তা গ্রহণ করে।

وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (سورة الأعراف)

'স্মরণ করো (সেই সময়ের কথা,) যখন আমি পর্বতকে তাদের উপরে উত্তোলন করি, আর তা ছিলো যেনো এক চন্দ্রাতপ (শামিয়ানা)। তারা মনে করলো যে, তা তাদের ওপর পড়ে যাবে। বললাম, "আমি যা দিলাম তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং তাতে যা আছে তা স্মরণ করো। যাতে তোমরা মুত্তাকি (তাক্ওয়ার অধিকারী) হও।"' [সুরা আ'রাফ : আয়াত ১৭১]

এসব আয়াতে পরিষ্কার বর্ণিত আছে যে, বনি ইসরাইলগণ যখন তাওরাতকে গ্রহণ করতে ইতস্তত করলো, বরং অস্বীকারই করে বসলো, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের মাথার ওপর তুর পাহাড়কে তুলে ধরলেন এবং এভাবে আল্লাহর প্রত্যক্ষ নিদর্শন দেখিয়ে তাদেরকে তাওরাত কবুল করার জন্য প্রস্তুত করলেন। সুতরাং আয়াতগুলোর পরিষ্কার ও স্পষ্ট অর্থকে মনগড়া ব্যাখ্যার দিকে টেনে নেয়ার কোনোই কারণ থাকতে পারে না। যেমন : সমসাময়িক যুগের কোনো কোনো মুফাস্সির এমন ব্যাখ্যা করেছেন।

কোনো পাহাড় সমূলে উৎপাটিত হয়ে শূন্যস্থানে ঝুলে থাকা জ্ঞানের দিক থেকেও অসম্ভব নয় এবং আল্লাহ তাআলার কুদরতের বিধানেরও বিরোধী নয়। অবশ্য অসাধারণ ও অস্বাভাবিক ব্যাপার নিশ্চয়ই। এ-কারণেই আল্লাহ তাআলার কুদরতের নিদর্শন হওয়ার উপযুক্ত। কিন্তু অপব্যাখ্যাকারীরা বলে, رفع শব্দের অর্থ শুধু উঁচু করা। মাথার ওপর তুলে ধরা নয়। আর একইভাবে نتق শব্দের অর্থ হয় যেমন সমূলে উৎপাটন করা, তেমনি কম্পিত হওয়ার অর্থও হয় এবং ভীষণভাবে নাড়াচাড়া করার অর্থও হয়। সুতরাং সুরা আ'রাফের আয়াতটির অর্থ এই হয় যে, আর যখন আমি তাদের ওপর পাহাড়কে কম্পিত করলাম, যেনো তা শামিয়ানা, (যা বায়ুর ঝাপটায়) নড়ছে, আর তারা (ভীষণ) ভয়ে মনে করছিলো যে, পাহাড় তাদের মাথার ওপর এসে পতিত হবে....।[১২৩]

---

[১২৩] তরজুমানুল কুরআন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪১।

কিন্তু এসব লোক এই সত্যকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে বসেছেন যে, رفع এবং نتق শব্দ দুটির যদিও কয়েকটি অর্থ রয়েছে, কিন্তু আরবি ভাষার নিয়ম অনুসারে এখানে যে-সঙ্কেত পাওয়া যাচ্ছে, সে-অনুসারেই অর্থ গ্রহণ করতে হবে। বিশেষত, কুরআন মাজিদের এক অংশ অপর অংশের ব্যাখ্যা করে থাকে। সুতরাং কোনো শব্দের অর্থ থেকে সে-অর্থই গ্রহণ করতে হবে যা অন্য আয়াতের দ্বারা নির্দিষ্ট হয়।

অতএব, সুরা বাকারা وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ আয়াতে رفع (উত্তোলন করা) এবং فَوْقَ (উপরে) শব্দ দুটিকে যখন সুরা আ'রাফের وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ আয়াতে نتق (সমূলে উৎপাটিত করা)-এর সঙ্গে মেলানো হবে, তখন কুরআন মাজিদের এই আয়াতগুলোর স্পষ্ট ও পরিষ্কার অর্থ এটাই হবে যে, তুর পাহাড়কে স্থানচ্যুত করে বনি ইসরাইলিদের মাথার ওপর এমনভাবে ধরা হয়েছিলো যেনো তা একটি শামিয়ানা যা শিগগিরই তাদের ওপর পতিত হবে। তা ছাড়া رفع-এর সঙ্গে فَوْقَ শব্দটি নিয়ে আসাই এই তাফসির বিশুদ্ধ হওয়ার শক্তিশালী প্রমাণ যা জমহুর মুফাস্‌সিরগণ করেছেন। তার বিপরীতে সমসাময়িক মুফাস্‌সিরগণের কৃত তাফসির পরিষ্কার বলছে যে, এই অর্থটি কুরআন মাজিদের মূল বক্তব্যের বিপরীতে টেনে-খিঁচে করা হয়েছে।

এখানে এমন সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে যে, এই দুটি আয়াত দ্বারা বুঝা যায় তাওরাতের বিধান অনুযায়ী আমল করার জন্য বনি ইসরাইলের ওপর জবরদস্তি ও বল প্রয়োগ করা হয়েছিলো। অথচ ধর্মে বল প্রয়োগ ও জবরদস্তি বৈধ নয়। কিন্তু কুরআন মাজিদের পূর্বের ও পরের আয়াতগুলোর প্রতি গভীরভাবে লক্ষ করলে ঘটনাগুলোর অবস্থা আমরা যেমন বর্ণনা করেছি, তেমন অবস্থায় এমন সন্দেহ উৎপন্ন হতে পারে না। অবশ্য জমহুর মুফাস্‌সিরগণ এবং আধুনিক যুগের মুফাস্‌সিরগণের তাফসির থেকে এমন সন্দেহের উৎপাদন হয়।

তবে মুফতি মুহাম্মদ আবদুহু তার তাফসিরে এর উত্তম জবাব প্রদান করেছেন। তার সারমর্ম এই : আসলে তা জবরদস্তি ও বলপ্রয়োগের ব্যাপরই ছিলো না; বরং আল্লাহ তাআলার কুদরতের শেষ নিদর্শন প্রকাশ করা হয়েছিলো এবং তা করা হয়েছিলো তাদের পথপ্রদর্শন ও

হেদায়েতকে শক্তিশালী ও দৃঢ় করার জন্য। আর এ-কারণে এই ঘটনা প্রতিশ্রুতি ও প্রতিজ্ঞা গ্রহণের পরে ঘটেছিলো। কুরআন মাজিদের আয়াতগুলোর পূর্বাপর সম্পর্ক থেকে এটাই বুঝা যায়।

মুজেযার আধিক্য

এখানে এ-কথাও ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, পেছনের পাতাগুলোতে এ-কথা উত্তমরূপে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, কয়েক শতাব্দীব্যাপী দাসত্বের জীবনযাপন এবং নীচু ধরনের সেবায় নিযুক্ত থাকার কারণে বনি ইসরাইলের উন্নত মাপের স্বভাব ও গুণাবলির মধ্যে ঘুণ ধরেছিলো। মূর্তিপূজক মিসরীয়দের মধ্যে বসবাস করার ফলে বস্তুবাদ ও মূর্তিপূজা তাদের জ্ঞান ও বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলোকে এমন পর্যায়ে অকর্মণ্য করে দিয়েছিলো যে, তারা পদে পদে আল্লাহ তাআলার একত্বের প্রতি বিশ্বাস এবং তাঁর নিদের্শাবলি পালনে মুজেযার অপেক্ষা করতো। এ-ছাড়া তাদের হৃদয়ে বিশ্বাস ও একিনের কোনো স্থানই হতো না। তাদের হেদায়েত ও সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য দুটি উপায় হতে পারতো : একটি এই যে, বিভিন্ন প্রকারে তাদেরকে বুঝিয়ে সত্য গ্রহণ করার জন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা এবং প্রাচীনকালের আম্বিয়ায়ে কেরামের উম্মতগণের মতো শুধু কোনো বিশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে মুজেযা প্রদর্শন করা। দ্বিতীয় উপায় হলো এই : কয়েকর শতাব্দীর ভঙ্গুর অবস্থাকে সংশোধনের জন্য তড়িঘড়ি করে আধ্যাত্মিক শক্তি প্রকাশ করা এবং সত্য ও সততার দীক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তাআলার কুদরতের নিদর্শনসমূহ (মুজেযা) বার বার প্রকাশ করা, যা যাদের সত্য গ্রহণের যোগ্যতাকে শক্তিশালী করে। ফলে, বনি ইসরাইল সম্প্রদায়ের হীনমন্যতা ও নষ্টভ্রষ্ট অবস্থার প্রতি লক্ষ করে তাদের সংশোধন ও শিক্ষার জন্য আল্লাহ তাআলার হেকমত ও মুসলেহত (প্রজ্ঞা ও কল্যাণকামিতা) এই দ্বিতীয় উপায়টিই অবলম্বন করেছে।

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

'আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।'

যাইহোক। এই ঘটনা তাওরাতেও বর্ণিত হয়েছে এবং তাতে তুর পর্বত সম্পর্কে তা-ই বলা হয়েছে যা আমাদের আধুনিক যুগের মুফাস্সিরগণ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন।

তাওরাতে ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে এভাবে—
“তৃতীয় দিন এলে ভোর থেকেই মেঘের গর্জন ও বিদ্যুতের চমক শুরু হয়ে গেলো এবং কালো বর্ণের মেঘ এসে তুর পাহাড়কে আচ্ছন্ন করে ফেললো। শিঙার আওয়াজ অত্যন্ত উচ্চ হয়ে উঠলো। সব মানুষ তাদের নিজ নিজ বাসস্থানে কেঁপে উঠলো। মুসা আ. সব লোককে তাঁবু থেকে বাইরে নিয়ে এলেন এই উদ্দেশ্যে যে, তাদেরকে আল্লাহর সঙ্গে মেলাবেন। হযরত মুসা আ. পাহাড় থেকে নিচে নেমে দাঁড়ালেন। সাইনা পর্বত উপর থেকে নিচ পর্যন্ত ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেলো। কেননা, আল্লাহ তাআলা জ্যোতিতে আবৃতি হয়ে তাতে অবতরণ করলেন আর ধোঁয়া তন্দুরের ধোঁয়ার মতো উপরের দিকে উঠছিলো। গোটা পাহাড় প্রবল বেগে নড়ছিলো। হযরত মুসা আ. নিচে নেমে লোকদের কাছে গেলেন এবং এই কথাগুলো তাদেরকে বললেন।”[১২৪]

পবিত্র ভূমির প্রতিশ্রুতি ও বনি ইসরাইল

তখন সাইনার যে-প্রান্তরে বনি ইসরাইল অবস্থান করছিলো তা ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডের নিকটবর্তী ছিলো। বনি ইসরাইলের পূর্বপুরুষ হযরত ইবরাহিম আ., হযরত ইসহাক আ. এবং হযরত ইয়াকুব আ.-এর সঙ্গে আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুতি ছিলো যে, তাঁদের বংশধরগণকে পুনরায় ওই ভূখণ্ডের মালিক বানিয়ে দেবেন এবং তারা ওখানেই বৃদ্ধি ও বিস্তার লাভ করবে। এ-কারণে হযরত মুসা আ.-এর মারফতে আল্লাহপাকের আদেশ হলো, “তাদেরকে বলো, তারা যেনো পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করে এবং ওখানকার অত্যাচারী ও উৎপীড়ক শাসকদেরকে বের করে দিয়ে ন্যায় ও ইনসাফের সঙ্গে জীবনযাপন করতে থাকে। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, জয় অবশ্যই তোমাদেরই হবে। আর তোমাদের অত্যাচারী শত্রু পরাভূত হবে।”

হযরত মুসা আ. বনি ইসরাইলকে পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করার জন্য প্রস্তুত করার পূর্বে বারোজন ব্যক্তিকে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য পাঠালেন। তারা ফিলিস্তিনের নিকটবর্তী ‘আরিহা’ শহরে প্রবেশ করে সব অবস্থা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলো। ফিরে এসে তারা হযরত মুসা

---

[১২৪] নিষ্ক্রমণ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১৯, আয়াত ১৫-১৬।

আ.-কে বললো, 'ওখানকার অধিবাসীরা অত্যন্ত বিশাল দেহী, শক্তিশালী ও দুর্দান্ত।'
হযরত মুসা আ. তাদেরকে বললেন, তোমরা তাদের সম্পর্কে আমাকে যেসব কথা বললে কওমের কাছে সেসব কথা বলো না। এইজন্য যে, দীর্ঘদিনের দাসত্বের জীবন তাদেরকে সাহসশূন্য করে দিয়েছে এবং তাদের মধ্যে বীরত্ব, আত্মমর্যাদাবোধ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার জায়গায় কাপুরুষতা, নীচাশয়তা ও সাহসহীনতা এসে স্থান করে নিয়েছে।" কিন্তু এই বারোজনও তো সেই বনি ইসরাইলেরই লোক ছিলো; তারা হযরত মুসা আ.-এর কথা মানলো না এবং চুপে চুপে কওমের কাছে শত্রুদের ক্ষমতা ও শক্তির কথা খুব বাড়িয়ে ও অতিরঞ্জিত করে বর্ণনা করলো। অবশ্য কেবল দুইজন—ইউশা বিন নুন (يوشع بن نون) ও কালিব বিন ইউকান্নাহ (كالب بن يوقنا)—হযরত মুসা আ.-এর আদেশ যথার্থভাবে পালন করলেন। তাঁরা বনি ইসরাইলের কাছে এমন কোনো কথা বললেন না যাতে তাদের মনোবল ভেঙে যেতে পারে।
তখন হযরত মুসা আ. বনি ইসরাইলকে বললেন, তোমরা এই জনপদে (আরিহায়) প্রবেশ করো এবং শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করে তা দখল করো। আল্লাহ তাআলা তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন।
এই ঘটনা কুরআন মাজিদে বিবৃত হয়েছে এভাবে—

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ () يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ (سورة المائدة)

'স্মরণ করো (সেই সময়ের কথা,) যখন মুসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিলো, "হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো যখন তিনি তোমাদের মধ্য থেকে নবী করেছিলেন এবং তোমাদেরকে রাজ্যের অধিপতি করেছিলেন এবং বিশ্বজগতে কাউকে যা দেন নি তা তোমাদেরকে দিয়েছিলেন। হে আমার সম্প্রদায়,

আল্লাহ তোমাদের জন্য যে-পবিত্র ভূমি[১২৫] নির্দিষ্ট করে দিয়েছে তাতে তোমরা প্রবেশ করো এবং পশ্চাদ্‌পসরণ করো না, করলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।' [সুরা মায়েদা : আয়াত ২০-২১]

বনি ইসরাইল এই কথা শুনে বললো, হে মুসা, ওখানে তো এক জালিম ও দুর্দান্ত সম্প্রদায় বসরাস করছে। তারা ওই জনপদ থেকে বের হওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা তাতে প্রবেশ করবো না। আফসোস, নির্বোধ হতভাগারা এ-কথা চিন্তা করলো না যে, আমরা যতক্ষণ না সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে তাদেরকে ওখান থেকে বের করবো, তার আগ পর্যন্ত তারা ওখান থেকে কেনো বের হবে?

কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে—

قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ (سورة المائدة)

'তারা বললো, "হে মুসা, সেখানে এক দুর্দান্ত সম্প্রদায় (আমালিকা গোষ্ঠী) রয়েছে এবং তারা ওই স্থান থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত আমরা কখোনই ওখানে কিছুতেই প্রবেশ করবো না; তারা ওই স্থান থেকে বের হয়ে গেলেই আমার প্রবেশ করবো।"' [সুরা মায়েদা : আয়াত ২২]

তাদের অবস্থা দেখে ইউশা ও কালিব কওমকে উৎসাহ ও সাহস প্রদান করে বললেন, শহরের ফটক অতিক্রম করা কোনো কঠিন কাজ নয়। এগিয়ে যাও এবং তাদের মোকাবিলা করো। আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে, তোমরাই বিজয়ী হবে।

এ-ব্যাপারে কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে—

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (سورة المائدة)

'যারা ভয় করছিলো তাদের মধ্য থেকে দুইজন—যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন—বললো, "তোমরা তাদের মোকাবিলা করে দ্বারে প্রবেশ করো, প্রবেশ করলেই তোমরা জয়ী হবে এবং তোমরা মুমিন হলে আল্লাহ তাআলার ওপরই নির্ভর করো।" [সুরা মায়েদা : আয়াত ২৩]

---

[১২৫] পবিত্র ভূমি অর্থাৎ, তৎকালীন শাম (বর্তমানে সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও জর্ডানের কিছু

কিন্তু বনি ইসরাইলের ওপর এ-কথারও কোনো ক্রিয়া হলো না। তারা আগের মতোই নিজেদের অস্বীকৃতির ওপরই গোঁ ধরে থাকলো। আর যখন হযরত মুসা আ. খুব জোর দিয়ে বললেন, তখন তারা নিজেদের অস্বীকৃতির ওপর হঠকারিতা করে বললে লাগলো—

قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ (سورة المائدة)

'তারা বললো, "হে মুসা, তারা যতদিন ওখানে থাকবে ততদিন আমরা ওখানে প্রবেশ করবোই না; সুতরাং তুমি এবং তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ করো, আমরা এখানেই বসে থাকবো। (বসে বসে তামাশা দেখবো।)"' [সুরা মায়েদা : আয়াত ২৪]

হযরত মুসা আ. তাদের এই নিকৃষ্ট ও অনর্থক জবাব শুনে অত্যন্ত মর্মাহত ও উদ্বিগ্ন হলেন। চরম মনঃকষ্ট ও বিরক্তির সঙ্গে আল্লাহর দরবারে আরজ করলেন, হে আল্লাহ, আমার নিজের ও হারুনের ওপর ব্যতীত আমার আর কারো ওপর ক্ষমতা নেই। সুতরাং আমরা দুইজন উপস্থিত আছি। আপনি এখন আমাদের মধ্যে এবং এই নাফরমান কওমের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিন। তারা খুবই অপদার্থ। আল্লাহ তাআলা হযরত মুসা আ.-এর ওপর ওহি নাযিল করলেন, "দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ো না। তাদের নাফরমানি ও অবাধ্যতার কোনো দায়িত্বই তোমার ওপর নেই। এখন আমি তাদের জন্য এই শাস্তি নিধারণ করে দিলাম যে, তারা চল্লিশ বছর পর্যন্ত এই প্রান্তরেই ঘুরে বেড়াবে। তাদের ভাগ্যে কখনো পবিত্র ভূখণ্ডে প্রবেশ করা হবে না। পবিত্র ভূখণ্ডকে আমি তাদের জন্য হারাম করে দিলাম।"

এই ঘটনা কুরআন মাজিদে বর্ণিত হয়েছে এভাবে—

قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ () قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (سورة المائدة)

'মুসা বললো, "হে আমার প্রতিপালক, আমার ও আমার ভাই ব্যতীত আর কারো ওপর আমার আধিপত্য নেই। সুতরাং তুমি আমাদের ও সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের মধ্যে ফয়সালা করে দাও।" আল্লাহ বললেন, তবে তা চল্লিশ বছর তাদের জন্য নিষিদ্ধ করে দেয়া হলো, তারা

পৃথিবীতে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে। সুতরাং তুমি সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করো না।"' [সুরা মায়েদা : আয়াত ২৫-২৬]

সাইনা প্রান্তরকে তীহ (تيه) বলা হয় এ-কারণে যে, কুরআন মাজিদ বনি ইসরাইলের উদ্দেশে বলেছে— سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ (তারা পৃথিবীতে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে।) কোনো ব্যক্তি পথ ভুলে এদিক সেদিক ঘুরতে থাকলে আরবি ভাষায় বলা হয়— تاه فلان (অমুক ব্যক্তি পথ ভুলে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে।) সুতরাং تيه শব্দের অর্থ বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ানো।

তাওরাতে এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই পদ্ধতিতে বর্ণিত হয় নি। তারপরও গণনা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১৪-এ পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করতে বনি ইসরাইলের অস্বীকৃতি, তার কারণে হযরত মুসা আ.-এর অসন্তোষ, তারপর চল্লিশ বছর পর্যন্ত পবিত্র ভূমিতে তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়া বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাওরাতে এটাও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "এই সময়সীমার মধ্যে ওই মানুষসকল মৃত্যুমুখে পতিত হবে যারা আল্লাহ তাআলার আদেশ লঙ্ঘন করেছিলো এবং পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলো। তাদের পরে নতুন বংশধরদের জন্য প্রবেশের অনুমতি হবে। তারা কালিব ও ইউশার নেতৃত্বে শত্রুদলকে পর্যুদস্ত করে পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করবে। তা ছাড়া ততদিনে হযরত মুসা আ. ও হযরত হারুন আ. ইন্তেকাল করবেন।

তাওরাতের বর্ণনা নিম্নরূপ :

"এরপর আল্লাহ তাআলা মুসা ও হারুন আ.-কে সম্বোধন করে বললেন, এই নিকৃষ্ট জাতির মোকাবিলায়—যারা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে—আমি আর কতদিন ধৈর্য ধারণ করবো? বনি ইসরাইল আমার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ করেছে আমি তাদের অভিযোগসমূহ শ্রবণ করেছি। তাদেরকে বলো, আল্লাহপাক বলছেন, "আমার জীবনের কসম, তোমরা আমাকে যেমন শুনিয়ে বলেছো, আমি তোমাদের সঙ্গে তেমনই করবো। তোমাদের এবং ওইসব লোকের যাদেরকে তোমাদের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা হয়েছে, সামগ্রিকভাবে তাদের মধ্যে রয়েছে বিশ থেকে তদোর্ধ্ব বয়সের লোক, যারা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে—সকলের মৃতদেহ এই প্রান্তরেই পতিত হবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই

যে, তোমরা সেই পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করতে পারবে না, যার সম্পর্কে আমি কসম খেয়েছিলাম যে, তোমাদেরকে ওখানে বসবাস করতে দেবো। অতএব, আলফিনার পুত্র কালিব ও নুনের পুত্র ইয়াশু এবং তোমাদের পুত্রদেরকে—যাদের সম্পর্কে তোমরা বলছো যে তারা লুণ্ঠিত হবে—আমি পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করাবো। যে-ভূমির মর্যাদাকে তোমরা হীন মনে করছো, তারা তার মর্যাদা বুঝবে। আর তোমাদের লাশ এই প্রান্তরেই পতিত থাকবে। আর তোমাদের সন্তানেরা তোমাদের ঘুরে বেড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে চল্লিশ বছর পর্যন্ত এই ময়দানে ইতস্তত ঘুরে বেড়াবে, যতক্ষণ না তোমাদের মৃতদেহসমূহ এই প্রান্তরে হেজেমজে যায়। ওই দিনগুলো—যাতে তোমরা পবিত্র ভূমির অনুসন্ধানে লিপ্ত থাকবে—সংখ্যা অনুসারে হবে চল্লিশ দিন। আর এক-এক দিনের পরিমাণ হবে এক-এক বছর। সুতরাং তোমরা চল্লিশ বছর পর্যন্ত তোমাদের পাপের বোঝা বহন করতে থাকবে। তখন তোমরা আমার সঙ্গে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের ফল জানতে পারবে।"[১২৬]

এখানে এ-ধরনের সন্দেহ করা উচিত নয় যে, হযরত মুসা ও হারুন আ.-কেও এই প্রান্তরে থাকতে হলো এবং তাঁরাও পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করতে পারলেন না। কেননা, বনি ইসরাইলের এই গোটা কাফেলার ওপর পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছিলো। সুতরাং, তখন অবশ্য কর্তব্য ছিলো তাদের নসিহত ও হেদায়েতের জন্য আল্লাহর নবী তাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকা, যাতে এই বৃদ্ধেরাও আল্লাহর পথে প্রতিষ্ঠিত থাকে। আর নতুন বংশধরদের মধ্যে সেই যোগ্যতাও সৃষ্টি হয় যার ফলে তারা পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করে আল্লাহর আদেশ পালন করতে পারে।

গাভী জবাইয়ের ঘটনা

একবার বনি ইসরাইলের মধ্যে এক ব্যক্তি নিহত হলো। কিন্তু হত্যাকারীর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিলো না। অবশেষে তা অপবাদের রূপ ধারণ করলো এবং পারস্পরিক মতভেদের কারণে এক ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি হলো। এই ঘটনা যখন হযরত মুসা আ.-এর সামনে পেশ করা

[১২৬] তাওরাত : গণনা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১৪, আয়াত ২৬-৩০

হলো তখন তিনি আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করলেন এবং নিবেদন করলেন, “হে আল্লাহ, এই ঘটনা কওমের মধ্যে ভীষণ মতানৈক্যের সৃষ্টি করেছে। আপনি মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়। আমাকে সাহায্য করুন।”

আল্লাহ তাআলা হযরত মুসা আ.-কে বললেন, “তাদেরকে প্রথমে একটি গাভী জবাই করতে বলো। তারপর জবাইকৃত গাভীর দেহের কোনো একটি অংশ দ্বারা মৃত ব্যক্তির দেহ স্পর্শ করবে। তারা এই কাজ করামাত্র আমি নিহত ব্যক্তিকে জীবন দান করবো, তখন ব্যাপারটি স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়ে যাবে।”

হযরত মুসা আ. বনি ইসরাইলকে গাভী জবাই করতে বললেন। কিন্তু তারা বক্র স্বভাব এবং কাজ না করার ফন্দি অন্বেষণের চরিত্রের কারণে বিতর্ক শুরু করে দিলো, “মুসা, তুমি কি আমাদের সঙ্গে বিদ্রূপ করছো? নিহত ব্যক্তির ঘটনার সঙ্গে গাভী জবাই করার সম্পর্ক কী? আচ্ছা, বাস্তবিকই যদি তা আল্লাহর আদেশ হয়ে থাকে, তবে বলো ওই গাভীটি কেমন হতে হবে? তার গায়ের রঙ কী? কিন্তু বিস্তারিত বিবরণ জানা আবশ্যক। কারণ এখন পর্যন্ত আমরা তার নির্দিষ্টতা সম্পর্কে অস্পষ্ট ও সন্দেহজনক অবস্থায় রয়েছি।”

আল্লাহ তাআলা ওহির মাধ্যমে মুসা আ. বনি ইসরাইলকে তাদের সব প্রশ্নের জবাব দিলেন। যখন তাদের আর কোনো ফন্দি আঁটার সুযোগ থাকলো না। তখন তারা নির্দেশ পালনের জন্য প্রস্তুত হলো। আল্লাহর ওহি অনুযায়ী তারা বিষয়টির সমাধা করলো। আল্লাহর আদেশে উল্লিখিত নিহত ব্যক্তি জীবিত হয়ে গেলো এবং হত্যার পূর্ণ ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করলো। অনুমান করি, আল্লাহ-প্রদত্ত এই বিস্ময়কর নিদর্শন যখন সত্য ঘটনাটিকে উন্মোচিত করে দিলো, তখন হত্যাকারীরও অপরাধ স্বীকার না করে কোনো উপায় থাকলো না। এভাবে কেবল হত্যাকারীরই সন্ধান পাওয়া গেলো না; বরং বনি ইসরাইলের বিভিন্ন গোত্র ও বংশের মধ্যে যে-মতভেদের সৃষ্টি হয়ে গৃহকলহ ও রক্তপাতের সৃষ্টি হতে যাচ্ছিলো, উত্তমরূপে তারও অবসান ঘটে।

আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাইলের এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে দুটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। একটি হলো এই : পরলোক অবিশ্বাসকারীদের উদ্দেশে বলেছেন, যে-কওমের পূর্বপুরুষদের মধ্যে এই ঘটনা ঘটেছে, তারা আজ পর্যন্ত এই ঐতিহাসিক

ঘটনার সাক্ষী রয়েছে। তখন আল্লাহ তাআলা যেভাবে মৃতকে জীবিত করে তাঁর কুদরত প্রদর্শন করেছেন, তোমরা অনুধাবন করো, কিয়ামতের দিনেও একইভাবে তিনি মৃতদেরকে জীবন দান করবেন।

كَذٰلِكَ يُحْيِي اللّٰهُ الْمَوْتٰى

"আর এভাবেই আল্লাহ তাআলা মৃতদেরকে জীবন দান করে থাকেন।"

দ্বিতীয় বিষয় হলো বনি ইসরাইলের উদ্দেশে এ-কথা বলে দেয়া যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে অর্থাৎ, তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এত অধিক সংখ্যক মুজেযা প্রদান করেছেন যে, যদি অন্যকোনো কওমের সামনে এসব মুজেযা প্রদান করা হতো, তাহলে তারা চিরতরে আল্লাহ তাআলার অনুগত বান্দা হয়ে যেতো এবং তাদের অন্তরে এক মুহূর্তের জন্যও নাফরমানির কল্পনা উদিত হতো না। কিন্তু তোমাদের ও তোমাদের পূর্বপুরুষদের ওপর তো কোনো ক্রিয়াই হলো না। আর যদি হয়েই থাকে তবে তা নিতান্তই অস্থায়ী এবং নিষ্ক্রিয়ই প্রমাণিত হয়েছে। আর আজো যদি তোমরা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবিশ্বাস করো এবং তাঁর বিরোধিতা করতে থাকো, তবে তা তোমাদের জন্মগত ও প্রাচীন একগুঁয়েমি ও মূর্খতারই ফল।

কুরআন মাজিদ এই ঘটনা সম্পর্কে আমাদেরকে কেবল এতটুকু বলেছে এবং এর চেয়ে অধিক বিস্তারিত বিবরণ আর কিছুই বলে নি—

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ () قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ () قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ () قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ () قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ () وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ () فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (سورة البقرة)

'স্মরণ করো (সেই সময়ের কথা,) যখন মুসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিলো, "আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গরু জবাইয়ের আদেশ দিয়েছেন।"[১২৭] তারা বলেছিলো, "তুমি কি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছো?" মুসা বললো, "আল্লাহর শরণাপন্ন হচ্ছি, যাতে আমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না হই।"(অর্থাৎ, আমি বলছি যে, এটা কোনো বিদ্রূপ নয়।) তারা বললো, "আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে বলো তা কীরূপ?" মুসা বললো, "আল্লাহ বলছেন, তা এমন গরু যা বৃদ্ধও নয়, অল্পবয়স্কও নয়—মধ্যবয়সী। সুতরাং তোমরা যা আদিষ্ট হয়েছে তা করো।" তারা বললো, "আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে বলো তার রং কী?" মুসা বললো, "আল্লাহ বলছেন, তা হলুদ বর্ণের গরু, তার রং উজ্জ্বল গাঢ়, যা দর্শকদেরকে আনন্দ দেয়।" তারা বললো, "আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে বলো তা কোন্‌টি? আমরা গরুটি সম্পর্কে সন্দেহে পতিত হয়েছি এবং আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিশ্চয় আমরা দিশা পাবো।" মুসা বললো, "তিনি বলছেন, তা এমন গরু যা জমি-চাষে ও ক্ষেতে পানি সেচের জন্য ব্যবহৃত হয় নি—সুস্থ, নিখুঁত।" তারা বললো, "এখন তুমি সত্য এনেছো।" যদিও তারা জবাই করতে উদ্যত ছিলো না তবুও তারা ওটাকে জবাই করলো। স্মরণ করো (সেই সময়ের কথা,) যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে এবং একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করছিলে—তোমরা যা গোপন রাখছিলে আল্লাহ তা ব্যক্ত করছেন। আমি বললাম, "এর (জবাইকৃত গরুর) কোনো অংশ দ্বারা ওকে (মৃত ব্যক্তিকে) আঘাত করো।" (তাতেই নিহত ব্যক্তি জীবিত হয়ে তার হত্যাকারীর নাম বলে দেবে।) এইভাবে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং তাঁর নিদর্শন তোমাদেরকে দেখিয়ে থাকেন, যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পারো।' [সুরা বাকারা : আয়াত ৬৭-৭৩]

সহিহ হাদিসে বর্ণিত আছে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "যদি বনি ইসরাইলিরা হযরত মুসা আ.-এর বলার

---

[১২৭] বনি ইসরাইলের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছিলো। তার হত্যাকারী কে তা জানা যাচ্ছিলো না। তখন আল্লাহ তাআলার নির্দেশ মুসা আ. তাদেরকে একটি গরু জবাই করে তার এক খণ্ড গোশত দিয়ে নিহত ব্যক্তির দেহে আঘাত করতে বললেন। তারা আদেশমত কাজ করলে নিহত ব্যক্তিটি জীবিত হয়ে ওঠে এবং হত্যাকারীর নাম বলে পুনরায় মারা যায়।

সঙ্গে সঙ্গে গাভী জবাই করার আদেশটি পালন করতো, তবে তাদের গাভীর ব্যাপারে কোনো প্রকারের শর্ত ও বন্ধন থাকতো না। তারা যে-কোনো প্রকারের একটি গাভী জবাই করলেই আদেশ পালন হয়ে যেতো। কিন্তু তারা অনর্থক প্রশ্ন করে নিজেদের ওপর কঠোরতা বৃদ্ধি করলো।" যেমন : কুরআন মাজিদ আল্লাহর নবীর সঙ্গে এমন এমন অনর্থক কথাবার্তা বলা এবং কূটতর্ক করার কঠোর নিন্দা করেছে এবং বলেছে যে, এর শেষফল কুফরি ও বে-মান হওয়া পর্যন্ত গিয়ে সমাপ্ত হয়। সুতরাং মুসলমান উম্মতগণের জন্য এ-জাতীয় কথাবার্তা থেকে আত্মরক্ষা করা একান্ত কর্তব্য। যেমন : কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে—

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (سورة البقرة)

'তেমারা কি তোমাদের রাসুলকে তেমন প্রশ্ন করতে চাও যেমন পূর্বে মুসাকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো? এবং যে-কেউ ঈমানের পরিবর্তে কুফরি গ্রহণ করে সে পথ হারায়।' [সুরা বাকারা : আয়াত ১০৮]

এখানে অবশ্যই একটি প্রশ্ন সামনে এসে পড়ে যে, গাভী জবাই করা এবং নিহত ব্যক্তিকে জীবিত করে দেয়ার মধ্যে কী সামঞ্জস্য, যার ফলে নিহত ব্যক্তিকে জীবিত করে দেয়ার জন্য এই বিশেষ উপায়টি অবলম্বন করা হলো? এই প্রশ্নের জবাব এই যে, আল্লাহ তাআলার হেকমত ও মুসলেহত (প্রজ্ঞা ও কল্যাণকামিতা) অবগত হওয়ার তো মানবক্ষমতার বহির্ভূত। তবুও জ্ঞান ও বিবেকের যে-আলো তিনি মানুষকে দান করেছেন তা এই রহস্য উদ্‌ঘাটন করছে যে, এই কিতাবের পূর্বের পাতাগুলোতে লিখিত বনি ইসরাইলের ইতিহাসের প্রতি লক্ষ করলে এ-কথা অতি সহজে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মিসরে অবস্থান ও বসবাস করা তাদের মধ্যে মূর্তিপূজা বিশেষ করে গাভীর শ্রেষ্ঠত্ব ও পবিত্রতা এবং গো-বৎস পূজার প্রেরণা সৃষ্টি করে দিয়েছিলো। যা পদে পদে উথলে উঠতো এবং তাদের ওপর অপক্রিয়া করতো। যেমন : গো-বৎস পূজার ঘটনাটির পরে যখন মুসা আ. তাদেরকে তাওরাতের নির্দেশাবলি পালন করতে বললেন, তখনও তারা যথেষ্ট টালবাহানার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলো। তখন যদি তুর পাহাড়কে তাদের মাথার ওপর তুলে ধরার মুজেযাটি প্রকাশ না করা হতো তাহলে তারা হযরত মুসা আ.-কে মিথ্যা

প্রতিপাদনের জন্যই উঠে-পড়ে লাগতো এবং এটা বিচিত্র কিছু হতো না। আল্লাহপাক এ-ক্ষেত্রে বলেছেন, ওই গো-বৎস পূজাই তাদের অবাধ্যতা ও টালবাহানার স্বভাবের কারণ। তখনো পর্যন্ত তাদের অন্তর থেকে মূর্তিপূজা ও গো-বাছুরের পবিত্রতার বিশ্বাস দূরীভূত হয় নি; বরং তাদের অবস্থা এমনটা অনুমান করা হয় যে, গো-বাছুরের পবিত্রতার বিশ্বাস তাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে বদ্ধমূল হয়ে গেছে।

কুরআন মাজিদ এ-বিষয়ে বর্ণনা করছে—

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (سورة البقرة)

স্মরণ করো (সেই সময়ের কথা,) যখন তোমাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তুরকে তোমাদের ওপর উত্তোলন করেছিলাম। বলেছিলাম, "যা দিলাম তা দৃঢ়রূপে গ্রহণ করো ও শ্রবণ করো।" তারা বলেছিলো, "আমরা শ্রবণ করলাম ও অমান্য করলাম।"[১২৮] কুফরির কারণে তাদের হৃদয়ে গো-বৎসের প্রেম সিঞ্চিত হয়েছিলো । বলো, "যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকে, তবে তোমাদের ঈমান যা-কিছুর নির্দেশ দেয় তা কত নিকৃষ্ট!"' [সূরা বাকারা : আয়াত ৯৩]

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ

'এবং নিশ্চয় মুসা তোমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণসহ এসেছে। এরপর তার প্রস্থানের পর তোমার গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিলে। আর তোমরা তো জালিম।' [সুরা বাকারা : আয়াত ৯২]

সুতরাং এখানে আল্লাহ তাআলার কল্যাণকামিতা এই মীমাংসা করেছে যে, বনি ইসরাইল এই পথভ্রষ্টতাকে এমন একটি কাজের মাধ্যমে দূর করে নেবে যা তারা নিজেরাই স্বচক্ষে দর্শন করবে। এইজন্য তাদেরকে এ-বিষয়টা চাক্ষুষ দেখিয়ে দিলেন যে, যে-বস্তুর পবিত্রতা তোমাদের অন্তরে এভাবে বদ্ধমূল হয়ে গেছে এবং যার পৌনঃপুনিক প্রকাশ ঘটছে তার (ওই গাভীটির) স্বরূপ তো এই যে, তোমরা নিজেরা নিজেদের হাতে তা

---

[১২৮] মুখে বলেছিলো "শ্রবণ করলাম" আর মনে মনে বলেছিলো "অমান্য করলাম"।

ধ্বংস করে দিলে এবং তা তোমাদের একগোছা চুলও বাঁকা করতে পারলো না। আবার কখনো এমন কিছু মনে করে বসো না যে, তা গাভীরই পবিত্রতার ক্রিয়া ছিলো যে তার দেহের একটি অংশের আঘাতে মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে উঠেছে। কেননা, মৃত্যু ও জীবনপ্রাপ্তির এ-ব্যাপারটি যদি গাভীর পবিত্রতার সঙ্গে সম্পর্কিত হতো, তবে যে-মাংসখণ্ডটি মৃতকে জীবিত করে দিলো তা নিজে জীবন লাভ করে পুনরায় কোনো জীবিত গাভী হয়ে গেলো না? তোমরা কি দেখছো না যে, যে-গাভীটি তোমরা জবাই করে দিলে, তা তেমনই নির্জীব অবস্থায় পড়ে রয়েছে এবং তার দেহের খণ্ডগুলো তোমাদের দস্তরখানের শোভা বর্ধন করেছে।

বাস্তব অবস্থা এই যে, মৃত্যু ও জীবনের এ-ব্যাপারটি একমাত্র আল্লাহ তাআলার হাতেই রয়েছে। আর যে-গোবৎসের ভালোবাসা তোমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে গেছে, তা তোমাদের চেয়েও নিকৃষ্ট একটি প্রাণী, যা কেবল তোমাদের প্রয়োজনের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তা তোমাদের জন্য দেবতা বা দেবী নয়। একমাত্র আল্লাহ তাআলাই যাকে ইচ্ছা মৃত্যু দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা জীবন দান করেনে। যেমন : তোমরা এই ঘটনার মধ্যে উভয় সত্যকে চাক্ষুষ দর্শন করেছো : তিনি গাভীর জীবনকে মৃত্যু দ্বারা পরিবর্তন করে দিলেন এবং মানুষের মৃতদেহকে নতুন জীবন দান করলেন।

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ (سورة الحشر)

'অতএব, হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ, তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।' [সুরা হাশর : আয়াত ২]

কুরআন মাজিদ সম্ভবত এই হেকমতেরই প্রতি লক্ষ করেই গাভী জবাই করার ঘটনাটিকে দুইভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে : প্রথম ভাগে বনি ইসরাইলের গো-বৎস পূজার ঘটনাকে জোর দেয়ার জন্য গাভীর ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, একটি বিশেষ কারণে যখন বনি ইসরাইলকে গাভী জবাই করতে বলা হয়েছিলো, তখন এই গো-বৎস পূজার ভালোবাসাই তাদের সামনে নির্দেশ পালনে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। তারা মিসরীয়দের গাভীর পবিত্রতার বিশ্বাস অনুসরণ করে অজস্র টালা-বাহানা করলো এবং চেষ্টা করলো যাতে তাদেরকে গাভী জবাই করতে না হয়। কিন্তু অবশেষে যখন নিজেদের প্রশ্নজালে

নিজেরাই আবদ্ধ হয়ে পড়লো, তাদেরকে বাধ্য হয়ে আদেশ পালন করতেই হলো।

কুরআন মাজিদ এই ঘটনা শোনানোর পর স্বাভাবিকভাবেই শ্রোতাদের মনে এই আগ্রহ সঞ্চারিত হওয়া উচিত—যাতে তারা জেনে নিতে পারে—গাভী জবাই করার এই ঘটনা কেনো এবং কীভাবে ঘটেছিলো, যার ব্যাপারে বনিইসরাইলিরা অজুহাত পেশ ও টালবাহানা করছিলো। তাই ঘটনার দ্বিতীয় অংশে কুরআন মাজিদ এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রশ্নের জবাব এইভাবে প্রদান করেছে যে, এই ঘটনার প্রধান দিকটি বর্ণনা করে দিয়েছে, যার সঙ্গে বনি ইসরাইলের বাদানুবাদের প্রকৃত সম্পর্ক ছিলো। তাই এই অংশের বর্ণনাকে পুনরায় إذ শব্দের মাধ্যমে শুরু করেছে। কুরআন মাজিদের এই আয়াতগুলোর তাফসির করা হয়েছে কুরআনের বাক্যগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেই এবং তাতে গাভী জবাই করার ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলোতে আগে-পিছে হওয়ার বিতর্কে যাওয়া আদৌ প্রয়োজন পড়ে না। ঘটনাটিকে অদ্ভুত মনে করে মনগড়া ও হালকা ব্যাখ্যার আশ্রয় নেয়ার প্রয়োজনও অবশিষ্ট থাকে না।

নিঃসন্দেহে তা আল্লাহ তাআলার ধারাবাহিক নিদর্শনগুলোর মধ্যে একটি নিদর্শন যা ইহুদিদের কঠিনচিত্ততা ও মন্দস্বভাব এবং অবাধ্যতামূলক চরিত্রের মোকাবিলায় সত্যের সমর্থনের জন্য আল্লাহ তাআলার হেকমতের চাহিদা অনুসারে প্রকাশিত হয়েছিলো। তা নিদর্শন হওয়া ছাড়াও তাতে কয়েকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ মুসলেহত (কল্যাণকামিতা) বিদ্যমান ছিলো। যেমন : এই ঘটনার পরেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন— كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ 'এভাবেই আল্লাহ তাআলা মৃতদেরকে জীবিত করে থাকেন,' এবং এর সঙ্গে সঙ্গেই বলেছেন— وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ 'এবং তোমাদেরকে তাঁর (কুদরতের) নিদর্শন দেখানোর জন্য।'

যেনো, গাভী জবাই করার ঘটনাটি বর্ণনা করার পূর্বে বনি ইসরাইলকে পৌনঃপুনিক আল্লাহ তাআলার নিদর্শনসমূহ প্রদর্শনের উল্লেখ করা এবং তারপর ঘটনাটির সঙ্গেই এই ঘটনার মাধ্যমে পরকালে মৃতদেরকে জীবিত করার প্রমাণ দেয়া, এরপর এই ঘটনাকেও আল্লাহ তাআলার নিদর্শনসমূহ থেকে একটি নিদর্শন বলা—এ-বিষয়ের একটি স্পষ্ট ও

উৎকৃষ্ট প্রমাণ যে, কোনো প্রকার ব্যাখ্যা ও বাহুল্য কথার আশ্রয় নেয়া ছাড়াই এই আয়াতগুলোর পরিষ্কার ও সাধাসিধে তাফসির তা-ই যা উপরিউক্ত লাইনগুলোতে বর্ণনা করা হয়েছে।

সুতরাং এ-আয়াতগুলোর যে-তাফসির সমসায়িক যুগের আধুনিক মুফাস্‌সিরগণ বর্ণনা করেছেন এবং যে-তাফসিরে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় আয়াতকে কখনো দুটি ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা এবং কখনো একটি ঘটনা মেনে নিয়ে নানা ধরনের হালকা ও দুর্বল ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তা অগ্রহণযোগ্য এবং কুরআন মাজিদের স্পষ্ট ভাষ্যের বিরোধী।

যেমন : তাদের কেউ কেউ বলে থাকেন গাভী জবাই করার এই নিয়মটি প্রকৃতপক্ষে বনি ইসরাইলের একটি প্রাচীন প্রথা ছিলো। এই প্রথার উল্লেখ আজো পর্যন্ত তাওরাতে বিদ্যমান রয়েছে। অর্থাৎ, যখনই কোথাও এমন নিহত ব্যক্তি পাওয়া যেতো এবং তার হত্যাকারীর সন্ধান পাওয়া যেতো না, তখন পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহ এড়ানোর জন্য তাদের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত ছিলো যে, তারা এমন একটি গাভী সংগ্রহ করতো যেটাকে কখনো ভূমি চাষের কাজে খাটানো হয় নি এবং যেটা কখনো শস্যখেতে পানি সেচের কাজেও ব্যবহৃত হয় নি। গাভীটিকে এমন একটি প্রান্তরে নিয়ে যাওয়া হতো যাতে কখনো ফসল ফলানো বা চাষ করা হয় নি এবং যাতে নদী প্রবহমান রয়েছে। আর যে-ব্যক্তিকে হত্যা করেছে বলে সন্দেহ করা হতো, তার মহল্লা, গোত্র বা বসতির লোকদেরকে একত্র করা হতো। এরপর গণক বা জ্যোতিষী অগ্রসর হয়ে প্রবহমান পানির ওপর গাভীটিকে দাঁড় করিয়ে তার ঘাড় কেটে ফেলতো। গাভীটির রক্ত পানির সঙ্গে মিশে গেলে তৎক্ষণাৎ সন্দেহভাজন দলের লোকেরা উঠে রক্তমিশ্রিত পানি দিয়ে হাত ধুতো এবং উচ্চৈঃস্বরে বলতো, আমাদের হাতও এই ব্যক্তিকে হত্যা করে নি এবং আমরা তার হত্যাকারী সম্পর্কেও কিছু অবগত নই। এই প্রথা পালনের পর তাদের ওপর আর কোনো সন্দেহ থাকতো না এবং গৃহকলহের আশঙ্কাও থাকতো না। আর যদি সন্দেহভাজন দলের একজন সরদারও হাত ধুতে এবং এই প্রথা পালন করতে অস্বীকৃতি জানাতো, তবে সে-গোত্রের সরদার নিহত ব্যক্তির খুনের অর্থদণ্ড ওই গোত্র বা মহল্লার ওপর আরোপ করা হতো।[১২৯]

---

[১২৯] তাওরাত : ইসতিসনা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ২১, আয়াত ২-৯।

এই তাফসিরে কুরআন মাজিদের পূর্বপর আয়াতগুলোর প্রেক্ষিতে যে-ত্রুটিবিচ্যুতি রয়েছে তা সাধারণ বোধশক্তি ও জ্ঞান দ্বারা অতি সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু এসব ত্রুটি ছাড়াও যে-বিষয়টি সবচেয়ে বেশি প্রশ্নবিদ্ধ হয় তা এই যে, যদি বনি ইসরাইলের মধ্যে এমন প্রথা প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত থাকতো, তবে যখন হযরত মুসা আ. ওই প্রথা অনুসারেই তাদেরকে আল্লাহর ফয়সালা শুনিয়ে দিলেন, তখন বনি ইসরাইল একে কেনো আজগুবি মনে করলো এবং কেনো এমন কথা বললো— أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا— 'হে মুসা, তুমি কি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা করছো যে আমাদেরকে গাভী জবাই করতে বলছো?' যদি তাদের এই প্রশ্ন অবাধ্যতামূলকই হতো তবে হযরত মুসা আ. এই জবাব দিতেন যে, এতে বিস্ময় ও আশ্চর্যের কী আছে? তোমরা তো অবগতই আছো যে, 'এমন সমস্যার সমাধানের জন্য এটাই প্রাচীন রীতি।'

এ-প্রসঙ্গে গাভী সংগ্রহ করা সম্পর্কে তাফসিরের কিতাবসমূহে অদ্ভুত ও বিচিত্র কাহিনি বর্ণিত আছে। কিন্তু বাস্তব ব্যাপার এই যে, এসব কাহিনি ইসরাইলি রেওয়ায়েত ও বর্ণনা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। অর্থাৎ, এগুলো এমন কাহিনি যা ইহুদিদের রেওয়ায়েত ও উদ্ধৃতির ফলে খ্যাতি লাভ করেছে এবং তাফসিরের কিতাবসমূহেও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু গবেষকগণ অনুসন্ধান করে কুরআন মাজিদের তাফসির থেকে ওই কাহিনিগুলোকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করে দিয়েছেন। যেমন : ইমাদুদ্দিন বিন কাসিরের মতো উচ্চমর্যাদাশীল মুফাস্সির এসব কাহিনি সম্পর্কে এমন মীমাংসা দিয়েছেন :

وهذه السياقات [كلها] عن عبيدة وأبي العالية والسدي وغيرهم، فيها اختلاف ما، والظاهر أنها مأخوذة من كتب بني إسرائيل وهي مما يجوز نقلها ولكن لا نصدق ولا نكذب فلهذا لا نعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندنا، والله أعلم.

"আর এসব ধারাবাহিক বর্ণনা যা উবায়দা, আবুল আলিয়া, সুদ্দি ও অন্যান্য রাবী থেকে উদ্ধৃত হয়েছে, এসব বর্ণনা পরস্পর বিরোধী। পরিষ্কার কথা হলো এই : এসব রেওয়ায়েত ইসরাইলিদের কিতাব থেকে গৃহীত হয়েছে। এগুলোকে উদ্ধৃত করা যদিও জায়েযের পর্যায়ে আসতে পারে, তবে আমরা সেগুলোকে সত্য বলে বিশ্বাস করি এবং মিথ্যাও বলি না। সুতরাং এসব রেওয়ায়েতের ওপর মোটেও বিশ্বাস করা যায় না।

তবে ওইসব রেওয়ায়েত অবশ্যই গ্রহণযোগ্য যা কুরআন ও হাদিসের আলোকে সত্য বলে বিবেচিত হয়। আল্লাহই ভালো জানেন।”

এই বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে তিনি বলছেন :

“তা গাভীর দেহের কোন্ অংশ ছিলো যা দ্বারা নিহত ব্যক্তির দেহকে স্পর্শ করা হয়েছিলো—তা যে-অংশই হোক না কেনো, কোনো একটি অংশ স্থিরীকরণ ব্যতীত অনির্দিষ্টভাবে কুরআন মাজিদে যা বলা হয়েছে তা-ই মুজেযা হওয়ার জন্য যথেষ্ট। আর যদি আমাদের ধর্মীয় ও পার্থিব অবস্থার প্রেক্ষিতে উল্লিখিত অংশের নির্দিষ্টকরণ প্রয়োজনীয় হতো, তবে আল্লাহ তাআলঅ অবশ্যই তা নির্দিষ্ট করে বর্ণনা করতেন। কিন্তু তিনি তা অস্পষ্ট রেখেছেন, যদিও তা প্রকৃত অবস্থার বিচারে নির্দিষ্টই। অর্থাৎ, কোনো নির্দিষ্ট অংশ দ্বারাই স্পর্শ করা হয়েছিলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেও গাভীর দেহের অংশ নির্দিষ্টকরণে কোনো সহিহ হাদিস নেই। সুতরাং, আমাদের জন্য এটাই সঙ্গত যে, আমরাও একে তেমনই অস্পষ্ট রেখে দিই, যেমন আল্লাহ তাআলা তাকে অস্পষ্ট রেখেছেন।”[১৩০]

তা ছাড়া মুসলিম শরিফের হাদিসে শুধু এতটুকু উল্লেখ করা হয়েছে যে, ‘যদি বনি ইসরাইলিরা হযরত মুসা আ.-এর সঙ্গে বাক-বিতণ্ডা না করতো, তবে গাভীর ব্যাপারে তাদের জন্য এত শর্ত আরোপ করা হতো না।’ সুতরাং এ-ব্যাপারে যদি আরও বিস্তারিত বিবরণ থাকতো তবে আমাদের নিষ্পাপ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা অবশ্যই উল্লেখ করতেন।

মোটকথা, এই ঘটনা আল্লাহ তাআলার কুদরতের নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি মহান নিদর্শন। অবশ্য কুরআন মাজিদ তার যতটুকু বিবরণ প্রদান করেছে ততটুকু বিবরণই গ্রহণযোগ্য। বাকি যা-কিছু আছে সব অনর্থক ও নিষ্ফল কিচ্ছা-কাহিনিমাত্র।

হযরত মুসা আ.-এর মুজেযাগুলো সম্পর্কে এসব আলোচনা সে-সকল মুফাস্সিরকে উদ্দেশ্য করেই করা হয়েছে যাঁরা মূলত আম্বিয়ায়ে কেরামের মুজেযায় বিশ্বাসী। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে ব্যাখ্যার সম্ভাবনা আছে মনে করে এমনসব মনগড়া ব্যাখ্যা প্রদান করেন যার ফলে এসব ঘটনা

---

[১৩০] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১২।

মুজেযার সীমা থেকে বের হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যেসব খোদাদ্রোহী ইসলামের সর্বজন স্বীকৃত আকিদা মুজেযাকে বিশ্বাস ও স্বীকারই করে না এবং সেজন্য কুরআন মাজিদের এসব ঘটনাকে মিথ্যা অপব্যাখ্যা দিয়ে বিকৃত করে দেওয়াই জরুরি মনে করে, তাদের জন্য প্রথম মুল মুজেযার সম্ভাবনা নিয়েই আলোচনা হওয়া উচিত।

যাইহোক। এরপর আল্লাহ তাআলা বলেছেন, এসব মহান মুজেযাসমূহ চাক্ষুষ দর্শন করা এবং তাদের প্রতি আল্লাহপাকের অসীম অনুগ্রহ ও দয়া থাকা সত্ত্বেও ওইসব দুর্ভাগাদের ওপর কোনো ক্রিয়াই হলো না। তারা একইভাবে বক্র স্বভাব ও ঘাউড়ামির ওপর গোঁ ধরে থাকলো। সত্যকে কবুল করার জন্য তাদের হৃদয় পাথরের মতো কঠিন হয়ে গেলো; বরং অনবরত নাফরমানি ও অবাধ্যতা তাদের ভালো কাজের যোগ্যতাকেই ধ্বংস করে দিলো। ফলে তাদের অন্তর পাথরের চেয়েও অধিক কঠিন হয়ে গেলো। কেননা, পাথরের মধ্যে কঠিনতা থাকা সত্ত্বেও তা মানুষের অনেক কাজে লাগে; কিন্তু এই হতভাগাদের জীবনে তো অনিষ্ট ও ক্ষতি ছাড়া আর কোনো কল্যাণই থাকলো না।

এ-ব্যাপারে কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে—

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (سورة البقرة)

'এরপরও তোমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেলো, তা পাথর কিংবা তার চেয়েও কঠিন। (এটা স্পষ্ট কথা যে,) কিছু পাথরও এমন হয় যে, তা থেকে নদী-নালা প্রবাহিত হয় এবং কিছু এমন যে, বিদীর্ণ হওয়ার পর তা থেকে পানি নির্গত হয়, আবার কিছু এমন যা (ভূমিকম্প ইত্যাদি অবস্থায়) আল্লাহর ভয়ে ধসে পড়ে এবং তোমরা যা করো আল্লাহ সে-সম্পর্কে অনবহিত নন।' [সুরা বাকারা : আয়াত ৭৪]

ঘটনার সারমর্ম এই : বনি ইসরাইলিদের অন্তরের কাঠিন্য এবং সত্য কবুল করার ব্যাপারে নিষ্ক্রিয়তা এমন পর্যায়ে পৌঁছে ছিলো যে, যদি সাধারণ কথায় বলে দেয়া হয় যে তাদের অন্তর পাথরখণ্ডে পরিণত হয়েছিলো, তবুও তাদের অন্তরের কঠিনতার প্রকৃত ছবি সামনে প্রতিভাত

পারে না। কেননা, পাথর যদিও কঠিন, কিন্তু তা অকেজো নয়। তোমরা কি পাহাড়সমূহ দেখো আর দেখো নি যে, ওই কঠিন পাথরসমূহ থেকে নদী-নালা প্রবাহিত হয়ে আসছে এবং কোনো কোনো স্থানে ওই পাথরসমূহ থেকেই মিষ্ট ও শীতল পানির ঝরনা প্রবাহিত হচ্ছে। আর ভূমিকম্প হলে বা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা হলে ওই বিশালাকার পাথরসমূহ ধুনিত তুলার মতো খণ্ডবিখণ্ড হয়ে উড়ে নিচে নেমে যায় এবং আল্লাহকে ভয়ের স্বীকৃতি প্রদান করছে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এই বনি ইসরাইলের ওপর আল্লাহপাকের নিদর্শনসমূহেরও কোনো ক্রিয়া হলো এবং নবীগণের ওয়াজনসিহতেরও কোনো ক্রিয়া হলো না। নাফরমানি করার সময় তাদের অন্তরে বিন্দুমাত্র আল্লাহভীতির সঞ্চার হলো না।

হযরত মুসা আলাইহিস সালাম ও কারুন

বনি ইসরাইলের মধ্যে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলো। কুরআন মাজিদ তার নাম বলেছে কারুন। স্বর্ণ, রুপা, হীরা ও জহরতে তার ধনভাণ্ডারগুলো পরিপূর্ণ ছিলো। বলবান শ্রমিকদের একটি দল অতি কষ্টে তার ধনভাণ্ডারগুলোর চাবির বোঝা বহন করতে পারতো। এই বিরাট পুঁজি ও ধনসম্পদ তাকে চরম অহংকারী করে তুলেছিলো। কারুন ধন-সম্পদের নেশায় এতই মত্ত ছিলো যে, আপন লোকজন, আত্মীয়-স্বজন এবং নিজের সম্প্রদায়ের লোকদেরকে খুবই তুচ্ছ ও হীন মনে করতো এবং তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতো।

মুফাস্সিরগণ বলেন, কারুন হযরত মুসা আ.-এর চাচাতো ভাই ছিলো এবং তার বংশপরিচয় নিম্নরূপ :

কারুন বিন ইয়াসহার বিন কাহেস বা কাহাস।[১৩১] হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস থেকে এমন বক্তব্যই বর্ণিত হয়েছে।

---

[১৩১] কারুনের বংশপরম্পরা কয়েকভাবে বর্ণিত আছে :

১. (قارون بن يصهر بن قَاهَث بن لاوي بن يعقوب) : কারুন বিন ইয়াসহার বিন কাহাস বিন লাবি বিন ইয়াকুব।

২. (قارون بن مصر بن فاهث بن لاوي بن يعقوب) : কারুন বিন মিসর বিন ফাহাস বিন লাবি বিন ইয়াকুব।

৩. (قارون بن نصهر بن فاحث بن لاوي بن يعقوب) : কারুন বিন নাসহার বিন ফাহাস বিন লাবি বিন ইয়াকুব।

আর মুসা আ.-এর বংশপরম্পরা নিম্নরূপ :

ইতিহাসবেত্তাগণ বলেন, কারুন মিসরে অবস্থানকালে ফেরআউনের রাজদরবারে কর্মচারী ছিলো এবং এই অসীম ধনসম্পদরাশি সে ওখানে অবস্থানকালেই সঞ্চয় করেছিলো। আর সামিরি মুনাফিক ছিলো এবং সে হযরত মুসা আ.-এর ধর্মের প্রতি বিশ্বাস রাখতো না।

হযরত মুসা আ. একবার কারুনকে উপদেশ দিলেন, আল্লাহ তাআলা তোমাকে অগণিত ও অসীম ধন-ঐশ্বর্য দান করেছেন। সম্মান ও প্রতিপত্তিও দান করেছে। সুতরাং তুমি আল্লাহর শোকর আদায় করো। ধন-সম্পদের হক যাকাত এবং সদকা প্রদান করে দরিদ্র ও ফকির-মিসকিনদের সাহায্য করো। আল্লাহকে ভুলে থাকা এবং তাঁর বিধি-নিষেধ অমান্য করা চরিত ও মহত্ব উভয় দিক থেকে অত্যন্ত অকৃতজ্ঞতা ও অবাধ্যতা। আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত সম্মানের প্রতিদান এমন হওয়া উচিত নয় যে, তুমি দরিদ্র ও দুর্বলদেরকে হীন ও নিকৃষ্ট মনে করো এবং আত্মঅহমিকায় দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনদেরকে ঘৃণা করো।

কারুনের আত্মম্ভরিতা হযরত মুসা আ.-এর নসিহত পছন্দ করলো না। সে অত্যন্ত দাম্ভিকতার সঙ্গে জবাব দিলো, হে মুসা, আমার এই ধন-ঐশ্বর্য তোমার আল্লাহর প্রদত্ত নয়। এগুলো আমি আমার জ্ঞান-বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও কৌশলের বলে অর্জন করেছি। إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي "এই সম্পদ আমি আমার জ্ঞানবলে প্রাপ্ত হয়েছি।" সুতরাং আমি তোমার উপদেশ মেনে নিজের অর্জিত ধন-সম্পদকে এভাবে বিনষ্ট করতে পারি না।

কিন্তু হযরত মুসা আ. অনবরত তাঁর দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করতেন এবং কারুনকে হেদায়েতের পথ প্রদর্শন করতেন। কারুন দেখলো যে, হযরত মুসা আ. কোনোভাবেই ক্ষান্ত হচ্ছেন না। তাই সে মুসা আ.-কে বিরক্ত করার জন্য এবং ধন-সম্পদের আড়ম্বর প্রদর্শন করে তাঁকে বিব্রত করার উদ্দেশ্যে একদিন অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে বের হলো।

হযরত মুসা আ. তখন বনি ইসরাইলের এক দরবারে আল্লাহ তাআলার পয়গাম শুনাচ্ছিলেন। এ-সময় কারুন এক বিরাট দল এবং বিশেষ

موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب إسرائيل الله بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام. : মুসা বিন ইমরান বিন কাহাস বিন লাবি বিন ইয়াকুব ইসরাইলুল্লাহ বিন ইসহাক বিন ইবরাহিম আ.। অর্থাৎ, কারুন ও হযরত মুসা আ. কাহাসের নাতি।

জাঁকজমক ও আড়ম্বরের সঙ্গে তার ধন-সম্পদ প্রদর্শন করতে করতে মুসা আ.-এর সামনে দিয়ে গমন করলো। এতে কারুনের এই ইঙ্গিত ছিলো যে, যদি মুসার দাওয়াতের ধারা এভাবেই চলতে থাকে, তবে আমারও এক বিরাট দল আছে এবং আমিও বিপুল হীরা ও জহরতের মালিক। সুতরাং লোকবল ও ধনবল—এই দুটি অস্ত্র দিয়েই আমি মুসাকে পরাভূত করবো।

বনি ইসরাইলিগণ যখন কারুনের বিপুল ধন-ঐশ্বর্য দেখলো, তাদের মধ্যে কিছু লোকের অন্তরে মানবিক দুর্বলতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। তারা অস্থির হয়ে এমন দোয়া করতে লাগলো, আহা, কতই না উত্তম হতো যদি আমাদের ভাগ্যেও এমন ধন-সম্পদ ও জাঁকজমক জুটতো! কিন্তু বনি ইসরাইলের জ্ঞানী ব্যক্তিরা তৎক্ষণাৎ তাদেরকে বারণ করে দিয়ে বললেন, সাবধান! এই পার্থিব ঐশ্বর্য, সাজসজ্জা ও জাঁমকের মোহে পড়ো না। এসবের লালসায় আবদ্ধ হয়ে পড়ো না। তোমরা অচিরকালের মধ্যেই দেখতে পাবে এই ধন-সম্পদের ভয়াবহ পরিণাম কেমন হচ্ছে।

অবশেষে, কারুন যখন তার গর্ব ও দাম্ভিকতার চরম প্রদর্শনী করলো এবং হযরত মুসা আ. ও বনি ইসরাইলের মুসলমানদেরকে হেয়-প্রতিপন্নকরণে সর্বাধিক শক্তি ব্যয় করলো, তখন আল্লাহ তাআলার আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগলো এবং কর্মফলের চিরন্তন ও স্বাভাবিক রীতি ক্রিয়াশীল হয়ে উঠলো। কারুন ও তার ধন-সম্পদের প্রতি আল্লাহ তাআলার এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষিত হলো—

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ

"এরপর আমি কারুনকে তার প্রাসাদসহ ভূগর্ভে প্রোথিত করলাম।" [সুরা কাসাস : আয়াত ৮১]

বনি ইসরাইলিদের চোখসমূহ দেখতে পেলো যে, কারুনের অহমিকাও থাকলো না এবং অহমিকার উপকরণও থাকলো না। জমিন তার সব ধন-সম্পদ গিলে ফেললো এবং শিক্ষা গ্রহণের উপকরণ বানিয়ে দিলো।

কুরআন মাজিদ এই ঘটনাকে বিভিন্ন স্থানে মোটামুটি ও বিস্তারিত বর্ণনা করেছে—

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ () إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ (سورة مؤمن)

'আমি আমার নিদর্শন ও স্পষ্ট প্রমাণসহ মুসাকে প্রেরণ করেছিলাম, ফেরআউন, হামান ও কারুনের কাছে। কিন্তু তারা বলেছিলো, "এই লোকটা তো এক জাদুকর, চরম মিথ্যাবাদী।"' [সুরা মুমিন : আয়াত ২৩-২৪]

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ () فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (سورة العنكبوت)

'এবং আমি সংহার করেছিলাম কারুন, ফেরআউন ও হামানকে। মুসা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ এসেছিলো; তখন তারা দেশে দম্ভ করতো; কিন্তু তারা আমার শাস্তি এড়াতে পারে নি। তাদের প্রত্যেকেই আমি তার অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়েছিলাম : তাদের কারো ওপর প্রেরণ করেছি প্রস্তরসহ প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা, তাদের কাউকে আঘাত করেছে মহানিনাদ, কাউকেও আমি প্রোথিত করেছিলাম ভূগর্ভে এবং কাউকেও করেছিলাম নিমজ্জিত (সমুদ্রে)। আল্লাহ তাদের প্রতি কোনো জুলুম করেন নি; তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিলো।' [সুরা আনকাবুত : আয়াত ৩৯-৪০]

হযরত মুসা আ. ও কারুনের ঘটনা সম্পর্কে বিশুদ্ধ ও সঠিক অবস্থা কেবল এতটুকুই। তা ছাড়া অতিরিক্ত যা-কিছু শোনা যায় সব ইসরাইলি রেওয়ায়েত থেকে সংগৃহীত। সুতরাং সেগুলো নির্ভরযোগ্য নয়। এ-কারণেই হাফেয ইমাদুদ্দিন বিন কাসির বলেছেন—

وقد ذكر ها هنا إسرائيليات [غريبة] أضربنا عنها صفحًا.

'এখানে বহু অপরিচিত ইসরাইলি রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। আমরা সেগুলো বর্জন করলাম।

কোনো কোনো মুফাস্‌সির বলেন— إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي "এই সম্পদ আমি আমার জ্ঞানবলে প্রাপ্ত হয়েছি"—এখানে علم বা কৌশল বলতে 'ইলমে কিমিয়া', অর্থাৎ, 'পরশমণি'-সম্পর্কিত কৌশল উদ্দেশ্য। তাঁদের মতে কিমিয়ার কৌশল প্রয়োগ করেই কারুন তার সব ধন-সম্পদ অর্জন করেছিলো। কিন্তু গবেষক মুফাস্‌সিরগণ তা খণ্ডন করে বলেছেন যে, এখানে علم দ্বারা জ্ঞান-বুদ্ধিই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, সে জ্ঞান-বুদ্ধির বলে

এসব ধন-সম্পদ অর্জন করেছিলো। علم শব্দকে কিমিয়া বলে ব্যাখ্যা করা অত্যন্ত অর্থহীন কথা।

মুফাস্‌সির আলেমগণ এ-বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নি যে, কারুনের ঘটনাটি কখন ঘটেছিলো। ফেরআউন সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়ার আগে মিসরে ঘটেছিলো না-কি ফেরআউনের নিমজ্জিত হওয়ার পর তীহ ময়দানে ঘটেছিলো। হাফেয ইমাদুদ্দিন বিন কাসির বলেন, ঘটনাটা যদি ফেরআউনের নিমজ্জিত হওয়ার আগের ঘটনা হয়ে থাকে, তবে فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ "এরপর আমি কারুনকে তার প্রাসাদসহ ভূগর্ভে প্রোথিত করলাম" বাক্যের دار (অর্থাৎ প্রাসাদ) শব্দ দ্বারা তার আভিধানিক অর্থই উদ্দেশ্য। আর যদি তা ফেরআউনের নিমজ্জিত হওয়ার পরের ঘটনা হয়ে থাকে তবে এখানে دار বলতে তাঁবু উদ্দেশ্য।

(এই গ্রন্থের লেখক বলেন,) আমাদের মতে কারুনের ঘটনা ফেরআউনের সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়ার পরবর্তীকালে তীহ প্রান্তরেই ঘটেছিলো। কেননা, কুরআন মাজিদ ফেরআউনের নিমজ্জন-সংক্রান্ত সব ঘটনা বলার পর এই ঘটনা বর্ণনা করেছে।

কুরআন মাজিদ কারুনের বিস্তারিত ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছে—

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ () وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ () قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ () فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ () وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ () فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ () وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا

أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ () تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (سورة القصص)

'কারুন[১৩২] ছিলো মুসার সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু সে তাদের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলো। আমি তাকে দান করেছিলাম এমন ধনভাণ্ডার যার চাবিগুলো বহন করা একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিলো। স্মরণ করো (সেই সময়ের কথা,) যখন তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিলো, "দম্ভ করো না, নিশ্চয় আল্লাহ দাম্ভিকদেরকে পছন্দ করেন না। আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন তার দ্বারা আখেরাতের আবাস অনুসন্ধান করো এবং দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না[১৩৩]; তুমি অনুগ্রহ করো যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না। আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালোবাসেন না।" কারুন বললো, "এই সম্পদ আমি আমার জ্ঞানবলে প্রাপ্ত হয়েছি।" সে কি জানতো না আল্লাহ তার পূর্বে ধ্বংস করেছেন বহু মানবগোষ্ঠীকে যারা তার অপেক্ষা শক্তিতে ছিলো প্রবল, জনসংখ্যায় ছিলো অধিক? অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না।[১৩৪] (অর্থাৎ, তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পেয়েছে বলেই তো তারা নানা ধরনের পাককাজে লিপ্ত হয়েছে। সুতরাং তাদেরকে জিজ্ঞেস করে কী লাভ?) কারুন তার সম্প্রদায়ের সামনে উপস্থিত হয়েছিলো জাঁকজমকের সঙ্গে। যারা পার্থিব জীবন কামনা করতো তারা বললো, "আহা, কারুনকে যেমন দেয়া হয়েছে আমাদেরকেও যদি তা দেয়া হতো! প্রকৃতই সে মহাভাগ্যবান।" এবং যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছিলো তারা বললো, "ধিক তোমাদেরকে! যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য আল্লাহর পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ এবং ধৈর্যশীল ব্যতীত তা কেউ পাবে না।"

এরপর আমি কারুনকে তার প্রাসাদসহ ভূগর্ভে প্রোথিত করলাম। তার পক্ষে এমন কোনো দল ছিলো না যারা আল্লাহর শাস্তি থেকে তাকে

---

[১৩২] কারুন হযরত মুসা আ.-এর চাচাতো ভাই ছিলো। ফেরআউনের অন্যতম সভাসদ। কৃপণতার জন্য বিশেষভাবে খ্যাত।

[১৩৩] বৈধভাবে অর্জন ও ব্যয় করো এবং আখেরাতের জন্য পুণ্য সঞ্চয় করো।

[১৩৪] জানার জন্য প্রশ্ন করার প্রয়োজন হবে না, কারণ আমালনামায় সব লিপিবদ্ধ থাকবে।

সাহায্য করতে পারতো এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিলো না। আগের দিন যারা তার মতো হওয়ার কামনা করেছিলো, তারা বলতে লাগলো, "দেখলে তো, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা তার রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা কমিয়ে দেন। যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি সদয় না হতেন তবে আমাদেরকেও তিনি ভূগর্ভে প্রোথিত করে দিতেন। দেখলে তো! কাফেররা সফলকাম হয় না।" তা আখেরাতের সেই আবাস যা আমি নির্ধারণ করি তাদের জন্য যারা এই পৃথিবীতে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। শুভ পরিণাম মুত্তাকিদের জন্য। [সুরা কাসাস : আয়াত ৭৬-৮৩]

তাওরাতও এই ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করেছে।[১৩৫] কিন্তু তাওরাতের বর্ণনা ও কুরআন মাজিদের বিস্তারিত বিবরণ পাঠ করার পর একজন সত্যনিষ্ঠ মানুষ ভালোভাবেই অনুমান করতে পারেন যে, কুরআন যখন কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনা করে, তখন ঘটনার শুধু ওই অংশগুলোই বর্ণনা করে থাকে যা উপদেশ ও নসিহতের জন্য প্রয়োজনীয় এবং কুরআন প্রয়োজনের অতিরিক্ত অংশগুলো ত্যাগ করে। কিন্তু তাওরাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনাবশ্যক বিবরণসমূহ বর্ণিত হয়ে থাকে। কোনো কোনো স্থানে তো বেখাপ্পা বিস্তৃত বিবরণ ও বিপরীত বর্ণনাও পাওয়া যায়। যা আমরা প্রয়োজন হলে উদ্ধৃত করে থাকি। যেমন : এখানেও ঘটনাটির কতিপয় অনাবশ্যক অংশকে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

বনি ইসরাইল কর্তৃক হযরত মুসা আ.-কে কষ্ট ও যন্ত্রণা প্রদান

পূর্বে বর্ণিত ঘটনাসমূহ এ-কথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, বনি ইসরাইল হযরত মুসা আ.-কে সবসময় কথায় ও কাজে সব দিক দিয়েই নানা ধরনের কষ্ট দিয়ে আসছে। এমনকি তাঁর প্রতি মিথ্যা দোষারোপ ও মিথ্যা অপবাদ প্রদান করতেও ক্রটি করে নি।

প্রতিমা-পূজার আবদার, গো-বৎসের পূজায় লিপ্ত হওয়া, তাওরাতের বিধি-বিধান গ্রহণে অস্বীকৃতি, পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করতে অস্বীকৃতি, মান্না ও সালওয়ার প্রতি অকৃতজ্ঞতা—মোটকথা, প্রতিটি কর্তব্য সম্পন্ন করার ব্যাপারে একগুঁয়েমি ও হঠকারিতা এবং প্রত্যেকটি ব্যাপারে হযরত

---

[১৩৫] গণনা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১৬, আয়াত ২০-৩৪।

মুসা আ.-এর সঙ্গে মূর্খতাসুলভ বাদানুবাদ ইত্যাদির এক সক্রিয় ধারা অব্যাহত ছিলো। এসব বিষয় বনি ইসরাইলের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে দৃষ্ট হয়। আর অন্যদিকে দেখা যায় যে, হযরত মুসা আ. দৃঢ়তা ও ধৈর্যের সঙ্গে একজন 'উলুল আযম' (দৃঢ়প্রতিজ্ঞ) রাসুলের মতো সবকিছু সহ্য করে হেদায়েত ও নসিহতের কাছে মশগুল ছিলেন।

কুরআন মাজিদের বিস্তারিত বিবরণ ছাড়াও যদি ঐতিহাসিক বিবরণ হিসেবে বনি ইসরাইলের ওইসব বৈশিষ্ট্য ও চারিত্রিক গুণাবলি জানতে আগ্রহ হয়, তবে তাওরাতের নিম্নবর্ণিত অনুচ্ছেদগুলো পাঠ করা যেতে পারে :

নিষ্ক্রমণ অধ্যায় : অনুচ্ছেদ ১২, আয়াত ১১-১২; অনুচ্ছেদ ১৬, আয়াত ২-৩।

গণনা অধ্যায় : অনুচ্ছেদ ১৪, আয়াত ১-৩; অনুচ্ছেদ ১৬, আয়াত ১৩-১৪; অনুচ্ছেদ ৭, আয়াত ১২-১৩।

ইস্তিসনা অধ্যায় : অনুচ্ছেদ ৯; আয়াত ২৩-২৪।

এই গ্রন্থের পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে যে-ঘটনাবলি সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে তা ছাড়াও কুরআন মাজিদ সুরা আহযাব ও সুরা সাফ্ফ-এ হযরত মুসা আ.-কে বনি ইসরাইল যেসব দুঃখ-যন্ত্রণা প্রদান করে তার নিন্দা করেছে এবং বলেছে—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا (سورة الأحزاب)

'হে মুমিনগণ, মুসাকে যারা কষ্ট দিয়েছে, তোমরা তাদের মতো হয়ো না। তারা যা রটনা করেছিলো, আল্লাহ তা থেকে তাকে নির্দোষ প্রমাণিত করেন; এবং আল্লাহর কাছে সে মর্যাদাবান।' [সুরা আহযাব : আয়াত ৬৯]

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (سورة الصف)

'আর স্মরণ করো (সেই সময়ের কথা,) যখন মুসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিলো, "হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আমাকে কেনো কষ্ট দিচ্ছো যখন তোমরা জানো যে, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর রাসুল।" এরপর তারা যখন বক্রপথ অবলম্বন করলো তখন আল্লাহ তাদের

হৃদয়কে বক্র করে দিলেন। আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।' [সুরা সাফ্ফ : আয়াত ৫]

মুফাস্‌সির আলেমগণ উল্লিখিত দুটি ক্ষেত্রে আলোচনা করেছেন যে, এখানে যে-কষ্ট প্রদানের কথা উল্লেখ করেছে তাতে কি ওইসব অবস্থাই উদ্দেশ্য যা বনি ইসরাইলের ধারাবাহিক নাফরমানি ও অবাধ্যতার প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এসবকিছু নিশ্চিতভাবে হযরত মুসা আ.-এর মনঃকষ্টের কারণ ছিলো না-কি ওগুলো ব্যতীত অন্যকোনো বিশেষ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য। যেমন : কোনো কোনো মুফাস্‌সির বলেন, উল্লিখিত আয়াত দুটিতে বনি ইসরাইল অবাধ্যতা ও হঠকারিতার মাধ্যমে হযরত মুসা আ.কে যে-যন্ত্রণা ও ক্লেশ দিতো তা-ই উদ্দেশ্য। আর কোনো কোনো মুফাস্‌সির উল্লিখিত আয়াত দুটির প্রত্যেকটির লক্ষ্যস্থল হিসেবে পূর্ববর্ণিত ঘটনাগুলো থেকে পৃথক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বলেন, কোনো কোনো সহিহ হাদিসে হযরত মুসা আ. ও বনি ইসরাইলের মধ্যে এমন এমন ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায় যার বিস্তারিত বর্ণনা কুরআন মাজিদে নেই। সুতরাং, তাঁদের বর্ণিত ঘটনাবলি থেকে কোনো একটি নির্দিষ্ট ঘটনা অথবা এ-জাতীয় সব ঘটনাই উল্লিখিত আয়াত দুটির লক্ষ্যস্থল এবং এ-ঘটনাগুলোই আয়াত দুটির শানে-নুযুল তুল্য।

তাঁদের বর্ণিত ঘটনাসমূহ থেকে একটি ঘটনা সহিহ বুখারি ও মুসলিম শরিফে উল্লেখ করা হয়েছে।

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى سَوْأَةِ بَعْضٍ وَكَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلاَّ أَنَّهُ آدَرُ. قَالَ فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ – قَالَ – فَجَمَحَ مُوسَى بِأَثَرِهِ يَقُولُ ثَوْبِى حَجَرُ ثَوْبِى حَجَرُ. حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى سَوْأَةِ مُوسَى فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ. فَقَامَ الْحَجَرُ بَعْدُ حَتَّى نُظِرَ إِلَيْهِ – قَالَ – فَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا ». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ إِنَّهُ بِالْحَجَرِ نَدَبٌ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ ضَرْبُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْحَجَرِ.

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, একদিন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "হযরত মুসা আ. অত্যন্ত লজ্জাশীল ছিলেন। এমনকি তিনি তাঁর দেহের কোনো অংশের ওপরই কারো দৃষ্টি পড়তে দিতেন না। পক্ষান্তরে বনি ইসরাইলিরা সর্বসাধারণের সামনে নগ্ন হয়ে গোসল করতে অভ্যস্ত ছিলো। তারা একে অন্যের লজ্জাস্থানের দিকে তাকাতো। এ-কারণে তারা হযরত মুসা আ.-কে উত্যক্ত করতো এবং তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করতো। কখনো তারা বলতো, 'হযরত মুসা আ.-এর বিশেষ অঙ্গে শ্বেতরোগের দাগ রয়েছে।' কখনো তারা বলতো, 'তাঁর কুরুণ্ডিয়া রোগ (অণ্ডকোষ বৃদ্ধির ব্যাধি) আছে। বা এ-জাতীয় অন্যকোনো খারাপ রোগ আছে। এ-জন্যই তিনি পৃথক স্থানে গোপনে গোসল করে থাকেন।' হযরত মুসা বনি ইসরাইলের এসব অপবাদ শুনে নীরব থাকতেন। অবশেষে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা হলো মুসা আ.-কে এসব অপবাদ থেকে মুক্ত ও পবিত্র করবেন। মুসা আ. একটি পৃথকভাবে আড়ালে গোসল করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তিনি তার পরনের কাপড় খুলে একখণ্ড পাথরের ওপর রাখলেন। তখনই পাথরটি আল্লাহ তাআলার আদেশে তার স্থান থেকে নড়ে উঠলো এবং যেখানে সর্বসাধারণের সামনে বনি ইসরাইলিরা নগ্ন অবস্থায় গোসল করছিলো, পাথরটি মুসা আ.-এর কাপড় নিয়ে ঠিক ওখানে গিয়ে পৌছলো। হযরত মুসা আ. ঘাবড়ে গিয়ে ও ক্রোধান্বিত হয়ে পাথরের পেছনে পেছনে এই বলে ছুটলেন, হে পাথর, আমার কাপড়! হে পাথর, আমার কাপড়! পাথরের সঙ্গে সঙ্গে মুসা আ.-ও সাধারণ মানুষের সামনে এসে পৌছলেন এবং সবাই দেখতে পেলো যে, হযরত মুসা আ. তাদের দোষারোপ করা সমস্ত রোগ ও ব্যাধি থেকে পবিত্র। হযরত মুসা আ.-এর ওপর এই ঘটনার প্রভাব এত অধিক হলো যে, ক্রোধে অধীর হয়ে পাথরটির ওপর তাঁর লাঠি দিয়ে কয়েকটি আঘাত করলেন। ওই পাথরের ওপর তাঁর প্রত্যেকটি আঘাতেরই দাগ বসে গেলো।"[১৩৬]

ইমাম বুখারি ও মুসলিম এই ঘটনাটিকে বিভিন্ন সনদের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে একটি সনদে এই ঘটনাকে সুরা আহযাবের ওই আয়াতের শানে-নুযুল বলা হয়েছে যাতে বনি ইসরাইল কর্তৃক হযরত

[১৩৬] সহিহ বুখারি : হাদিস ২৭৪; সহিহ মুসলিম : হাদিস ২৯৬।

মুসা আ.-কে যন্ত্রণা প্রদান এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হযরত মুসা আ.-এর পবিত্রতা ঘোষণার উল্লেখ রয়েছে। আর এ-আয়াতটিরই শানে-নুযুল হিসেবে ইবনে আবি হাতেম হযরত আলি রা. থেকে অন্য একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। হযরত আলি (কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু) বলেন, হযরত মুসা ও হারুন আ. পাহাড়ের ওপর গমন করলেন। পাহাড়ে হযরত হারুন আ. ইন্তেকাল করেন। ফলে মুসা. একাকী ফিরে আসেন। বনি ইসরাইল তা দেখে হযরত মুসা আ.-এর বিরুদ্ধে এই অপবাদ রটনা করলো যে, তিনি হারুন আ.-কে হত্যা করেছেন। এই অপবাদে হযরত মুসা আ. অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। তখন আল্লাহপাক ফেরেশতাদেরকে হযরত হারুন আ.-এর মৃতদেহ বনি ইসরাইলের সামনে এনে উপস্থিত করতে নির্দেশ দিলেন। তৎক্ষণাৎ ফেরেশতাগণ হযরত হারুন আ.-এর মৃতদেহ খোলা প্রান্তরে বনি ইসরাইলের ভরা মজলিসে সবার সামনে এনে উপস্থিত করলেন। তারা তা দেখে নিশ্চিত হলো যে, সত্য সত্যই হযরত হারুন আ.-এর দেহে কোথাও কোনো আঘাত বা হত্যার চিহ্ন নেই।

তৃতীয় হাদিসটি হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. ও সুদ্দি থেকে তাফসিরের কিতাবসমূহে উদ্ধৃত করা হয়েছে : হযরত মুসা আ.-এর উপদেশ ও নসিহত কারুনের কাছে অত্যন্ত অসহনীয় হয়ে পড়লো। ফলে সে একদিন এক বারবণিতাকে কিছু টাকা দিয়ে এই কাজের জন্য নিযুক্ত করলো যে, যখন হযরত মুসা ওয়াজ-নসিহতে মশগুল থাকবে, ঠিক সে-সময়ে তুমি মজলিসে দাঁড়িয়ে মুসার বিরুদ্ধে এই দোষারোপ করবে যে, তোমার সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে। পরের দিন হযরত মুসা আ. বনি ইসরাইলের বিপুল জনসমাবেশে ওয়াজ করছিলেন। তখন ওই বারবণিতা সমাবেশে দাঁড়িয়ে কারুনের কথামতো হযরত মুসা আ.-এর ওপর দোষারোপ করলো। হযরত মুসা আ. এই রমণীর কথা শোনামাত্র সিজদায় পতিত হলেন। তারপর মাথা তুলের রমণীকে সম্বোধন করে বললেন, তুই কি আল্লাহ তাআলার নামে কসম খেয়ে বলতে পারিস যে তুই যা বলছিস তা সত্য? এ-কথা শুনে রমণীটির দেহে ভীষণ কাঁপুনি শুরু হয়ে গেলো। সে বললো, আল্লাহর কসম, সত্য কথা এই যে, কারুন আমাকে টাকা দিয়ে এ-ধরনের কথা বলতে নির্দেশ দিয়েছিলো। আপনি তো এ-ধরনের অপবাদ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। তখন হযরত মুসা

আ. কারুনের জন্য বদদোয়া করলেন। তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তাআলার নির্দেশে কারুনকে তার সব ধনসম্পদসহ মাটির নিচে ধসিয়ে দেয়া হলো।

মীমাংসা

এই আলোচনায় বিশুদ্ধ পন্থা এই যে, কুরআন মাজিদ যখন হযরত মুসা আ.-কে ক্লেশ ও যন্ত্রণা প্রদানের ব্যাপরটিকে অস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে, তখন আমাদের জন্যও এটাই সঙ্গত হবে যে, এর কোনো নির্দিষ্ট বা বিস্ত ারিত বিবরণ প্রদান করা ব্যতীতই যন্ত্রণা প্রদানের মূল বিষয়টির ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা এবং এটিকে কোনো নির্দিষ্ট ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না করা। যে-হেকমত ও মুসলেহতের কারণে আল্লাহপাক বিষয়টিকে অস্পষ্ট রাখা সঙ্গত মনে করেছেন, আমরাও তাকেই যথেষ্ট মনে করি। আর যদি বিস্তারিত বিবরণ ও নির্দিষ্টতার প্রতি মনোযোগ দেয়া জরুরি হয়, তাহলে এ-কথা মেনে নিতে হবে যে, আলোচ্য আয়াত দুটির প্রত্যেকটিরই লক্ষ্যস্থল ওইসব ঘটনা যা বনি ইসরাইল কর্তৃক হযরত মুসা আ.-কে কষ্ট প্রদান প্রসঙ্গে কুরআন মাজিদে ও সহিহ হাদিসসমূহে বর্ণিত হয়েছে। আর এ-কথার প্রতিও লক্ষ রাখতে হবে যে, আলোচিত কষ্ট প্রদানের বিষয়টি এ-জাতীয় হবে যাতে হযরত মুসা আ.-এর মর্যাদা ক্ষুণ্ন হতো। আল্লাহ তাআলা হযরত মুসা.-এর পক্ষ থেকে তা খণ্ডন করেন এবং বনি ইসরাইলের অপবাদ থেকে তাঁকে মুক্ত ও পবিত্র সাব্যস্ত করেন। সুতরাং, আলোচ্য আয়াত দুটির প্রত্যেকটির লক্ষ্যস্থলের নির্দিষ্টতায় ওই তিনটি রেওয়ায়েতই অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য যা হাদিসের কিতাবসমূহ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। ওই রেওয়ায়েতগুলোই উল্লিখিত আয়াত দুটির লক্ষ্যস্থল।

আরেকটি বিষয় এই : শানে-নুযুল হওয়ার জন্য একটি বিষয়কে যে নির্দিষ্ট হতে হবে তা হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি রহ.-এর মতে ঠিক নয়। শানে-নুযুলের প্রকৃত অবস্থা এই যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওতের সময়ে সংঘটিত ওইসব ঘটনা যা কোনো আয়াতের লক্ষ্যস্থল হতে পারে। ওইসব ঘটনাকেই উল্লিখিত আয়াতের জন্য সমানভাবে শানে-নুযুল বলা যেতে পারে।

এখানকার তফাসিরে আবদুল ওয়াহ্হাব নাজ্জার মিসরি 'কাসাসুল আম্বিয়া' কিতাবে একটি দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তাঁর ও মিসরের ওলামা মজলিসের মধ্যে এ-বিষয়ে যেসব আলোচনা হয়েছে সেগুলোকেও উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু আমরা উভয় ধরনের মতের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে একমত নই; বরং আমরা প্রাচীন মুফাস্সিরগণের মধ্যে ইমাদুদ্দিন বিন কাসির ও আবু হাইয়ানের প্রবল মতসমূহেরই সমর্থন করে থাকি। তাই আমরা নাজ্জারের দীর্ঘ আলোচনা পরিত্যাগ করলাম।

হযরত হারুন আ.-এর ইন্তেকাল

পূর্বে বর্ণিত ঘটনাসমূহে বলা হয়েছে যে, বনি ইসরাইল পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করতে অস্বীকার করলে আল্লাহ তাআলা মুসা আ.-এর মাধ্যমে তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, এখন তোমাদেরকে চল্লিশ বছরকাল যাবৎ এই প্রান্তরেই ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে হবে। এখন যারা প্রবেশ করতে অস্বীকার করেছে তাদের মধ্য থেকে কেউই আর পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করতে পারবে না।

তার সঙ্গে বনি ইসরাইলকে এ-কথাও বলা হয়েছিলো যে, মুসা ও হারুনও তাদের কাছেই থাকবেন। কেননা, তাদের এবং তাদের পরবর্তী বংশধরদের হেদায়েত ও নসিহতের জন্য মুসা ও হারুন আ.-এর ওখানে থাকা একান্ত আবশ্যক। বনি ইসরাইল তীহ ময়দানে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরতে ঘুরতে পর্বতের এক চূড়ার কাছে গিয়ে পৌঁছলো। পাহাড়ের এই চূড়া 'হুর' নামে বিখ্যাত ছিলো। এ-সময় হযরত হারুন আ.-এর কাছে পরলোকের ডাক এলো। তিনি ও হযরত মুসা আ. পাহাড়ের হুর চূড়ার ওপর আরোহণ করলেন। ওখানে কিছুদিন আল্লাহ তাআলার ইবাদতে মশগুল থাকলেন। একসময় হযরত হারুন আ. ইন্তেকাল করলেন। হযরত মুসা আ. তাঁর দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করার জন্য নিচে নেমে এলেন এবং বনি ইসরাইলকে হারুন আ.-এর ইন্তেকাল সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করলেন।

তাওরাত এই ঘটনাকে নিম্নবর্ণিত ভাষায় বর্ণনা করেছে :

"এরপর বনি ইসরাইলের গোটা দল কাবেস থেকে যাত্রা করে হুর নামক পাহাড়ের কাছে পৌঁছলো। আল্লাহ তাআলা হুর পাহাড়ের ওপর—যা 'আদওয়াম' সীমান্তের সঙ্গে মিলিত ছিলো—হযরত মুসা ও হারুন আ.-

কে বললেন, হারুন তার নিজের লোকদের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হবে। কেননা, আমি বনি ইসরাইলকে যে-রাজ্য দিলাম হারুন সেই রাজ্যে যেতে পারবে না। কারণ তোমরা 'মুরিবাহ'র ঝরনার কাছে আমার কথার বিপরীত কাজ করেছো। সুতরাং তুমি হারুন ও তার পুত্র আল-ইয়ারাযকে সঙ্গে নিয়ে হুর পাহাড়ের ওপর আসো এবং হারুনের পোশাক খুলে তার পুত্র আল-ইয়ারাযকে পরিয়ে দাও। কেননা, হারুন ওখানে মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়ে তার নিজেদের লোকদের সঙ্গে মিলিত হবে। মুসা আ. আল্লাহ তাআলার নির্দেশ অনুসারে কাজ করলেন। তিনি বনি ইসরাইলের গোটা দলের চোখের সামনে হুর পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করলেন। মুসা আ. হারুন আ.-এর পরিধেয় বস্ত্র খুলে তাঁর পুত্র আল-ইয়ারাযকে পরিয়ে দিলেন। হারুন আ. ওখানেই পাহাড়ের চূড়ার ওপর ইন্তেকাল করলেন। এরপর মুসা আ. ও আল-ইয়ারায পাহাড়ের চূড়া থেকে নিচে নেমে এলেন। বনি ইসরাইল শুনতে পেলো যে হযরত হারুন আ. ইন্তে কাল করেছেন। তাদের সব গোত্রের লোকেরা তিরিশ দিনব্যাপী শোক পালন করলো।"[১৩৭]

হযরত মুসা ও খিযির আলাইহিমুস সালাম

হযরত মুসা আ. এবং একজন বাতেনি ইলমে অভিজ্ঞ মহামানবের মধ্যে যে-সাক্ষাৎ ঘটেছিলো তা হযরত মুসা আ.-এর গোটা জীবনের ঘটনাবলির মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। হযরত মুসা আ. তাঁর কাছ থেকে সৃষ্টিজগতের কতিপয় রহস্য ও গোপনীয় তথ্য অবগত হয়েছিলেন। সুরা কাহফে বিস্তারিত বিবরণের সঙ্গে এই সাক্ষাতের উল্লেখ রয়েছে। আর সহিহ বুখারিতে এই ঘটনা সম্পর্কে আরো কিছু অতিরিক্ত বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে। সহিহ বুখারিতে হযরত সাঈদ বিন জুবায়ের রা. থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে : তিনি একবার আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা.-এর কাছে আরজ করলেন, নুফ আল-বাক্কালি (نوف البكالي) বলেন, হযরত খিযির আ.-এর সঙ্গী মুসা এবং বনি ইসরাইলের সঙ্গী মুসা এক ব্যক্তি নন। খিযিরের সঙ্গী মুসা হলেন অন্য মুসা। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস বললেন, আল্লাহর দুশমন মিথ্যা কথা বলছে।

[১৩৭] গণনা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৬, আয়াত ২২-২৯।

উবাই বিন কা'ব রা. আমার কাছে হাদিস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছিলেন, একদিন হযরত মুসা আ. বনি ইসরাইলের উদ্দেশে ওয়াজ করছিলেন। এ-সময় এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, 'এই যুগের সবচেয়ে বড় আলেম কে?'

হযরত মুসা আ. বললেন, 'আল্লাহ তাআলা আমাকেই সবচেয়ে বেশি ইলম দান করেছেন।' আল্লাহ তাআলা মুসা আ.-এর এ-কথা পছন্দ করলেন না। তৎক্ষণাৎ তাঁকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন, 'তোমার কর্তব্য তো এই ছিলো যে, তুমি উক্ত প্রশ্নের জবাব আল্লাহ তাআলার জ্ঞানের ওপর সোপদ করে দিয়ে বলতে, و الله اعلم আল্লাহ তাআলাই সে-সম্পর্কে ভালো অবগত আছেন।' এরপর আল্লাহ তাআলা হযরত মুসা আ.-এর প্রতি ওহি নাযিল করলেন : 'দুই সাগরের সংযোগস্থলে আমার এক বান্দা রয়েছেন। তিনি কোনো কোনো বিষয়ে তোমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী।'

হযরত মুসা আ. আরজ করলেন, 'হে আমার প্রতিপালক, আপনার ওই বান্দার কাছে কোন্ পথ দিয়ে যেতে হবে?' আল্লাহ তাআলা বললেন, 'ভাজা মাছ থলের মধ্যে রেখে দাও। এরপর যে-স্থানে মাছটি হারিয়ে যাবে ওখানেই আমার ওই বান্দাকে দেখতে পাবে।'

হযরত মুসা আ. ভাজা মাছ থলের মধ্যে রেখে তাঁর খলিফা ইউশা বিন নুনকে সঙ্গে নিয়ে ওই নেককার বান্দার সন্ধানে বের হলেন। চলতে চলতে এক জায়গায় পৌছে তাঁরা উভয়েই একটি পাথরের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। থলের মধ্যে যে-ভাজা মাছটি ছিলো তাতে প্রাণ সঞ্চারিত হলো এবং তা থলে থেকে বের হয়ে সমুদ্রে চলে গেলো। মাছটি পানির যে-অংশের ওপর দিয়ে চলে গেলো এবং যে-পর্যন্ত গেলো, ওখানকার পানি বরফের মতো জমে গিয়ে একটি ক্ষুদ্র ও সরু রাস্তার মতো হয়ে গেলো। মনে হচ্ছিলো যেনো সমুদ্রের মধ্যে একটি রেখা অঙ্কিত হয়েছে।

এই ঘটনা হযরত ইউশ আ. দেখলেন। কেননা, তিনি হযরত মুসা আ.-এর আগেই ঘুম থেকে জেগে উঠেছিলেন। কিন্তু হযরত মুসা আ. ঘুম থেকে জাগলে ইউশা আ. তাঁকে ঘটনাটি জানাতে ভুলে গেলেন। এরপর তাঁরা পুনরায় চলতে শুরু করলেন। সারাদিন ও সারারাত চলতেই

থাকলেন। দ্বিতীয় দিন ভোরে হযরত মুসা আ. বললেন, 'এখন অত্যন্ত ক্লান্তি অনুভব করছি। ওই মাছটি বের করো, তার দ্বারা ক্ষুধা নিবারণ করি।' হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হযরত মুসা আ. আল্লাহর বর্ণিত উদ্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত কোনো ক্লান্তি অনুভব করেন নি। কিন্তু পথ ভুলে যখন ওই স্থান পেরিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকলেন, তখনই তিনি ক্ষুধা অনুভব করলেন।

হযরত ইউশা আ. বললেন, আপনি নিশ্চয় জেনে থাকবেন, যেখানে আমরা পাথরের ওপর শায়িত ছিলাম, ওখানে এই বিস্ময়কর ঘটনা ঘটলো যে, অকস্মাৎ মাছটি থলের মধ্যে নড়ে উঠলো এবং থলে থেকে বের হয়ে সাগরের দিকে চলে গেলো। আর মাছটির গতিপথে সাগরের মধ্যে রাস্তা তৈরি হয়ে গেলো। আমি এই ঘটনা আপনার কাছে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। নিশ্চয় আমার ভুলে যাওয়া শয়তানের একটা চক্রান্ত ছিলো।

হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সাগরের ওই রেখাটি মাছটির জন্য (সাঁতার কাটার) পথ ছিলো আর হযরত মুসা আ. ও ইউশা আ.-এর জন্য ছিলো বিস্ময়কর ব্যাপার।

হযরত মুসা আ. বলেন, আমরা যে-স্থানটি সন্ধান করছিলা, ওটাই ছিলো সেই স্থান। এই বলে তাঁরা উভয়ে পরস্পর কথা বলতে আবার সে-পথেই ফিরে চললেন এবং ওই পাথরখণ্ডগুলোর কাছে গিয়ে পৌছলেন।

তাঁরা ওখানে পৌছে দেখলেন উত্তম পোশাক-পরিহিত একজন লোক ওখানে বসে রয়েছেন। হযরত মুসা আ. তাঁকে সালাম দিলে ওই ব্যক্তি বললেন, 'এই দেশে সালাম কোথায়? এই দেশে তো মুসলমান বাস করে না।' ইনি ছিলেন হযরত খিযির আ.।

হযরত মুসা আ. বললেন, 'আমার নাম মুসা।' খিযির আ. বললেন, 'বনি ইসরাইল বংশের মুসা?' মুসা আ. বললেন, হ্যাঁ। আমি আপনার কাছ থেকে ওই ইলম শিক্ষা করতে এসেছি যা আল্লাহ তাআলা একমাত্র আপনাকেই দান করেছেন।'

হযরত খিযির আ. বললেন, 'আপনি আমার সঙ্গে থেকে সেসব ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না। হে মুসা, আল্লাহ তাআলা আমাকে সৃষ্টিজগৎ সম্পর্কে এমন জ্ঞান দান করেছেন যা আপনাকে দান করা হয় নি।'

হযরত মুসা আ. বললেন, 'ইনশাআল্লাহ, আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। আর আপনার নির্দেশ আমি কখনো লঙ্ঘন করবো না।'
হযরত খিযির আ. বললেন, 'তবে এই শর্ত থাকলো যে, যতক্ষণ আপনি আমার সঙ্গে থাকবে ততক্ষণ কোনো ব্যাপারেই—যা আপনার দৃষ্টিতে গোচরীভূত হবে—আমাকে কোনো প্রশ্ন করতে পারবেন না। পরে আমি নিজেই আপনাকে ওসব বিষয়ের গূঢ়তত্ত্ব বলে দেবো।'
হযরত মুসা আ. এই শর্ত মেনে নিলেন এবং উভয়ই কোনো এক সাগরের দিকে চলতে লাগলেন। চলতে চলতে সামনেই একটি নৌকা দেখতে পেলেন। হযরত খিযির আ. নৌকার মাঝিদেরকে ভাড়া কত জিজ্ঞেস করলেন। তারা খিযির আ.-কে চিনতো। কাজেই তারা ভাড়া গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালো এবং তাঁদের উভয়কে অত্যন্ত সমাদর করে নৌকায় তুলে নিলো। নৌকাটি তখনো বেশিদূর অগ্রসর হয় নি, হঠাৎ খিযির আ. নৌকার সামনের অংশের একটি তক্তা খুলে ফেলে নৌকাটিকে ছিদ্র করে দিলেন। হযরত মুসা আ. ধৈর্য ধারণ করতে পারলেন না। তিনি খিযির আ.-কে বললেন, 'নৌকার মাঝিরা তো আমাদের সঙ্গে খুবই সদ্ব্যবহার করলো, আমাকে ও আপনাকে বিনা ভাড়ায় আরোহণ করালো। আর আপনি তার এই বিনিময় প্রদান করলেন যে, নৌকাটির মধ্যে ছিদ্র করে দিলেন। এর ফল তো এই হবে যে, নৌকার আরোহীরা সবাই নৌকাসহ ডুবে যাবে। এটা তো বড় অসঙ্গত কাজ হলো।' হযরত খিযির আ. বললেন, 'আমি তো আপনাকে আগেই বলেছিলাম, আপনি আমার কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না। অবশেষে তা-ই ঘটলো।' হযরত মুসা আ. বললেন, 'আমি তা ভুলে গিয়েছিলাম। সুতরাং আমি আমার ভুল ত্রুটির জন্য আমাকে পাকড়াও করবেন না এবং আমার ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন না।'
নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এই প্রথম প্রশ্নটি বাস্ত বিকই হযরত মুসা আ.-এর ভুলে যাওয়ার কারণেই হয়েছিলো। ঠিক সে-সময় একটি পাখির উড়ে এসে নৌকাটির এক পাশে বসলো এবং সমুদ্রের মধ্যে চঞ্চু ডুবিয়ে দিয়ে এক বিন্দু পানি পান করলো।

হযরত খিযির আ. বললেন, 'তুলনাহীনভাবে আল্লাহ তাআলার সীমাহীন জ্ঞানের মোকাবিলায় আমার ও আপনার জ্ঞান এমনই তুচ্ছ, যেমন সমুদ্রের অথৈ জলরাশির সামনে এই বিন্দুটি, যা পাখিটি পান করলো।'

নৌকা তীরে পৌছলো। তাঁরা উভয়ে নৌকা থেকে অবতরণ করে একদিকে যাত্রা করলেন। তাঁর সমুদ্রের তীর ধরে চলছিলেন। এক জায়গায় কিছু শিশু খেলা করছিলো। হযরত খিযির আ. এগিয়ে গিয়ে তাদের মধ্য থেকে একটি শিশুকে হত্যা করে ফেললেন। হযরত মুসা আ. আবার ধৈর্যহীন হয়ে পড়লেন। খিযির আ.-কে বললেন, 'আপনি অন্যায়ভাবে একটি নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করে ফেললেন? এটা তো অত্যন্ত অন্যায় কাজ হলো।' হযরত খিযির আ. বললেন, 'আমি তো প্রথমেই আপনাকে বলেছিলাম, আপনি আমার সঙ্গে থেকে ধৈর্য ও সহনশীলতা রক্ষা করতে পারবেন না।'

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যেহেতু এ-বিষয়টি প্রথম ঘটনার চেয়ে কঠিন ছিলো, তাই হযরত মুসা আ. ধৈর্য ধারণ করতে অপারগ ছিলেন।

হযরত মুসা আ. বললেন, 'আচ্ছা, এবারও আমাকে ক্ষমা করুন। এরপর যদি আমি আর ধৈর্য ধারণ করতে সক্ষম না হই, তবে আমার আর কোনো আপত্তি করার সুযোগ থাকবে না। এরপর আমি আমার থেকে পৃথক হয়ে যাবেন।'

তাঁরা উভয়ে আবার চলতে শুরু করলেন এবং চলতে চলতে একটি জনপদে এসে পৌছলেন। জনপদের অধিবাসীরা ছিলো সচ্ছল অবস্থাসম্পন্ন এব সব দিক থেকেই আতিথেয়তা করার উপযুক্ত। কিন্তু হযরত মুসা আ. ও খিযির আ.-এর মুসাফিরসুলভ আবেদন সত্ত্বেও জনপদবাসীরা তাঁদেরকে অতিথি হিসেবে বরণ করতে অস্বীকৃতি জানালো। তাঁরা তখনো জনপদের মধ্য দিয়ে চলছিলেন। হঠাৎ হযরত খিযির আ. এমন একটি ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন যার দেয়াল সামান্য হেলে পড়েছিলো এবং মাটিতে পতিত হওয়ার উপক্রম করছিলো। হযরত খিযির আ. হাতে ধাক্কা দিয়ে দেয়ালটিকে সোজা করে দিলেন। হযরত মুসা আ. পুনরায় খিযির আ.-কে প্রশ্ন করে বসলেন। তিনি বললেন, 'আমরা মুসাফিররূপে এই জনপদে আগমন করেছি। কিন্তু তার অধিবাসীরা আমাদের আতিথেয়তাও করলো এবং রাতযাপনের জন্য

একটু জায়গাও দিলো না। আপনি এটা কী করলেন—এই জনপদেরই একজন বাসিন্দার পতনোন্মুখ দেয়ালটিকে সোজা করে দিলেন, অথচ কোনো পারিশ্রমিক গ্রহণ করলেন না? যদি দেয়ালটি সোজা করে দিতেই হতো, তবে আমাদের ক্ষুধা ও পিপাসা নিবারণের জন্য কিছু পারিশ্রমিকই ধার্য করে নিতে পারতেন।' হযরত খিযির আ. বললেন, هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ 'এখন আপনার ও আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদের সময় এসে গেছে।' এরপর তিনি হযরত মুসা আ.-কে এই তিনটি বিষয়ের গূঢ়রহস্য বুঝিয়ে দেয়ার জন্য বললেন, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এগুলো এমন বিষয় ছিলো, যা দেখে আপনি ধৈর্য ধারণ করতে পারেন নি।'

এই ঘটনা বর্ণনা করার পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আমার মন চাচ্ছিলো যে, যদি হযরত মুসা আ. আরো কিছু সময় ধৈর্য ধারণ করতেন, তাহলে আমরা আল্লাহর সৃষ্টিরহস্যের আরো কিছু গূঢ়রহস্য জানতে পারতাম।'

হযরত মুসা আ. ও হযরত খিযির আ.-এর মধ্যে বিচ্ছেদের অবস্থা ঘটে গেলে হযরত খিযির আ. ওই ঘটনাগুলোর গূঢ়তত্ত্ব বর্ণনা করলেন। কুরআন মাজিদ এই ঘটনাকে বর্ণনা করে গূঢ়তত্ত্বগুলো প্রকাশ করেছে এভাবে—

قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا () أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا () وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا () فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا () وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا (سورة الكهف)

'সে (মুসা আ.-এর সঙ্গী খিযির) বললো, "এখানেই আপনার এবং আমার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হলো; যে-বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধারণ করতে পারেন নি আমি তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছি। নৌকাটির ব্যাপার—তা ছিলো কয়েকজন দরিদ্র লোকের, তারা সাগরে জীবিকা অন্বেষণ করতো;

আমি ইচ্ছা করলাম নৌকাটি ত্রুটিযুক্ত করতে; কারণ তাদের সামনে ছিলো এক রাজা, যে বল প্রয়োগ করে সব (ভালো) নৌকা ছিনিয়ে নিতো। (খুঁতযুক্ত মনে করে বাদশাহ নৌকাটিকে ছেড়ে দেবে।) আর কিশোরটি, তার পিতা-মাতা ছিলো মুমিন। আমি আশঙ্কা করলাম[১৩৮] যে, সে বিদ্রোহাচরণ ও কুফরির মাধ্যমে তাদেরকে বিব্রত করবে (কষ্ট ও যন্ত্রণা দেবে)। তারপর আমি চাইলাম যে, (আমি এই শিশুটিকে হত্যা করে ফেলি এবং) তাদের প্রতিপালক যেনো তাদেরকে তার পরিবর্তে এক সন্তান দান করেন, যে হবে পবিত্রতায় মহত্তর ও ভক্তি-ভালোবাসায় ঘনিষ্ঠতর। আর ওই প্রাচীরটি, তা ছিলো নগরবাসী দুই পিতৃহীন কিশোরের, এর নিচে আছে তাদের গুপ্তধন এবং তাদের পিতা ছিলো সৎকর্ম পরায়ণ। সুতরাং আপনার প্রতিপালক দয়াপরবশ হয়ে ইচ্ছা করলেন যে, তারা প্রাপ্তবয়স্ক হোক এবং তারা তাদের ধনভাণ্ডার উদ্ধার করুক। আমি নিজ থেকে কিছু করি নি। (বরং আল্লাহ তাআলার নির্দেশে করেছি।) আপনি যে-বিষয়ে ধৈর্য ধারণে অপারগ হয়েছিলেন, এই হলো তার ব্যাখ্যা।" [সুরা কাহ্ফ : আয়াত ৭৮-৮২]

কুরআন মাজিদ এই ঘটনার শুরুতে হযরত খিযির আ.-এর ইলম সম্পর্কে বলেছে, وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا 'আর আমি নিজের পক্ষ থেকে তাকে এক ইলম শিখিয়েছি।' আর ঘটনাগুলোর শেষে হযরত খিযির আ.-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছে : وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي 'আমি এই ধরাবাহিক ঘটনাগুলো আমার নিজের পক্ষ থেকে করি নি।'

এই দুটি বাক্য থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তাআলা খিযির আ.-কে কোনো কোনো বস্তুর গূঢ়তত্ত্বের জ্ঞান দান করেছিলেন। এই জ্ঞান ছিলো সৃষ্টিরহস্য এবং তার অভ্যন্তরীণ (বাতেনি) গূঢ়তত্ত্ব-সংক্রান্ত। আর এগুলো ছিলো এমন বিষয়ের প্রকাশ যার দ্বারা আল্লাহ তাআলা সত্যপন্থীদের জন্য এ-কথাটি পরিষ্কার করে দিলেন যে, যদি বিশ্বজগতের যাবতীয় গূঢ়তত্ত্ব থেকে পর্দা সরিয়ে দিয়ে উন্মোচিত করে দেয়া হয়—যেমন হযরত খিযির আ.-এর জন্য কোনো কোনো বিষয়ের গূঢ়তত্ত্ব উন্মোচিত করে দেয়া হয়েছিলো—তাহলে দুনিয়ার সমস্ত বিধানই

[১৩৮] অর্থাৎ, আমি আল্লাহর কাছ থেকে জানতে পারলাম।

পরিবর্তিত হয়ে যাবে। আর আমল ও দায়দায়িত্বের পরীক্ষার সমস্ত জগতই উল্টে-পাল্টে যাবে। কিন্তু দুনিয়া আমলের পরীক্ষাকেন্দ্র। সুতরাং, সৃষ্টিতত্ত্বের গূঢ় রহস্যসমূহ পর্দাবৃত থাকাই আবশ্যক। যেনো হক ও বাতিলের পরিচয়ের জন্য আল্লাহ তাআলা যে-পাল্লা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা অনবরত নিজের কাজ সমাধা করতে পারে।

সুরা কাহফের এই আয়াতগুলো পাঠ করলে সহজেই অনুমান করা যায় যে, মুসা আ. 'উলুল আযম' (দৃঢ়প্রতিজ্ঞ) নবী ও উচ্চ মর্যাদাশীল রাসুল ছিলেন। শরিয়তের বিধি-নিষেধ প্রচার করাই ছিলো তাঁর কর্তব্য-কর্ম। এ-কারণে তিনি সৃষ্টিতত্ত্বের ওই গূঢ়রহস্যের পদর্শনীকে সহ্য করতে পারেন নি। তিনি ধৈর্য ধারণ করে থাকার প্রতিশ্রুতি দেয়া সত্ত্বেও শরিয়ত-বহির্ভূত কর্মকাণ্ড দেখে ধৈর্য রক্ষা করতে পারেন নি। তিনি হযরত খিযির আ.-কে সম্বোধন করে ভালো কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিবৃত্ত থাকতে বলেন। এ-কারণে শেষ পর্যন্ত তাঁকে হযরত খিযির আ. থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হলো।

বুখারি শরিফের উপরিউক্ত হাদিসে সুরা কাহফে বর্ণিত ঘটনাবলি থেকে কিছু বক্তব্য অধিক বর্ণিত হয়েছে। এই বক্তব্য মূল ঘটনার সূচনা বা অধিক ব্যাখ্যাস্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। সহিহ বুখারির হাদিসে এ-কথাও বলা হয়েছে যে, ওই পুণ্যবান ব্যক্তির নাম ছিলো খিযির।

এখানে কয়েকটি বিষয় আলোচনাযোগ্য : ১. খিযির নাম না উপধি? ২. খিযির কি শুধু পুণ্যবান বান্দাই (ওলিই) ছিলেন, না নবী বা রাসুল ছিলেন? ৩. তিনি এখনো জীবিত না-কি তাঁর ইন্তেকাল হয়ে গেছে?

মুফাস্সিরগণের পক্ষ থেকে এই তিনটি প্রশ্নের জবাবে নানা ধরনের বক্তব্য ও মত বর্ণিত হয়েছে। প্রথম প্রশ্নের জবাবে কেউ কেউ বলেন, খিযির তাঁর নাম; আর কেউ কেউ বলেন, এটি তাঁর উপাধি। এরপর তাঁর নাম সম্পর্কেও বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। যেমন : বালইয়া বিন মালকান (بليا

بن ملكان); ২. ইলিয়া বিন মালকান (إيليا بن ملكان); ৩. খিযরুন, ইলয়াস, মুআম্মার, আল-ইয়াসা ইত্যাদি।[১৩৯]

দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে কেউ কেউ বলেন, তিনি কেবল পুণ্যবান বান্দা ও ওলি ছিলেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি রাসুল ছিলেন। কিন্তু জমহুর মুফাস্‌সিরগণ বলেন, খিযির আ. রাসুল ছিলেন না এবং কেবল ওলিই ছিলেন না; বরং তিনি নবী ছিলেন।

আর তৃতীয় প্রশ্নের জবাবে কতিপয় আলেমের ধারণা, খিযির আ.-কে অমরত্ব দান করা হয়েছে। তিনি এখনো জীবিত আছেন। তাঁরা এই প্রসঙ্গে কিছু কাহিনি ও রেওয়ায়েত বর্ণনা করে থাকেন। আর উচ্চ মর্যাদাশীল তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেন, খিযির আ.-এর চিরকাল জীবিত থাকার প্রমাণ কুরআনেও নেই, হাদিসেও নেই। তিনি মানবজাতির মতো স্বাভাবিক মৃত্যুতে ইন্তেকাল করেছেন।

মীমাংসা

এই তিনটি মাসআলার মীমাংসা এই : প্রথম বিষয়টি সম্পর্কে কুরআন মাজিদে কিছুই উল্লেখ করা হয় নি; হযরত খিযির আ.-এর নামও উল্লেখ করা হয় নি এবং তাঁর উপাধিও উল্লেখ করা হয় নি। 'আমার বান্দাগণের মধ্যে থেকে একজন বান্দা' বলে তাঁর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। অবশ্য বুখারি শরিফ ও মুসলিম শরিফের সহিহ হাদিসে তাঁকে খিযির নামে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং, আমরা যদি ঐতিহাসিক বর্ণনার দ্বারা তাঁর নাম ও উপাধির সন্ধান লাভ করতে পারতাম তবে সহজেই এ-কথা বলতে পারতাম, এটা তাঁর নাম আর ওটা তাঁর উপাধি। কিন্তু এ-সম্পর্কে ইতিহাসের বর্ণনা এতো এলোমেলো যে, তা দ্বারা কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। আমাদের সামনে তাঁর ব্যক্তিত্বের পরিচয় শুধু এতটুকু আছে যে, তাঁকে খিযির বলা হয়েছে। আর এই যে, তিনি হযরত মুসা আ.-এর সময়সাময়িক ছিলেন। এর চেয়ে অতিরিক্ত তাঁর নাম বা

---

[১৩৯] ইমাদুদ্দিন বিন কাসির রহ. বলেছেন, খিযির আ.-এর বংশধালা এমন : بليا بن ملكان بن فالغ بن عامر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام (বালইয়া বিন মালকান বিন ফালিগ বিন আমির বিন শালিখ বিন আরফাখাশাদ বিন সাম বিন নুহ আ.।)

তাঁর উপাধি অথবা তাঁর বংশপরিচয়-সম্পর্কিত যাবতীয় আলোচনা প্রমাণহীন এবং শুধু আনুমানিক কথার পর্যায়ভুক্ত।

আর দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা সম্পর্কে প্রবল মত এই যে, তিনি নবী ছিলেন। কেননা, কুরআনে যেভাবে তাঁর মর্যাদা উল্লেখ করা হয়েছে, তা কেবল নবুওতের মর্যাদার জন্যই প্রযোজ্য হতে পারে। ওলিত্বের মর্যাদা তার চেয়ে অনেক নিম্নস্তরের। যেমন : খিযির আ. যখন বালকটিকে হত্যা করার কারণ বর্ণনা করলেন, তখন তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এটাও বললেন, 'এই কাজ আমি আমার স্বাধীন ইচ্ছায় করি নি; বরং আমার প্রতিপালকের রহমতের বদৌলতে হয়েছে।' বলা বাহুল্য, কোনো ওলির পক্ষে সম্ভব নয় যে, তিনি ইলহাম দ্বারা অর্থাৎ, ইলহামপ্রাপ্ত হয়ে কাউকে হত্যা করে ফেলেন। কেননা, ইলহামের মধ্যে ভুল বোঝার সম্ভাবনা রয়েছে। আর এ-কারণেই আউলিয়া কেরামের কাশফের মধ্যে বিপুল পরিমাণ বৈপরীত্য পাওয়া যায়। এজন্যই আউলিয়া কেরামের কাশফ ও ইলহামকে শরিয়তের দলিল বলে গণ্য করা হয় নি।

সুতরাং, সৃষ্টি-বিষয়ক গূঢ়তত্ত্বসমূহের মধ্যে একটি রহস্যময় গূঢ়তত্ত্ব যার অনুষ্ঠান বাহ্যিক দৃষ্টিতে অত্যন্ত খারাপ ও খুব বড় অপরাধ—এমন বিষয় কেবল আল্লাহর ওহি দ্বারাই সম্পন্ন হতে পারে। এ-আয়াতটি ছাড়া হযরত মুসা আ. ও হযরত খিযির আ.-এর মধ্যকার কথোপকথনকে যে-বর্ণনাশৈলীতে ব্যক্ত করা হয়েছে, তা-ও এ-কথার সমর্থন করে যে, খিযির আ. নবী ছিলেন। এ-কারণেই হযরত মুসা আ.-এর মতো উচ্চস্তরের নবী হযরত খিযির আ.-এর সাহচর্য লাভ এবং তাঁর সৃষ্টিরহস্য-সম্পর্কিত জ্ঞান চাক্ষুষ দর্শনের জন্য আবদার করেছিলেন এবং এ-কারণেই হযরত খিযির আ.-কে গর্বের সঙ্গে নিজের জ্ঞানবত্তার প্রকাশ ও হযরত মুসা আ.-এর জ্ঞানের সঙ্গে তুলনা করতে দেখা যাচ্ছে।

তবুও নবুওত ও রিসালাতের যাবতীয় পূর্ণতামূলক গুণের বিচারে হযরত মুসা আ.-এর মর্যাদা হযরত খিযির আ.-এর মর্যাদা অপেক্ষা অনেক উর্ধ্বে। কেননা, মুসা আ. আল্লাহ তাআলার নবী ছিলেন এবং উচ্চ মর্যাদাশীল রাসুলও ছিলেন। তিনি নতুন শরিয়তের ধারক, আসমানি কিতাবের বাহক এবং রাসুলগণের মধ্যেও উলুল আযম (দৃঢ়প্রতিজ্ঞ) রাসুল। সুতরাং হযরত খিযির আ.-এর আংশিক জ্ঞান—যা সৃষ্টিজগতের

গূঢ়তত্ত্ব-সম্পর্কিত জ্ঞানের সঙ্গে সম্পৃক্ত—হযরত মুসা আ.-এর শরিয়ত-সম্পর্কিত ব্যাপক জ্ঞানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে পারে না।

আর তৃতীয় বিষয় সম্পর্কে গবেষক উলামায়ে কেরামেতর মতই বিশুদ্ধ মত। তাঁরা এই মত পোষণ করেন যে, হযরত খিযির আ. অমর নন এবং তিনি স্বাভাবিক আয়ুষ্কালের পর ইন্তেকাল করেছেন। কেননা, কোনো মানুষকেই আল্লাহ তাআলা চিরস্থায়ী জীবন দান করেন নি এবং এই পৃথিবীতে মানুষের মৃত্যু একটা বাস্তব ব্যাপার।

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদে বলেন—

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ (سورة الأنبياء)

'আমি তোমার পূর্বেও কোনো মানুষকে অনন্ত জীবন দান করি নি; সুতরাং তোমার মৃত্যু হলে তারা চিরঞ্জীব হয়ে থাকবে?' [সুরা আম্বিয়া : আয়াত ৩৪]

তা ছাড়া কুরআন মাজিদে এটাও বলা হয়েছে যে, "আমি প্রত্যেক নবী থেকে প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছি : হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নবুওতের যুগ এলে তোমাদের মধ্য থেকে যে-কেউ তখন জীবিত থাকবে, তার ওপর আবশ্যক হবে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর ঈমান আনা এবং তাঁকে সাহায্য করা।" বস্তুত, আম্বিয়াকে কেরাম সবাই এর স্বীকৃতি প্রদান করেছেন এবং তাঁদের ও আল্লাহ তাআলার মধ্যে সাক্ষ্য ও প্রতিজ্ঞা বেশ শক্তিশালী ও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে—

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (سورة آل عمران)

'আর স্মরণ করো (সেই সময়ের কথা,) যখন আল্লাহ নবীদের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন যে, "তোমাদেরকে কিতাব ও হেকমত যা কিছু দান করেছি এরপর তোমাদের কাছে যা আছে তার সমর্থকরূপে যখন একজন রাসুল আসবে, তখন তোমরা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে।" তিনি বললেন, "তোমরা কি স্বীকার করলে?

এবং এই সম্পর্কে আমার অঙ্গীকার কি তোমরা গ্রহণ করলে?" তারা বললো, "আমরা স্বীকার করলাম।" তিনি বললেন, "তবে তোমরা সাক্ষী থাকো, আমিও তোমাদের সঙ্গে সাক্ষী থাকলাম।" [সুরা আলে ইমরান : আয়াত ৮১]

সুতরাং, হযরত খিযির আ. যদি জীবিত থাকতেন তবে তাঁর ওপর ফরয ছিলো প্রকাশ্যভাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে হাজির হয়ে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁর সঙ্গে সব জিহাদে অংশগ্রহণ করে সাহায্য-সহযোগিতা করা। কিন্তু কোনো সহিহ হাদিস দ্বারা এসব বিষয়ের কোনো একটি বিষয়েরও প্রমাণ পাওয়া যায় না। অথচ বদর, হুনাইন ইত্যাদি জিহাদে হযরত জিবরাইল আ. এবং অন্যান্য ফেরেশতার সাহায্য ও সহযোগিতার বিবরণ পর্যন্ত ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ রয়েছে।

কুরআন মাজিদের এই আয়াতগুলো ছাড়াও সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম শরিফের নিম্নবর্ণিত হাদিসগুলোর এই আকিদাকে খণ্ডন করছে যে, হযরত খিযির আ. অমরত্ব লাভ করেছেন এবং তিনি এখনো জীবিত আছেন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর রা. বলেন, কোনো এক রাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এশার নামায শেষে বললেন, "এই রাতে তোমরা কী দেখেছো? এ-কথা প্রকাশ থাকে যে, এক শতাব্দী অতীত হওয়ার পর এদের মধ্যে আর একজন্য জমিনের ওপর জীবিত থাকবে না।"

এই সহিহ হাদিসটির ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে হযরত খিযির আ.-এর চিরস্থায়ী জীবন লাভের কোনো অবকাশই থাকে না। এই হাদিসের অর্থের ব্যাপকতা থেকে তিনি বাদ আছেন এ-কথাও কোনো রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয় না। অথচ এই রেওয়াতেটি সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম শরিফ ছাড়াও বিভিন্ন সনদে হাদিসের অন্যান্য কিতাবেও বর্ণিত হয়েছে।

এ-কারণেই বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাফেয ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা এই দাবি করেছেন, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম রা. থেকে এমন একটি হাদিসও বর্ণিত হয় নি, যার দ্বারা প্রমাণিত হতে পারে যে, হযরত খিযির আ. এখনো জীবিত আছেন।

বরং এর বিপরীতে কুরআন মাজিদের আয়াতসমূহ এবং সহিহ হাদিসসমূহ জোরালোভাবে তাঁর মৃত্যু হওয়াকেই সমর্থন করছে।

শাইখুল ইসলাম তাকিয়ুদ্দিন বিন তাইমিয়া রহ., ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা রহ., ইমাদুদ্দিন বিন কাসির রহ., আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযি রহ., ইমাম ইসমাইল বুখারি রহ., কাজি আবুল ইয়ালা হাম্বলি, আবু তাহের বিন আল-গুরাবি রহ., আলি বিন মুসা আর-রেযা রহ., আবুল ফযল মুরাইসি রহ., আবু তাহের বিন আল-ইবাদি রহ., আবুল ফযল বিন নাসির রহ., কাজি আবু বকর বিন আল-আরাবি রহ., আবু বকর মুহাম্মদ বিন আল-হাসান রহ., প্রমুখ উচ্চ মর্যাদাশীল মুহাদ্দিস ও মুফাস্‌সির হযরত খিযির আ.-এর ইন্তেকাল করেছেন বলেই মত পোষণ করতেন।

সুতরাং, যে-সকল আলেম হযরত খিযির আ. জীবিত রয়েছেন বলে 'ইজমা'র দলিল বর্ণনা করেছেন, তা নিশ্চিতভাবেই সনদহীন। বিখ্যাত মুফাস্‌সির আবু হাইয়ান আল-আন্দালুসি 'ইজমা'র দাবির বিরুদ্ধে এই দাবি করেছেন যে, অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মত এটাই যে, হযরত খিযির আ. ইন্তেকাল করেছেন।

উপরিউক্ত আলোচনার সারমর্ম : আল্লাহ তাআলা হযরত মুসা আ.-এর সাক্ষাৎ এমন বুযুর্গ ব্যক্তির সঙ্গে করিয়েছিলেন যাঁর নাম ছিলো খিযির। তাঁকে সৃষ্টিজগতের গূঢ়তত্ত্ব সম্পর্কে এমন কতিপয় জ্ঞান দান করা হয়েছিলো যা হযরত মুসা আ.-কে দান করা হয় নি। হযরত মুসা আ.-এর স্তর ও মর্যাদা হযরত খিযির আ.-এর মর্যাদা থেকে অনেক উর্ধ্বে ছিলো। কুরআন মাজিদ হযরত খিযির আ.-এর আলোচনা যেভাবে করেছে তা থেকে প্রমাণিত হয় যে তিনি নবী ছিলেন। তারপরও উত্তম মনে হয় যে, কুরআন মাজিদ এই ব্যাপারটাকে যেভাবে অস্পষ্ট রেখেছে, আমরা কেবল ততটুকুর ওপরই ঈমান রাখি এবং তার চেয়ে অধিক তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত না হই। এটাই হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা.-এর বক্তব্য।

আর হযরত খিযির আ.-এর চিরস্থায়ী জীবন লাভ করার ব্যাপারে শরিয়তসম্মত ও ঐতিহাসিক কোনো প্রমাণই নেই। সুতরাং, নিঃসন্দেহে এ-কথা বলা যেতে পারে যে, তিনিও স্বাভাবিক বয়সে উপনীত হয়ে আল্লাহ তাআলার ডাকে সাড়া দিয়েছেন।

হযরত খিযির আ.-এর ঘটনা সম্পর্কে আরো অনেক বিচিত্র ও বিস্ময়কর বর্ণনা তাফসির ও ইতিহাসের কিতাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে। গবেষকগণের মতে, তার সবগুলোই অমূলক ও ইসরাইলি রেওয়ায়েত থেকে সংগৃহীত। সুতরাং নির্ভরযোগ্য নয়।[১৪০]

'দুই সমুদ্রের সংযোগস্থল'—এখানে কোন্ দুই সমুদ্র এবং তাদের সংযোগস্থল বলতে কোন্ স্থানটি উদ্দেশ্য, এ-সম্পর্কে মুফাস্সির ও ইতিহাসবেত্তাদের বিভিন্ন অভিমত বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু তাঁদের যাবতীয় অভিমতের মধ্যে কোনো অভিমতই মীমাংসামূলক নয়। অবশ্য যাঁরা সাগর দুটিকে ভূমধ্য সাগর ও লোহিত সাগর এবং তাদের সংযোগস্থল উদ্দেশ্য করেছেন তাঁরা কিয়াস ও যৌক্তিকতার নিকটবর্তী বলে মনে হয়। আর এটা যে-সময়ের ঘটনা, তখন সম্ভবত এই দুটি সাগরের মধ্যে একটি মিলনরেখা বিদ্যমান ছিলো। যার ওপর হযরত খিযির আ. ও হযরত মুসা আ.-এর মধ্যকার এই ঘটনা ঘটেছিলো। কেননা, মিসর থেকে বের হওয়া এবং তীহ ময়দানে অবস্থানের সময় বাহ্যিকভাবে এই দুটি সমুদ্রের সঙ্গেই এই ঘটনা সম্পর্কিত হতে পারে। হযরত আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি রহ. বলেন, এটা ওই স্থান, যাকে আজকাল আকাবা নামে বিখ্যাত হয়েছে।

হযরত মুসা আ.-এর ইন্তেকাল

ইতোপূর্বে যেসব ধৈর্যের পরীক্ষামূলক অবস্থার কথা আলোচনা করা হয়েছে সেসব অবস্থায়ই হযরত মুস আ. যথারীতি বনি ইসরাইলের হেদায়েত ও সংশোধনের কাজে নিমগ্ন ছিলেন। একজন 'উলুল আযম' (দৃঢ়প্রতিজ্ঞ) নবী রাসুল যেমন কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করে এবং সমস্ত বিরোধিতা ও শত্রুতা সহ্য করে ধৈর্যের সঙ্গে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন এবং সত্যের পথে অবিচল থাকেন হযরত মুসা আ. তা-ই করেছিলেন। অবশেষে তাঁর পরকালের ডাকে সাড়া দেয়ার সময় চলে এলো।

---

[১৪০] বিস্তরাতি আলোচনার জন্য দেখুন : আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১ম খণ্ড: আল-বাহরুল মুহিত, ২য় খণ্ড; রুহুল মাআনি, ১৫শ খণ্ড; উমদাতুল কারি শারহু সহিহিল বুখারি, বদরুদ্দিন আল-আইনী, ৭ম খণ্ড; আল-ইসাবা, ১ম খণ্ড।

সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম শরিফে হযরত মুসা আ.-এর ওফাতের ঘটনা বিবৃত হয়েছে এভাবে :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَفَقَأَ عَيْنَهُ فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لاَ يُرِيدُ الْمَوْتَ - قَالَ - فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ فَلَهُ بِمَا غَطَّتْ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ قَالَ أَىْ رَبِّ ثُمَّ مَهْ قَالَ ثُمَّ الْمَوْتُ. قَالَ فَالآنَ فَسَأَلَ اللَّهَ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ' فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ لأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ تَحْتَ الْكَثِيبِ الأَحْمَرِ '.

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, যখন হযরত মুসা আ.-এর ওফাতের সময় নিকটবর্তী হলো, তখন মৃত্যুর ফেরেশতা তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, 'আপনার প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দিন।' হযরত মুসা আ. মৃত্যুর ফেরেশতাকে এমন চপেটাঘাত করলেন যে তাঁর একটি চোখ নষ্ট হয়ে গেলো। তখন তিনি আল্লাহ তাআলার দরবারে গিয়ে অভিযোগ পেশ করলেন, 'আপনার ওই বান্দা মরতে ইচ্ছুক নন। আরো ব্যাপার এই যে, তিনি আমাকে এক চড় কষিয়েছেন।' আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় মৃত্যুদূতের চোখ ভালো হয়ে গেলো। তাঁর প্রতি আদেশ হলো, তুমি মুসার কাছে গিয়ে বলো, আল্লাহপাক আপনাকে বলেছেন, 'হে মুসা, কোনো বলদের কোমরের ওপর তোমার হাত রেখে দাও। যে-পরিমাণ পশম তোমার হাতের মুঠোর তলায় আসবে আমি তার প্রতিটি পশমের পরিবর্তে তোমার আয়ু এক বছর বাড়িয়ে দেবো।' ফেরেশতা আবার মুসা আ.-এর খেদমতে গিয়ে তাঁকে আল্লাহ তাআলার বাণী শুনালেন। হযরত মুসা আ. বললেন, 'হে আল্লাহ, এই আয়ু বৃদ্ধির পরিণাম কী হবে?' আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে জবাব এলো, 'অবশেষে ওই মৃত্যুই।' হযরত মুসা আ. বললেন, 'যদি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতম জীবনেরও পরিণাম মৃত্যুই হয়, তবে মৃত্যু আজকেই আসুক।' এরপর তিনি আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন, 'ইয়া রাব্বুল আলামিন, এই অন্তিম সময়ে আমাকে পবিত্র ভূমির নিকটবর্তী করে দিন।'

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, 'আমি যদি ওখানে যেতে পারতাম তাহলে তোমাদেরকে হযরত মুসা আ.-এর

কবরের চিহ্ন দেখিয়ে দিতে পারতাম : তিনি লাল টিলার (কাসিবে আহমার) কাছে এই স্থানে সমাহিত হয়েছেন।'[১৪১]

জিয়া মুকাদ্দেসি বলেন, 'আরিহা নামক স্থানে লাল টিলার (কাসিবে আহমার) কাছে একটি সমাধি রয়েছে। একে হযরত মুসা আ.-এর সমাধি বলা হয়ে থাকে।' জিয়া মুকাদ্দেসির উক্তিটি অন্যান্য ভাষ্যের তুলনায় বিশুদ্ধ। কেননা, পবিত্র ভূমির আরিহা জনপদটিই তীহ প্রান্তরের সবচেয়ে নিকটবর্তী ছিলো এবং এখানেই কাসিবে আহমার বা লাল টিলা অবস্থিত, যার উল্লেখ হাদিস শরিফে রয়েছে।[১৪২]

সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম শরিফের উল্লিখিত হাদিসে মৃত্যুর ফেরেশতার সঙ্গে হযরত মুসা আ.-এর যে-ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সে-সম্পর্কে ইবনে কুতাইবা[১৪৩] বলেন, তা একটি প্রতীকি ঘটনা।[১৪৪]

আমাদের মতে, এই ঘটনায় মানুষের জীবন ও মৃত্যুর বিষয়টিকে এমন ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে এই শৃঙ্খলের যাবতীয় আবশ্যক ও গুরুত্বপূর্ণ কড়াগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অর্থাৎ, যাতে এ-কথা প্রকাশিত হয়ে পড়ে যে, মানুষ যদি নবুওত ও রিসালাতের গুরুত্বপূর্ণ পদেও অধিষ্ঠিত থাকে, তবুও সে মানবিক স্বভাবের কারণে মৃত্যুকে একটি অপছন্দনীয় ব্যাপারই মনে করে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা যখন তার সামনে মৃত্যুর স্বরূপ উন্মোচিত করে দেন, তখন তাঁর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত বান্দাগণের জন্য তা সর্বাধিক পছন্দনীয় বিষয় হয়ে ওঠে। তা ছাড়া এটাও যেনো স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মৃত্যু কারো কাছে প্রিয় ও পছন্দনীয়ই হোক আর ঘৃণ্য ও অপছন্দনীয়ই হোক, চূড়ান্ত বিচারে তা একটি অটল আদেশ। এর থেকে কোনো অবস্থাতেই পলায়নের পথ নেই। আমাদের

---

[১৪১] সহিহ বুখারি : হাদিস ৩২২৬; সহিহ মুসলিম : হাদিস ৬২৯৭।

[১৪২] ফাতহুল বারি, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪৩।

[১৪৩] আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ বিন মুসলিম বিন কুতাইবা আদ-দিনুরি (৮২৮-৮৮৯ খ্রিস্টাব্দ)। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ :

تأويل مشكل القرآن؛ تأويل مختلف الحديث؛ كتاب الاختلاف في اللفظ؛ الرد على الجهمية والمشبهة؛ كتاب الصيام؛ دلالة النبوة؛ إعراب القرآن؛ تفسير غريب القرآن.

[১৪৪] ফাতহুল বারি, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪৩।

এই কামনা করা উচিত নয় যে, আমাদের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পাক; আমাদের এই আকাঙ্ক্ষা করা উচিত যে, জীবনের যে-সময়টুকু আমরা লাভ করেছি তা যেনো পবিত্রতা ও উন্নত চরিত্রের সঙ্গে পূর্ণ হয়। যাতে আল্লাহ তাআলার রহমত লাভ করা যায় এবং মৃত্যু সত্যিকারের অনন্ত জীবনে পরিণত হয়।

সুতরাং, এখন আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত উল্লিখিত হাদিসের বাক্যগুলোর ব্যাখ্যা এমনই হওয়া সমীচীন। হযরত মুসা আ.-এর খেদমতে প্রথম যখন মৃত্যুর ফেরেশতা আগমন করলেন তখন তিনি মানুষের আকৃতিতে আগমন করেছিলেন। হযরত মুসা আ. তাঁকে এই অবস্থায় দেখে চিনতে পারেন নি। যেমন : হযরত ইবরাহিম আ. ও হযরত লুত আ. আযাবের ফেরেশতাগণকে প্রথমে চিনতে পারেন নি। হযরত মুসা আ.-এর কাছে এটা অপছন্দনীয় ব্যাপার মনো হলো যে, একজন অপরিচিত লোকের বিনা অনুমতিতে তাঁর নির্জন কক্ষে ঢুকে পড়া এবং তাঁকে মৃত্যুর সংবাদ দেয়ার কী অধিকার থাকতে পারে? এই ভেবে তিনি মৃত্যুদূতের গালের ওপর সজোরে চড় কষালেন। ফেরেশতা মানুষের আকৃতিতে এসেছিলেন। মানুষের মুখে চড় কষালে যে-ফল দাঁড়ায়, এখানেও তা-ই ঘটলো। ফেরেশতার একটি চোখ বিনষ্ট হয়ে গেলো। কিন্তু আযাবের ফেরেশতারা ধীরে ধীরে হযরত ইবরাহিম আ. ও হযরত লুত আ.-এর কাছে নিজেদের পরিচয় তুলে ধরেছিলেন, আর মুসা আ.-এর ক্ষেত্রে মৃত্যুর ফেরেশতা তাঁকে কোনো কিছু না জানিয়ে তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন এবং আল্লাহ তাআলার দরবারে গিয়ে পৌঁছলেন। আল্লাহ তাআলা পুনরায় তাঁকে ফেরেশতার আকৃতিতে ফিরিয়ে নিলেন এবং এভাবে তিনি ওই ক্ষত থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন। যা মানবাকৃতিতে থাকার অবস্থায় চোখ হারানো ফলে সৃষ্টি হয়েছিলো।

মৃত্যুর ফেরেশতা হযরত মুসা আ.-এর মনোভাব বুঝতে না পেরে মনে করলেন, হযরত মুসা আ. মৃত্যুর নাম শুনে ক্রোধান্বিত হয়ে উঠেছেন এবং তিনি মৃত্যু চান না। তাই তিনি আল্লাহর দরবারে গিয়ে বললেন, 'আপনার এই বান্দা মৃত্যু চান না।' আল্লাহ তাআলা ফেরেশতার ভুল বুঝা এবং হযরত মুসা আ.-এর মর্যাদা উভয়টি প্রকাশ করার জন্য ফেরেশতাকে বললনে, 'তুমি আবার যাও এবং মুসাকে আমার এই পয়গাম শোনাও।' একটি ফেরেশতা আল্লাহর পক্ষ থেকে পয়গাম লাভ

করছিলেন আর অপর দিকে হযরত মুসা আ. অপরিচিত লোকটি হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার ফলে সঙ্গে সঙ্গে অনুধাবন করে ফেললেন যে, এটা মানবীয় ব্যাপার থেকে ভিন্ন, অন্য জগতের বিষয়। এরপর মৃত্যুর ফেরেশতা যখন পুনরায় এসে হযরত মুসা আ.-কে আল্লাহ তাআলার পয়গাম শুনালেন, তখন মুসা আ.-এর সুর ও কথা-বার্তার ধরন সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম হয়ে গেলো। অবশেষে তিনি সর্বোচ্চ বন্ধুর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হলেন। আর মৃত্যু নিকটবর্তী হওয়ার সময় যে-কয়েকটি ঘণ্টা ছিলো, তা এইভাবে মৃত্যুর পূর্বে উপদেশ ও নসিহত গ্রহণের উপকরণ হয়ে থাকলো।

সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম শরিফের উল্লিখিত হাদিসের ভাবার্থের এটাই সবচেয়ে যথার্থ বিশ্লেষণ। এ-প্রসঙ্গে উলামায়ে কেরামের মধ্যে যেসব জটিলতা ও জিজ্ঞাসা আলোচিত হয়ে থাকে, এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে তার সমাধান হয়ে যায়।

তাওরাত ও ইতিহাসের কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত মুসা আ.-এর বয়স হয়েছিলো একশো বিশ বছর। আর হযরত ইবরাহিম আ.-এর ইন্তেকাল ও হযরত মুসা আ.-এর জন্মের মধ্যবর্তী সময় প্রায় দুইশো পঞ্চাশ বছর।

তাওরাতের বিভিন্ন অংশে হযরত মুসা আ.-এর ইন্তেকালের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তার মধ্যে এক অংশে নিম্নরূপে বর্ণিত হয়েছে :

"আর মুসা 'মু-আব'-এর প্রান্তরগুলোর মধ্য থেকে 'বনু'র পর্বতশ্রেণির 'পসগা'র চূড়ায় আরোহণ করলেন, যা 'আরিহু' (আরিহা) নামক জনপদের সামনে অবস্থিত। আল্লাহ তাআলা 'জালআদ' থেকে শুরু করে 'রান' পর্যন্ত সমস্ত ভূমি তাঁকে দেখালেন। আর পেছনের সমুদ্র পর্যন্ত 'নাফতালে'র সমগ্র ভূমি, দক্ষিণের রাজ্য, আরিহু (আরিহা) উপত্যকা, যা ছিলো ধনভাণ্ডারের শহর এবং আরিহু উপত্যকার 'সুগার' প্রান্তর পর্যন্ত মুসা আ.-কে দেখালেন। আর আল্লাহ তাআলা তাঁকে বললেন, এটাই সেই রাজ্য, যার ব্যাপারে আমি ইবরাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবকে কসম খেয়ে বলেছিলাম, এই রাজ্য আমি তোমাদের বংশধরদেরকে দান করবো। সুতরাং আমি এই ব্যবস্থা করলাম, যেনো তুমি তা নিজের চোখে দেখতে পাও। তুমি কিন্তু ওখানে যেতে পারবে না। এরপর আল্লাহ তাআলার বান্দা আল্লাহর কথা অনুযায়ী 'মু-আব' রাজ্যে ইন্তেকাল

করলেন এবং ওখানে 'মু-আব'-এর একটি উপত্যকায় 'বাইতে ফাগফুরে'র সামনে তাঁকে সমাহিত করা হলো। আজ পর্যন্ত তাঁর সমাধি সম্পর্কে কেউই অবগত নয়। আর মৃত্যুর সময় মুসা আ.-এর বয়স হয়েছিলো একশো বিশ বছর। অথচ তাঁর দৃষ্টিশক্তিও ঝাঁপসা হয় নি এবং তাঁর দেহের স্বাভাবিক শক্তিও দুর্বল হয় নি।"[১৪৫]

বনি ইসরাইলের জাতিগত স্বভাব এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নেয়ামত স্মরণ করিয়ে দেয়া

হযরত মুসা আ. এবং বনি ইসরাইলের ঘটনাবলি বিস্তারিতভাবে পাঠ করলে যে-বিষয়টি সর্বপ্রথম চোখের সামনে ভেসে ওঠে তা হলো বনি ইসরাইলিদের এক বিচিত্র ধরনের পরিবর্তনশীল স্বভাব। অবাধ্যাচরণ, অনুগ্রহ ভুলে যাওয়া, কলহ-বিবাদ বিস্তার, হিংসা-বিদ্বেষ তাদের জাতিগত স্বভাবের মূল উপাদান বলে পরিলক্ষিত হয়। খুব সম্ভব, তাদের জাতিগত স্বভাবের এই বিশৃঙ্খলা ও হীনতা কয়েক শতাব্দীর দাসত্বের ফল ছিলো। কেননা, যাবতীয় দোষের মধ্যে দাসত্ব এমন একটি দোষ যা মানুষের মধ্যে চরিত্রিক নীচতা, হীনতা ও হিংসা-বিদ্বেষের মতো অপবিত্র ও হীন স্বভাব সৃষ্টি করে দেয়।

বলা বাহুল্য, এমন জাতিকে সরল পথে আনয়ন করা বা সরল পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য নবী ও রাসুলগণকে কঠিন থেকে কঠিনতম প্রতিকূল অবস্থার শিকার হতে হয় এবং দুরতিক্রম্য মঞ্জিলসমূহের সম্মুখীন হতে হয়। এবং এটাই সবসময় হয়ে এসেছে। আর বনি ইসরাইলের জীবনে হযরত মুসা আ.-ই প্রথম নবী, যাঁর নবীসুলভ প্রচেষ্টায় তারা দাসত্ব থকে মুক্তি লাভ করেছে এবং জীবনে স্বাধীনতার সুখ ভোগ করার সুযোগ পেয়েছে। সুতরাং, মুসা আ.-কেই বনি ইসরাইলের জাতিগত নিকৃষ্ট স্বভাবের সম্মুখীন হওয়া এবং তাদের চরিত্র সংশোধনের জন্য কঠিন থেকে কঠিনতম দুঃখ-যন্ত্রণাসমূহ সহ্য করতে হয়েছে।

আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেও এমন জাতির সংশোধন ও হেদায়েতের জন্য বিধান (তাওরাত) নাযিল করা ছাড়াও বহু সংখ্যক মুজেযা ও

---

[১৪৫] ইস্তিসনা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৩৪, আয়াত ১-৭।

নিদর্শন প্রদর্শন করা হয়েছে। যেনো এভাবে তাদের পরিবর্তনশীল বিভ্রান্তিমূলক স্বভাবের মধ্যে শৃংখলা ও সামঞ্জস্য তৈরি হয় এবং তাদের মধ্যে সত্য গ্রহণ করা এবং সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়।

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদের সুরা বাকারা, সুরা আ'রাফ ও সুরা ইবরাহিমে এসব নিদর্শন বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, 'সময়সমায়িক জাতিগুলোর মধ্যে বনি ইসরাইলই ছিলো তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ এবং দান ও ইহসানের কেন্দ্রস্থল।'

কিন্তু আফসোস! এসব নেয়ামত ও দয়া এবং ক্ষমা ও অনুগ্রহ অধিক হওয়া সত্ত্বেও বনি ইসরাইলের অবাধ্যাচার, নাফরমানি, বিদ্রোহ ও চারিত্রিক পরিবর্তন মাঝে মাঝেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠতো এবং থেমে থেমে আত্মপ্রকাশ করতো। অবশেষে তারা আল্লাহ তাআলার চিরস্থায়ী লানত ও গযবকে তাদের গর্বের উপকরণ বানিয়ে নিলো। এভাবে তারা চিরকালের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের সম্মান থেকে বঞ্চিত হওয়ার কলঙ্ক বরণ করে নিলো।

সুরা বাকারার আয়াতগুলোতে যা বলা হয়েছে তা এই—

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ

'হে বনি ইসরাইল, আমার সেই অনুগ্রহকে স্মরণ করো যার দ্বারা আমি তোমাদেরকে অনুগৃহীত করেছিলাম।' [সুরা বাকারা : আয়াত ৪০, ৪৭, ১২২]

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ

'স্মরণ করো, যখন আমি ফেরআউনি সম্প্রদায় থেকে তোমাদেরকে নিষ্কৃতি দিয়েছিলাম।' [সুরা বাকারা : আয়াত ৪৯]

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

'আর যখন আমি মুসাকে কিতাব ও ফুরকান দান করেছিলাম যাতে তোমরা হেদায়েতপ্রাপ্ত হও।' [সুরা বাকারা : আয়াত ৫৩]

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ

'স্মরণ করো, যখন তোমরা বলেছিলে, হে মুসা, আমরা একই রকম খাদ্যে কখনো ধৈর্য ধারণ করবো না।' [সুরা বাকারা : আয়াত ৬১]

وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا

'স্মরণ করো, যখন মুসা তার সম্প্রদায়ের জন্য পানি প্রার্থনা করলো, আমি বললাম; "তুমি লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করো। ফলে তা থেকে বারোটি প্রস্রবণ প্রবাহিত হলো।' [সুরা বাকারা : আয়াত ৬০]

সুরা আ'রাফে যে-অনুগ্রহের কথা বলা হয়েছে তা এই—

وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ

'স্মরণ করো, আমি তোমাদেরকে ফেরআউনের অনুসারীদের হাত থেকে উদ্ধার করেছি যারা তোমাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিতো। তারা তোমাদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করতো এবং তোমাদের নারীদেরকে জীবিত রাখতো।' [সুরা আ'রাফ : আয়াত ৪১]

সুরা ইবরাহিমে বলা হয়েছে—

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ

'স্মরণ করো (সেই সময়ের কথা,) যখন মুসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিলো, "হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো, যখন তিনি তোমাদেরকে ফেরআউনি সম্প্রদায় থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছিলেন।' [সুরা ইবরাহিম : আয়াত ৬]

উল্লিখিত আয়াতসমূহে এসব ঘটনারই আলোচনা রয়েছে এবং চক্ষুষ্মান লোকদের উপদেশ গ্রহণের জন্য শত-সহস্র উপকরণ রয়েছে।

অবশ্য কুরআন মাজিদ বনি ইসরাইলের জাতীয় জীবনের যে-চিত্র অঙ্কন করেছে, তাওরাতেও তার দৃঢ় সমর্থন রয়েছে। এসব বিষয় সামনে রেখে এই প্রশ্ন উত্থাপিত করা যায় যে, আল্লাহ তাআলা এমন এক জাতিকে এত নেয়ামত ও ফযিলতের জন্য কেনো মনোনীত করলেন? সমস্ত প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয়ের পরিজ্ঞাতা আল্লাহ তাআলা প্রথম থেকেই কেনো এই অবাধ্যাচারী দুর্বিনীত জাতিকে পরিত্যাগ করলেন না এবং নেয়ামত ও ফযিলতের ধারা অন্য জাতির প্রতি ফিরিয়ে দিলেন না?

এই জিজ্ঞাসার জবাব এই যে, আপনারা যদি সে-যুগের ইতিহাস পাঠ করেন এবং علم الاجتماع (sociology /সমাজবিজ্ঞান) এবং (anthropology /নৃবিজ্ঞান)-এর মূলনীতিগুলো অধ্যয়ন করেন, তাহলে দেখতে পাবেন যে, যখন থেকে বিশ্বজগতে মানবজাতির ইতিহাস অস্তিত্ব লাভ করেছে তখন এ-বিষয়টি পরিষ্কার ও স্পষ্ট যে, পৃথিবীর জাতিগুলোর সভ্যতা ও সামাজিক অবস্থা এবং তাদের রাজনীতি ও ধর্মনীতির ওপর সামি (Semitic) গোত্রসমূহের প্রভাব ও প্রাধান্য বিরাজমান। ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের গভীর তল পর্যন্ত পৌঁছার পরও এমন কোনো জাতি দেখা যায় না যারা ওপর সামি (Semitic) অর্থাৎ, হযরত নুহ আ.-এর পুত্র সামের বংশধর গোত্রসমূহের প্রভাবে প্রভাবিত নয়।[১৪৬] কুরআন মাজিদ যে-যুগের অবস্থা বর্ণনা করছে, সে-যুগে এই ভূ-পৃষ্ঠের ওপর ও আকাশের নিচে কাছে ও দূর-দূরান্তে সেসব সামি সম্প্রদায় বসবাস করতো, ইতিহাস তাদেরকে আমালিকা, কিবতি, কিনআনি, আন্নাকিম, সামিরি ইত্যাদি নামে স্মরণ করেছে। এই জাতিগুলোর সভ্যতা সিরিয়া, ফিলিস্তিন, পূর্ব জর্ডান, মিসর ও ইরাকে দীপ্তিমান ছিলো। কিন্তু এই জাতিগুলোর মধ্যে শিরকি, কুফরি, বিদ্রোহ, অবাধ্যতা, অত্যাচার ও উৎপীড়নের যে-ভয়ঙ্কর অবস্থা বিরাজমান ছিলো, তার সামনে বনি ইসরাইলের সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট দেখা যাচ্ছিলো। আর সমসাময়িক জাতিগুলোর মধ্য থেকে তাদের ভেতর সত্য গ্রহণের যোগ্যতা কিছুটা নিশ্চিত হওয়ার উপযোগী ছিলো। মিসরের ফেরআউন ও মিসরীয়দের ঘটনাবলি এবং কিবতি সম্প্রদাগুলোর অবস্থা ইতোপূর্বে আপনারা পাঠ করেছেন। আর কিনআনি ও আমালিকা সম্প্রদায়গুলোর ঘটনাবলি কিছু পরেই আপনাদের চোখের সামনে আসবে। আর সামিরি গোত্রের অবস্থা তাদের জনৈক সরদার 'সামিরি'র অবস্থা থেকে সহজেই অনুমিত হতে পারে।

এমনই ছিলো তখনকার পরিবেশ ও অবস্থা যার ভিত্তিতে হেদায়েত ও সৎপথ প্রদর্শনের জন্য বনি ইসরাইলকে মনোনীত করা হয়েছে। আর ইতিহাস এ-বিষয়ের প্রমাণ দিচ্ছে যে, বনি ইসরাইলের ব্যাপক দুর্ভাগ্য

---

[১৪৬] এই ঐতিহাসিক আলোচনা বিস্তারিত ব্যাখ্যার মুখাপেক্ষী; কিন্তু এখানে এর চেয়ে বেশি বলার সুযোগ নেই।

সত্ত্বেও তাদেরই ক্ষুদ্র একটি দলের মাধ্যমে দীর্ঘকাল পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার হেদায়েতের বাণী মানব-সমাজে পৌছেছিলো। হাজার হাজার বছর পরে বনি ইসরাইলের বংশ থেকে এই নিয়ামত (নবুওত) ছিনিয়ে নিয়ে বনি ইসমাইল, অর্থাৎ হযরত ইসমাইল আ.-এর বংশধরের হাতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মোটকথা, হেদায়েত ও নসিহতের জন্য বনি ইসরাইলকে মনোনীত করা তাদের পবিত্রতার প্রেক্ষিতে ছিলো না; বরং উদ্দেশ্য ছিলো তাদের মাধ্যমে তাদের চেয়েও বেশি নৈরাজ্য ও ফেতনা-ফাসাদ বিস্তারকারী শক্তিগুলোকে খর্ব ও দমিত করা। এ-কারণে তাদের আল্লাহ তাআলার নির্দেশাবলির অনুগত করা এবং তাদেরকে সৎপথে আনার জন্য যাবতীয় কিছু করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাদের যুবকশ্রেণিকে দিয়ে এই দায়িত্ব পালন করিয়েছেন।

আর তাওরাতও এখানে এই সত্যকে নিম্নবর্ণিত চমৎকার ভাষায় ব্যক্ত করেছে :

"শুনে রাখো হে বনি ইসরাইল, আজ তোমাদেরকে ইয়ার্দুনের তীরে এইজন্য যেতে হবে যাতে তোমরা জয়লাভ করো এমন জাতিগুলোর বিরুদ্ধে যারা তোমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী; এবং দখল করো এমনসব শহর যেগুলোর প্রাচীরসমূহ আকাশের সঙ্গে সংলাপ করছে। ওখানে আছে আন্নাকিমের বংশধরেরা। তারা বিশাল দেহী ও দুর্দান্ত। তোমরা তোমাদের অবস্থা অবগত আছো, আর তাদের সম্পর্কে লোকদেরকে এ-কথা বলতে শুনেছো যে, আন্নাকিম গোত্রের সঙ্গে কেউই মোকাবিলা করতে পারবে না। সুতরাং, আজ তোমরা জেনে রাখো, আল্লাহ তাআলার—তোমাদের প্রতিপালক—তোমাদের সম্মুখভাবে ভস্মকারী আগুনের মত গমন করে তাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন। তিনি তাদেরকে তোমাদের সামনে অবনমিত করে দেবেন এমনভাবে যে, তোমরা তাদেরকে ওখান থেকে বের করে এনে অতিদ্রুত ধ্বংস করে ফেলবে। যেমন আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে বলছেন। তোমাদের প্রতিপালক যখন তাদেরকে তোমাদের সামনে থেকে বের করে দেবেন তখন তোমরা মনে মনে এমন কথা বলো না যে, আমাদের সততার ফলে আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে এই রাজ্য অধিকার করার জন্য এখানে নিয়ে এসেছেন। কেননা, প্রকৃত পক্ষে ওই সম্প্রদায়গুলোর

খারাপ কাজের কারণে তোমাদের সামনে থেকে তাদেরকে বের করে দিচ্ছেন। তোমরা নিজেদের সততা ও আন্তরের সদ্ভাবের কারণে ওই রাজ্যকে অধিকার করতে যাচ্ছো না। বরং তোমাদের প্রতিপালক ওই সম্প্রদায়গুলোর খারাপ কাজের কারণে তাদেরকে তোমাদের সামনে থেকে বের করছেন। যেনো এই উপায়ে তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন। তিনি তোমাদের পূর্বপুরুষ ইবরাহিম, ইয়াকুব ও ইসহাকের সঙ্গে কসমের সঙ্গে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। মোটকথা, তোমরা বুঝে নাও, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের সততার কারণে ওই উত্তম রাজ্যকে তোমাদের দখল করে নিতে দিচ্ছেন না। কেননা, তোমরা একটি হত্যাকারী কওম। এ-কথা তোমরা স্মরণ রেখো এবং কখনো ভুলো না যে, তীহ প্রান্তরে তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে কীভাবে ক্রোধান্বিত করেছো। বরং যখন তোমরা মিসর থেকে বের হয়েছে তখন থেকেই সর্বক্ষণ তোমাদের প্রতিপালকের অবাধ্যাচরণই করে যাচ্ছো।"[১৪৭]

কুরআন মাজিদে হযরত মুসা আ.-এর প্রশংসা ও ফযিলত

কুরআন মাজিদে এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদিসসমূহে হযরত মুসা আ.-এর ফযিলত এবং বনি ইসরাইলের ঘটনাবলি প্রসঙ্গে তাঁর উচ্চ মর্যাদা, মাহাত্ম্য যেভাবে প্রকাশ করা হয়েছে, তা থেকে এ-কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, খাতিমুল মুরসালিন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুজাদ্দিদে আম্বিয়া হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর পরেই হযরত মুসা আ. 'উলুল আযম' নবী ও রাসুল এবং অন্য নবী ও রাসুলগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা ও মরতবার অধিকারী।

অন্যকথায় এভাবে বলুন, হযরত মুসা আ.-এর শৈশব থেকে মৃত্যু অবধি কালের ঘটনাবলি এমন বিস্ময়কর ও বিচিত্র নিয়মে অতিবাহিত হয়েছে যে, তা পাঠ করলে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বলতে হয়, হযরত মুসা আ. অতি উচ্চ মর্যাদাশীল রাসুল ছিলেন। এটাও মেনে নিতে হয় যে, ফেরআউন, ফেরআউনের সম্প্রদায় এবং বনি ইসরাইলিদের হাতে হযরত মুসা আ. যে-ক্লেশ ও যন্ত্রণার শিকার হয়েছেন এবং তাদের অবস্থার সংশোধনের

---

[১৪৭] তাওরাত : ইস্তিসনা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৯, আয়াত ১-৭।

জন্য যে-ধরনের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন, তার দৃষ্টান্ত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং হযরত ইবরাহিম আ. ব্যতীত অন্যকোনো নবী ও রাসুলের জীবনে পাওয়া যায় না।

কুরআন মাজিদ জায়গায় জায়গায় হযরত মুসা আ.-এর ঘটনাবলির মাধ্যমে এইজন্য সাক্ষ্য পেশ করেছে যে, উম্মত ও গোত্রসমূহের শৈথিল্য, সত্য বিমুখতা, বরং অবাধ্যতা, বিরোধিতা ও শত্রুতা, নবীগণকে অপমান করা, অপদস্থ করা, যন্ত্রণা দেয়া আর অপরদিকে নবী ও রাসুলগণের ধৈর্য ও সহনশীলতা, পথভ্রষ্ট উম্মত ও জাতির সংশোধন এবং তাদের হেদায়েত ও সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য অবিরাম চেষ্টা ও পরিশ্রম করার এত অধিক পরিমাণ উপকরণ আর কোথাও পাওয়া যায় না, যা হযরত মুসা আ. ও বনি ইসরাইলের ঘটনাবলিতে সন্নিহিত রয়েছে।

সুতরাং, কুরআন মাজিদের আয়াতের মাধ্যমে হযরত মুসা আ.-এর উচ্চ মর্যাদাশীল ও 'উলুল আযম' নবী ও রাসুল হওয়াই প্রমাণিত হয়, যা তাঁর ঘটনাবলি ব্যক্ত করছে। আর নিম্নলিখিত আয়াতগুলোতে বিশেষভাবে তাঁর প্রশংসা ও ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে। এ-প্রসঙ্গে হারুন আ.-এর প্রশংসা করা হয়েছে।

যেমন : সুরা মারইয়ামের নিম্নলিখিত আয়াতে বলা হয়েছে—

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا () وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا () وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا

(سورة مريم)

'স্মরণ করো এই কিতাবে মুসার কথা, সে ছিলো বিশেষ মনোনীত এবং সে ছিলো রাসুল, নবী। তাকে আমি আহ্বান করেছিলাম তুর পাহাড়ের দক্ষিণ দিক থেকে এবং আমি অন্তরঙ্গ আলাপে তাকে নৈকট্য দান করেছিলাম। আমি নিজ অনুগ্রহে তাকে দিলাম তার ভাই হারুনকে নবীরূপে।' [সুরা মারইয়াম : আয়াত ৫১-৫৩]

সুর আ'রাফে বর্ণিত আছে—

قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (سورة الأعراف)

'তিনি (আল্লাহ তাআলা) বললেন, "হে মুসা, আমি তোমাকে আমার রিসালাত (রাসুলের মর্যাদা ও দায়িত্ব) ও আমার বাক্যালাপ দ্বারা মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি; সুতরাং আমি যা (তাওরাত কিতাব) দিলাম তা গ্রহণ করো এবং কৃতজ্ঞ হও।" [সুরা আ'রাফ : আয়াত ১৪৪]

সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম শরিফের বার্ণিত হাদিসে আছে যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لَا تُخَيِّرُونِى عَلَى مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ بُعِثَ أَوْ فِى أَوَّلِ مَنْ بُعِثَ فَإِذَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ آخِذٌ بِالْعَرْشِ فَلَا أَدْرِى أَحُوسِبَ بِصَعْقَتِهِ يَوْمَ الطُّورِ أَوْ بُعِثَ قَبْلِى.

"আমাকে হযরত মুসা আ.-এর ফযিলত প্রদান করো না। কেননা, কিয়ামতের দিন সকল মানুষ সেদিনের বিভীষিকায় বেহুঁশ হয়ে পড়ার পর যে-ব্যক্তি সর্বপ্রথম জ্ঞান ফিরে পাবে, সে হবো আমি। কিন্তু আমি উঠে দেখবো যে, মুসা আ. আরশের পায়া ধরে দণ্ডায়মান রয়েছেন। আমি বলতে পারি না যে, তিনি কি আমার পূর্বে চেতন লাভ করেছেন না তুর পাহাড়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ার বিনিময়ে আজকের বেহুঁশ হওয়া থেকে তাঁকে মুক্ত রাখা হয়েছে।"[১৪৮]

ইমাদুদ্দিন বিন কাসির রহ. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উক্তি—'আমাকে মুসার ওপর ফযিলত প্রদান করো না'— তাঁর বিনয় ও নম্রতার প্রকাশ ছিলো। অন্যথায়, তিনি নিজেই অন্য সময়ে বলেছেন, وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر 'আমি গর্ব প্রকাশ ছাড়াই বলছি যে, কিয়ামতের দিন আমিই সমস্ত আদম-সন্তানের সরদার।' তাঁর খাতিমুন নাবিয়্যিন হওয়াই এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ। তবে কিয়ামতের দিবসের এই ঘটনা, তা হলো আংশিক ফযিলত। এ-কারণে যাবতীয় পূর্ণতাসূচক গুণাবলির যে-সমাবেশস্থল তার শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চতা বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ন হয় না।

যাইহোক। আলোচ্য হাদিসটির সারবস্তু হলো হযরত মুসা আ.-এর মর্যাদা ও মহত্ত্বের শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চতা প্রকাশ করা, অন্যকিছু নয়।

---

[১৪৮] সহিহ বুখারি : হাদিস ৩৪১৪ ; সহিহ মুসলিম : হাদিস ৬৩০০।

সুরা নিসায় এসেছে—

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا (سورة النساء)

'অনেক রাসুল প্রেরণ করেছি, যাদের কথা আমি তোমাকে পূর্বে বলেছি এবং অনেক রাসুল রাসুল যাদের কথা তোমাকে বলি নি। এবং মুসার সঙ্গে আল্লাহ তাআলা বাক্যালাপ করেছিলেন।' [সুরা নিসা : আয়াত ১৬৪]

আর সুরা সাফ্ফাতে বিবৃত করা হয়েছে—

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ () وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ () وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ () وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ () وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ () وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ () سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ () إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ () إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (سورة الصافات)

'আমি অনুগ্রহ করেছিলাম মুসা ও হারুনের প্রতি, এবং তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়কে আমি উদ্ধার করেছিলাম মহাসঙ্কট থেকে। আমি সাহায্য করেছিলাম তাদেরকে, ফলে তারাই হয়েছিলো বিজয়ী (ফেরআউন ও তার সম্প্রদায়ের ওপর)। আমি উভয়কে দিয়েছিলাম বিশদ কিতাব। এবং তাদেরকে আমি পরিচালিত করেছিলাম সরল পথে। আমি তাদের উভয়কে পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি।[১৪৯] (তারা বলবে,) "মুসা ও হারুনের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।" এইভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। তারা উভয়ই ছিলো আমার মুমিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।' [সুরা সাফ্ফাত : আয়াত ১১৪-১২২]

সুরা আহযাবে এসেছে—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا (سورة الأحزاب)

'হে মুমিনগণ, মুসাকে যারা কষ্ট দিয়েছে, তোমরা তাদের মতো হয়ো না। তারা যা রটনা করেছিলো, আল্লাহ তা থেকে তাকে নির্দোষ প্রমাণিত করেন; এবং আল্লাহর কাছে সে মর্যাদাবান।' [সুরা আহযাব : আয়াত ৬৯]

সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম শরিফে পবিত্র মেরাজ সম্পর্কিত হাদিসে হযরত মুসা আ. ও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর

---

[১৪৯] তাদের সুখ্যাতি পৃথিবীতে অব্যাহত রয়েছে।

মধ্যকার যে-কথোপকথন বর্ণনা করা হয়েছে তাতেও হযরত মুসা আ.-এর মর্যাদা ও মহত্ত্বের স্পষ্ট প্রকাশ রয়েছে।

সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম শরিফে আরো একটি রেয়ায়েত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ বিন মাউস রা. বলেন, একদিন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কোনো বস্তু বণ্টন করলেন। জনৈক (মুনাফিক) ব্যক্তি বললো, 'এই বণ্টনে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ রাখা হয় নি।' কোনো এক মুনাফিক লোকের এই উক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কানে গেলে ক্রোধে তাঁর চেহারা রক্তবর্ণ ধারণ করলো। তখন তিনি বললেন, 'আল্লাহ তাআলা মুসা আ.-এর প্রতি রহম করুন। তাঁকে তো তাঁর সম্প্রদায় এর চেয়েও বেশি যন্ত্রণা দিয়েছে। কিন্তু তিনি সব কষ্ট ও ক্লেশেই ধৈর্য ও সহনশীলতার পথ অবলম্বন করেছেন।' অর্থাৎ, মুনাফিকের এই কষ্টদায়ক উক্তিতে আমিও উচ্চ মর্যাদাশীল নবী ও রাসুলগণের মতো ধৈর্য ও সহনশীলতার আশ্রয় গ্রহণ করছি।

মোটকথা, এই রেওয়ায়েতগুলো এবং অনুরূপ আরো অনেক ফযিলতমূলক রেওয়ায়েত রয়েছে যা হযরত মুসা আ.-এর উচ্চ পর্যায়ের রাসুল হওয়া প্রমাণ করছে এবং আমাদের জন্য হেদায়েতের ভাণ্ডার জুগিয়ে দিচ্ছে।

একটি সূক্ষ্ম ঐতিহাসিক তত্ত্ব

ইহুদি (বনি ইসরাইলি)-দের ইতিহাস যাঁরা পাঠ করেছেন তাদের কাছে এ-বিষয়টি অজানা থাকার কথা নয় যে, ইহুদিরা হযরত ইসা আ.-এর বহুকাল পূর্বে হেজাযে এসে বসতি স্থাপন করেছিলো এবং তাইমা, ওয়াদিয়ে কুযা, ফাদাক, খায়বার, মদীনা (ইয়াসরিব)-এ তারা ঘরবাড়ি, গির্জা, ভূ-সম্পত্তি, ধর্মীয় পাঠশালা, সেনানিবাস, দুর্গসমূহ নির্মাণ করে নিজেদের স্বতন্ত্র সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিলো। আরব ইতিহাসবেত্তাদের মতে বনু কুরাইযা, বুন নাযির, বনু কাইনুকাহ, বনু হারেস নামক বড় বড় ইহুদি গোত্রসমূহ ওইসব স্থানে তাদের স্বতন্ত্র বাসস্থান স্থাপন করে ওখানেই বসবাস করতে থাকে।

এই বাস্তবতার প্রতি লক্ষ করে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক প্রশ্নের উত্তপত্তি হয়, যার সমাধান জরুরি। একটি প্রশ্ন এই : এমন কোন্ অপরিহার্য ঘটনা ঘটেছিলো যার ফলে ইহুদিরা ফিলিস্তিন ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে,

যে-ভূমি সম্পর্কে ইহুদিদের আকিদা এই যে, তা পবিত্র ভূমি এবং তাতে দুধ ও মধুর নহর প্রবাহিত রয়েছে? দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, কোনো অপরিহার্য কারণে তাদেরকে এই পবিত্র ভূমি ত্যাগ করতেই হয়েছিলো, তবে তারা কী কারণে তাদের নিকটস্থ সবুজ, সতেজ, মনোরম অঞ্চলসমূহ ছেড়ে এমন এক অঞ্চলে এসে বসবাস করতে শুরু করলো, গাছপালা এবং জীবন ধারণের উপযোগী সরঞ্জাম ও উপকরণসমূহ পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিলো না? অথচ মিসর তাদের আবাসভূমির কাছেই ছিলো। ইরাক তাদের পুরাতন দারুল হিজরত ছিলো এবং নিকটবর্তীও ছিলো। আর উত্তর দিকে সিরিয়া ছিলো তাদের আবাসভূমির সংলগ্ন। এই স্থানগুলো অত্যন্ত সবুজ, সতেজ ও সভ্যতার সরঞ্জামও উপকরণসমূহের কেন্দ্রভূমি ছিলো।

ইতিহাস তো প্রথম প্রশ্নের জবাব এই দিচ্ছে যে, খ্রিস্টপূর্ব ৭০১ সালে রোমান সম্রাট তিতাউস (Titues)-এর যুগে বনি ইসরাইলিরা ফিলিস্তিনের প্রিয় ও পবিত্র ভূমি থেকে বের হতে বাধ্য হয়েছিলো। সম্রাট তিতাউস সেনাবাহিনী নিয়ে আক্রমণ করে ফিলিস্তিন ভূমিকে ধ্বংস করে উলট-পালট করে দিয়েছিলো। বাইতুল মুকাদ্দাসকে ধ্বংস করে ফেলেছিলা। যে-দুর্গটির জন্য ইহুদিরা গৌরববোধ করতো, যার দৃঢ়তা ও আড়ম্বরপূর্ণ নির্মাণের দৃষ্টান্ত পেশ করতো এবং যার সাজ-সরঞ্জাম এবং স্বর্ণ-রৌপ্য-মোড়ানো তৈজসপত্রের জন্য তারা গর্বিত ছিলো, অত্যাচারী তিতাউস সেগুলোকে ভেঙে-চুরে নষ্ট করে দিয়েছিলো। আর অতি মূল্যবান সরঞ্জামগুলোর সব লুণ্ঠন করে নিয়ে গিয়েছিলো।

দ্বিতীয় জিজ্ঞাসার জবাই এই যে, ইহুদিরা তাওরাতে পাঠ করেছিলো এবং তাদের নবীদের মুখে শুনতে পেয়েছিলো যে, আল্লাহ তাআলা এক সময় তাঁর এই নবুওতের পদকে বনি ইসরাইল থেকে ফিরিয়ে নিয়ে তাদের ভ্রাতৃবংশ বনি ইসরাইলের মধ্যে নতুনরূপে দান করবেন। তারা এটাও জানতো যে, সেই নবী ইয়াসরিবে (মদীনায়) আগমন করবেন। ইয়াসরিব হবে সেই নবীর 'দারুল হিজরত' এবং তাঁর 'দাওয়াতে ইসলামে'র কেন্দ্রস্থল। মূর্তিপূজকদের বিরুদ্ধে তাঁর মুজাহিদি জীবন সফলকাম হবে। আর পুনরায় তাঁর হাতেই ইবরাহিম, ইসমাইল, ইসহাক ও ইয়াকুব আলাইহিমুস সালাম-এর সত্যের আহ্বান শির উঁচু করে দাঁড়াবে।

সুতরাং, যখন ইহুদিরা মূর্তিপূজক সম্রাট তিতাউসের শক্তির কাছে অক্ষম ও অপারগ হয়ে গেলো, তখন তারা হেজাযের ইয়াসরিব বা মদিনাকেই

মস্তক উন্নত করে দাঁড়াবার শেষ আশ্রয়স্থল মনে করলো। হেজাযের এ-স্থানেই তারা তাদের বাসস্থান নির্মাণ করলো যা শেষ নবী আবির্ভূত হওয়ার নগরী (মক্কা) এবং ফিলিস্তিনের মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত ছিলো। এভাবে তারা আকাঙ্ক্ষিত নবীর প্রতীক্ষা এবং তাদের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের আশায় দিনাতিপাত করতে লাগলো।

যেমন : ইয়াসা'ইয়াহ নবীর গ্রন্থে স্পষ্টভাবে শেষ নবী সম্পর্কে যে-ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করা হয়েছে তা এই :

"সেই নবী সালা নামক পর্বতের নিকটবর্তী স্থানে আবির্ভূত হবেন। বলাবাহুল্য, মদিনার বসতি এমন জায়গায় অবস্থিত ছিলো যার পুবদিকে ওহুদ পর্বত এবং পশ্চিমে সালা পর্বত। আর এ-দুটি পর্বতের উপত্যকা ভূমিতে মদিনার বসতি অবস্থিত।"

"হে সামুদ্রিক পথ অতিক্রমকারিগণ আর হে তাতে অবস্থানকারিগণ, আর হে দ্বীপাঞ্চল ও তার অধিবাসিগণ, আল্লাহ তাআলার উদ্দেশে নতুন গীত গাও। ভূ-পৃষ্ঠে সর্বত্র তাঁরই প্রশংসা করো। বনাঞ্চল ও তার জনপদসমূহ, কিদারের বংশধর কর্তৃক আবাদকৃত গ্রামসমূহ তাদের আওয়াজ উঁচু করুক। সালার বাসিন্দারা গীত গাক। তারা আল্লাহ তাআলার প্রতাপ ঘোষণা করুক। আর দ্বীপাঞ্চলসমূহ তাঁর প্রশংসাগীতি পাঠ করুক, আল্লাহ বীরের মতো বের হবেন, তিনি সৈনিক পুরুষদের মতো নিজের আত্মমর্যাদা প্রকাশ করবেন। আওয়াজ উঁচু করবেন। হ্যাঁ, অবশ্যই তিনি বিজয়-হুঙ্কার ছাড়বেন। তিনি নিজের শত্রুদের ওপর জয়লাভ করবেন। 'আমি দীর্ঘকাল যাবৎ নীরব রয়েছি, আমি নীরব হয়ে থেকেছিলাম এবং ধৈর্যধারণ করছিলাম... যারা নিজেদের হাতে বানানো মূর্তিসমূহের ওপর নির্ভর করে এবং ভগ্ন-বিচূর্ণ মূর্তিসমূহকে সম্বোধন করে বলে, তোমরা আমাদের উপাস্য। তারা পেছনে হটে যাবে এবং যারপরনেই লজ্জিত হবে।"[১৫০]

এটা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, হযরত মুসা আ.-এর পরে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত এমন কোনে নবী আসেন নি যিনি মূর্তিপূজকদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন এবং অবশেষে মূর্তিপূজকেরা ব্যর্থকাম হয়েছে।

---

[১৫০] ইয়াসা'ইয়াহ : অনুচ্ছেদ ৪২, আয়াত ১-১৭, আবদুল ওয়াহ্হাব নাজ্জার রচিত 'কাসাসুল আম্বিয়া' থেকে গৃহীত।

তবে, কারা এই কিদারের বংশ? সালা পর্বতটি কোথায় অবস্থিত? বার বার কেনো দ্বীপ ও পর্বতসমূহের উল্লেখ করা হলো? বনি ইসরাইলের গীত ব্যতীত নতুন গীত কোন্‌টি? এই সমস্ত জিজ্ঞাসা চিৎকার করে বলছে যে, এটা এমন শরিয়ত এবং এমন নবীর আগমনের সুসংবাদ প্রদানের বর্ণনা, যা হেযাজের ভূ-খণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তবে কি এটাই সেই কথা নয় যা কুরআন মাজিদ ইহুদিদের উদ্দেশে সম্বোধন করে জীবন্ত ঐতিহাসিক সাক্ষ্যরূপে বর্ণনা করেছে এভাবে—

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ

(سورة البقرة)

'তাদের কাছে যা আছে আল্লাহর কাছ থেকে তার (তাওরাতের) সমর্থক কিতাব (কুরআন মাজিদ) এলো; যদিও পূর্বে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের[১৫১] বিরুদ্ধে তারা (ইহুদিরা) এর সাহায্যে বিজয় প্রার্থনা করতো। তবুও তারা যা জ্ঞাত ছিলো তা যখন তাদের কাছে এলো (যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করলেন) তখন তারা তা প্রত্যাখ্যান করলো। সুতরাং কাফেরদের প্রতি আল্লাহর লানত।' [সুরা বাকারা : আয়াত ৮৯]

অর্থাৎ, যখন কিতাবি ইহুদিদের সঙ্গে ইয়াসরিবের মূর্তিপূজকদের যুদ্ধ হতো এবং কিতাবি ইহুদিরা পরাজিত হতো, তখন আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া করতো, 'হে আল্লাহ, আমরা যে-নবীর প্রতীক্ষা করছি তাঁকে সত্বর প্রেরণ করা। যেনো তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে মূর্তিপূজকদের মূলোৎপাটন করে দিতে পারি এবং আপনার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সত্যেরই সফলতা অর্জিত হয়। কিন্তু যখন সেই কাঙ্ক্ষিত নবী আরবের ভূমিতে পদার্পণ করলেন এবং নবুওতপ্রাপ্ত হলেন, তখন কিতাবি ইহুদিরা হিংসাবশত তাঁকে অস্বীকার করতে লাগলো—এই নবী ইসমাইলের বংশের কেনো? ইসরাইলি বংশের নর কেনো?

---

[১৫১] এখানে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী বলতে মুশরিকদেরকে বুঝানো হয়েছে। ইহুদিরা কখনো মুশরিকদের কাছে পরাজিত হলে শেষ নবীর ওসিলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করতো। তারা এটাও বলতো যে, শেষ নবী তাদের মধ্যেই আগমন করবেন। কিন্তু নবীর আগমনের পর তারা তাঁর বিরোধিতা করতে থাকে।

অনুমিত হয় যে, কোনো ইহুদি আলেম এই ধোঁকায় পতিত ছিলো যে, যদিও এই নবীর আবির্ভূত ও প্রকাশিত হওয়ার স্থান সালা পর্বতের নিকটবর্তী স্থানই বলা হয়েছে, তাঁর আবির্ভাব বনি ইসরাইলের মধ্য থেকেই হওয়া উচিত। এইজন্য তারা ওখানে এসে বসতি স্থাপন করেছে যে, আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুতি আমাদের মধ্য থেকেই পূর্ণ হোক। কিন্তু তারা এ-কথা ভুলে গিয়েছিলো যে, তাদের সেই তাওরাতেই সেই আকাঙ্ক্ষিত নবী সম্পর্কে এটাও বলা হয়েছিলো যে, 'আমি তাদের জন্য তাদের ভ্রাতৃগোত্র থেকে একজন নবী প্রেরণ করবো।' এ-কথা বলা হয় নি যে, সেই নবী হবে বনি ইসরাইল বংশ থেকে। কিন্তু ইহুদিদের আলেমগণ এবং তাদের অনুসারী সাধারণ জনগণ এই তথ্য সম্পর্কে অবহিত ছিলো না যে, এই নেয়ামত (নবুওত) এখন তাদের ভ্রাতৃগোত্র বনি ইসমাইল বংশে স্থানান্তরিত হয়ে তাদেরকে বরকত দান করতে উপকৃত করতে থাকবে।

কুরআন মাজিদে এ-দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে—

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (سورة البقرة)

'আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা তাকে তেমনই জানে যেমন তারা নিজেদের সন্তানদেরকে চেনে এবং তাদের একদল জেনে-শুনে সত্য গোপন করে থাকে।' [সুরা বাকারা : আয়াত ১৪৮]

মোটকথা, এটাই একমাত্র কারণ যে, কয়েক শতাব্দী পূর্বে বনি ইসরাইলিরা বড় শক্তির কাছে নিপীড়িত হয়ে ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমি থেকে বিতাড়িত হয়েছিলো। তারা তখন মিসর, সিরিয়া ও ইরাকের সবুজ, সতেজ ও সুসভ্য দেশগুলো ত্যাগ করে হেজাযের মরুভূমিকেই প্রাধান্য দিয়েছিলো। তারা ইয়াসরিব (মদিনা) ও তার আশ-পাশের অঞ্চলগুলোতে এসে বসতি স্থাপন করেছিলো। কিন্তু আফসোস! সেই নবীর আবির্ভাবের পর হিংসা ও বিদ্বেষ তাদেরকে ঈমানের মতো মহামূল্যবান সম্পদ থেকে বঞ্চিত রাখলে।

আধুনিক ঐতিহাসিক তথ্যাবলির প্রতি লক্ষ করলে এখানে এই জিজ্ঞাসা উত্থাপিত হয় যে, উপরিউক্ত প্রশ্নোত্তরের গোটা আলোচনা নিরর্থক। নিরর্থক এ-কারণে যে, হেজায ভূমিতে যেসব ইহুদি বসবাস করতো তারা

সবাই আরব বংশোদ্ভূত ছিলো, বনি ইসরাইলি বংশের লোক ছিলো না। কেননা, বনি ইসরাইলের বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য এটাও ছিলো যে, তারা পৃথিবীর যে-প্রান্তে গিয়েই বসতি স্থাপন করেছে, কখনো তাদের ইসরাইলি নাম ও পরিচয় ত্যাগ করে নি। পক্ষান্তরে হেজাযের ইহুদিদের পূর্বপুরুষদের কুরাইযা, নাযির, কাইনুকাহ ইত্যাদি নাম আরবি এবং ইসরাইলি নাম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

এই জিজ্ঞাসার জবাবে বলা হবে, এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির অর্থ যদি এটাই হয় যে, হেজায ভূ-বিভাগের ইহুদিরা কেবল আরব বংশোদ্ভূতই এবং তাদের বনি ইসরাইল বংশীয় ইহুদি মোটেই ছিলো না, তবে তা হবে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলির বিপরীত। কারণ, হেজাযের ইহুদি গোত্রগুলোর মধ্যে কতিপয় গোত্র এমনও ছিলো যারা ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমি থেকে হিজরত করে আরব দেশে এসে বসতি স্থাপন করার কথা আজ পর্যন্ত ইতিহাসের পাতায় সুরক্ষিত রয়েছে। আর যদি তার অর্থ এই হয় যে, এখানে আরব গোত্রগুলোর সঙ্গে ইসরাইলি ইহুদি গোত্রগুলোও বসবাস করতো এবং তাদেরই মাধ্যমে আরব গোত্রগুলোর মধ্যে ইহুদি ধর্মের বীজ বপন করা হয়েছিলো। তবে পুনরায় উপরিউক্ত প্রশ্ন এসে দাঁড়ায় এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে তার ওই জবাবই দেয়া যেতে পারে যা ইতোপূর্বে যথাস্থানে দেয়া হয়েছে।

জ্ঞানগর্ভ আলোচনা এবং শিক্ষামূলক উপদেশ

হযরত মুসা আ.,বনি ইসরাইল, ফেরআউন এবং ফেরআউনের সম্প্রদায়ের এই দীর্ঘ ঐতিহাসিক কাহিনি শুধু একটি কাহিনি বা গল্প নয়। বরং এটি সত্য ও মিথ্যার প্রতিযোগিত, ন্যায় ও অন্যায়ের লড়াই, স্বাধীনতা ও দাসত্বের মধ্যকার সংগ্রাম, দুর্বল ও হীনদের মাথা তুলে দাঁড়ানো, অত্যাচারী ও উন্নতশিরদের হীনতাবরণ ও বিনাশ, সত্যের জয় ও সফলতা এবং মিথ্যার পরাজয় ও অপদস্থ হওয়া, ধৈর্য ও পরীক্ষা এবং শোকর ও অনুগ্রহের প্রকাশস্থল। মোটকথা, এটি অবাধ্যতা, অকৃতজ্ঞতা ও না-শোকরির নিকৃষ্ট পরিণামের মহৎ ফলাফলপূর্ণ এবং সত্য ও বাস্তবতাসমৃদ্ধ সারগর্ভ কাহিনি। এই কাহিনিতে অসংখ্য উপদেশ ও জ্ঞানগর্ভ বিষয় সন্নিহিত রয়েছে। তা প্রত্যেক রুচিসম্পন্ন ও সত্যপ্রিয় ব্যক্তিকে জ্ঞানের সীমা ও সূক্ষ্মদৃষ্টির প্রয়োগে চিন্তা ও গবেষণার আহ্বান জানাচ্ছে।

এসবের মধ্য থেকে নমুনা হিসেবে নিম্নের কয়েকটি জ্ঞানগর্ভ বিষয় বিশেষভাবে চিন্তনীয় ও অনুধাবনযোগ্য।

এক.

মানুষ যদি কোনো বিপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, তবে তার অবশ্য কর্তব্য ধৈর্য ও সন্তুষ্টির সঙ্গে তার মোকাবিলা করা। ধৈর্য ও সন্তুষ্টির সঙ্গে কাজ করলে নিঃসন্দেহে সে মহাকল্যাণ লাভ করবে এবং অবশ্যই সে সফলকাম হবে। হযরত মুসা আ. ও ফেরআউনের ধারাবাহিক ঘটনা তার জ্বলন্ত সাক্ষী।

দুই.

যে-ব্যক্তি তার যাবতীয় কাজকর্মে আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা রাখে ও নির্ভর করে এবং একমাত্র আল্লাহকেই খাঁটি অন্তরের সঙ্গে তাঁর পৃষ্ঠপোষক বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই যা যাবতীয় বিপদ-আপদ সহজ ও হালকা করে দেন। আল্লাহ তার সব বিপদকে মুক্তি সফলতায় রূপান্তরিত করে দেন। হযরত মুসা আ. কর্তৃক কিবতিকে হত্যা করা, হযরত মুসা আ.-কে হত্যা করার জন্য মিসরীয়দের সলা-পরামর্শ করা, এরপর শত্রুদলের মধ্য থেকেই একজন সমব্যথী ব্যক্তি কর্তৃক হযরত মুসা আ.-কে মিসরীয়দের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত করা, এভাবে তাঁর মাদয়ানের চলে যাওয়া, আল্লাহ তাআলার ওহি লাভের সম্মানে সম্মানিত হওয়া, রিসালাতের উচ্চ মর্যাদাশীল পদ লাভ করা তার উজ্জ্বল সাক্ষ্য।

তিন.

আল্লাহ তাআলার সঙ্গে যাঁর সম্পর্ক ইশক (প্রেম) পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তাঁর কাছে বাতিলের বড় শক্তিও তুচ্ছ ও অস্তিত্বশূন্য হয়ে পড়ে। চিন্তা করুন, বস্তুবাদী শক্তির প্রেক্ষিতে হযরত মুসা আ. ও ফেরআউনের মধ্যে কী সম্পর্ক! এক নিঃসহায়, অক্ষম ও দুর্বল, অপর পক্ষ অজস্র রকমের প্রতাপ-প্রতিপত্তি, জাঁকজমক ও অহমিকায় পরিপূর্ণ। কিন্তু ফেরআউন তার রাজদরবারে সভাষদমণ্ডলীর সামনে হযরত মুসা আ.-কে বললো—

إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا

“হে মুসা, আমি মনে করি তুমি তো জাদুগ্রস্ত।” [সুরা বনি ইসরাইল : আয়াত ১০১]

হযরত মুসা আ. তার জবাবে তৎক্ষণাৎ বললেন—

لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا

‘মুসা বলেছিলো, “তুমি অবশ্যই অবগত আছো যে, এইসব স্পষ্ট নিদর্শন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালকই অবতীর্ণ করেছেন—প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ। হে ফেরআউন, আমি তো দেখছি (এসব নিদর্শন অস্বীকার করার কারণে) তোমার ধ্বংস আসন্ন।”’ [সুরা বনি ইসরাইল : আয়াত ১০২]

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার এসব স্পষ্ট নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও ফেরআউনের নাফরমানি করার পরিণাম ধ্বংস ছাড়া কিছুই নয়।

চার.

যদি আল্লাহ তাআলার কোনো বান্দা সত্যকে সাহায্য করার জন্য জীবন হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাআলা বাতিলের পূজারীদের মধ্য থেকেই তার সাহায্যকারী বানিয়ে দেন।

আপনাদের সামনে হযরত মুসা আ.-এর দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। যখন ফেরআউন ও তার সভাষদবর্গ তাঁকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেললো, তখন তাদের মধ্য থেকেই একজন সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি তৈরি হয়ে গেলেন, যিনি হযরত মুসা আ.-এর পক্ষ থেকে তাদের চক্রান্তের প্রতিবাদ করলেন। এমনিভাবে কিবতিকে হত্যা করার পর যখন তাঁকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিলো তখন একজন আল্লাহভক্ত কিবতি ব্যক্তি হযরত মুসা আ.-কে এ-ব্যাপারে সংবাদ দিলেন এবং মিসর থেকে বের হয়ে যাওয়ার সৎ পরামর্শ দিলেন। মিসর থেকে বের হয়ে যাওয়া মুসা আ.-এর জন্য নানা ধরনের মহাসফলতার কারণ হয়েছিলো।

পাঁচ.

একবারও যদি কেউ ঈমানের সুস্বাদ আস্বাদন করে নেয় এবং সত্য মনে ও খাঁটি অন্তরে তা গ্রহণ করে নেয়, তবে এই স্পৃহা তাকে এতটাই ব্যাকুল করে তুলে যে, তার প্রতিটি ধমনী থেকে শুধু সত্যের আওয়াজ ধ্বনিত হতে থাকে। এটা কি অলৌকিক ব্যাপার নয় যে, যে-জাদুকরেরা

কয়েক মিনিট আগে ফেরআউনের মহাশক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তার আদেশ পালন করাকে তাদের জীবনের রক্ষ-কবচ বানিয়ে নিয়েছিলো এবং যারা কলাকৌশলের সফলতার বিনিময়ে পুরস্কার ও মর্যাদালাভের আকাঙ্ক্ষা করছিলো, সেই জাদুকরেরাই কয়েক মিনিট পরে হযরত মুসা আ.-এর হাতে ঈমান আনলো। তারপর ঈমানের এতটাই বিমোহিত হয়ে গেলো যে, ফেরআউনের কঠোর থেকে কঠোরতম হুমকি এবং তার অত্যাচার ও শাস্তিদণ্ডকে খেল-তামাশার চেয়ে বেশি কিছু মনে করলো না। তারা বলতে লাগলো—

لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (سورة طه)

"আমাদের কাছে যে-স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে তার ওপর এবং যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তার ওপর তোমাকে আমরা কিছুতেই প্রাধান্য দেবো না। সুতরাং তুমি করো যা তুমি করতে চাও। তুমি তো কেবল এই পার্থিব জীবনের ওপর কর্তৃত্ব করতে পারো।" [সুরা তোয়া-হা : আয়াত ৭২]

ছয়.

ধৈর্যের ফল সবসময় মিষ্ট হয়ে থাকে। ধৈর্যের ফল লাভ করতে যত দুঃখ-কষ্টই সহ্য করতে হোক না কেনো, তবুও সেই ফল মিষ্টই লাগবে। বনি ইসরাইল কত দীর্ঘকাল মিসরে নিঃসহায়তা, দাসত্ব ও দুর্দশা ও লাঞ্ছনাকর অবস্থার মধ্যে জীবন কাটিয়েছে। তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করা হয়েছে, মেয়ে সন্তানদেরকে দাসী হওয়ার অপমান সহ্য করতে হয়েছে । অবশেষে এমন সময় এলো, যখন তারা ধৈর্যের মিষ্ট ফল লাভ করলো। ফেরআউনের বিনাশ এবং বনি ইসরাইলের সম্মানজনক মুক্তি তাদের সব ধরনের সফলতার পথ উন্মুক্ত করে দিলো। যেমন :

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا

'এবং বনি ইসরাইল সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের শুভ বাণী সত্যে পরিণত হলো, যেহেতু তারা ধৈর্য ধারণ করেছিলো।' [সুরা আ'রাফ : আয়াত ১৩৭]

সাত.

দাসত্ব ও পরাধীনতার নিগড়ে বন্দি জীবনের সবচেয়ে বড় প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া এই যে, সাহস ও সংকল্পের অনুভূতি ও স্পৃহা হীন হয়ে পড়ে এবং মরে যায়। মানুষ এই নোংরা ও অপবিত্র জীবনের নিরাপত্তা ও শান্তি কে নেয়ামত মনে করে। তারা তুচ্ছ আরাম-আয়েশকে সবচেয়ে বড় মহত্ব চিন্তা করে। চেষ্টা ও পরিশ্রমের জীবনধারার ক্ষেত্রে তাদেরকে অস্থির ও উদ্বিগ্ন দেখা যায়। বনি ইসরাইলিদের জীবনের চিত্রাবলিই এর জীবন্ত সাক্ষ্য। হযরত মুসা আ.-এর মুজেযা ও নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন, সাহস ও সংকল্পের দীক্ষাদান এবং তাদের সাফল্যের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করিয়ে দেয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে জীবনের চাঞ্চল্য, উদ্দীপনা ও দৃঢ়তার লক্ষণ দেখা যায় না। পদে পদে তাদেরকে অভিযোগ ও অস্থিরতা প্রকাশ করতে দেখা যায়।

পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করলে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সাহায্য করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেয়া সত্ত্বেও তারা মূর্তিপূজক শত্রুদের মোকাবিলা করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে যে-ঐতিহাসিক বাক্যটি উচ্চারণ করেছিলো তা এ-কথার ন্যায্য সাক্ষী—

يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ

"হে মুসা, তারা যতদিন ওখানে থাকবে ততদিন আমরা ওখানে প্রবেশ করবোই না; সুতরাং তুমি এবং তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ করো, আমরা এখানেই বসে থাকবো।" [সুরা মায়েদা : আয়াত ২৪]

আট.

পৃথিবীর বা রাজ্যের উত্তরাধিক সেই জাতিরই প্রাপ্য যারা নিঃসহায়তা ও নিঃস্বতা থেকে নির্ভীক হয়ে এবং দৃঢ়সংকল্প ও সাহসের পরিচয় দিয়ে সব ধরনের বাধা-বিপত্তির মোকাবিলা করে। ধৈর্য ও সহনশীলতার সঙ্গে আল্লাহ তাআলার সাহায্যের ভরসা করে প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের ময়দানে দৃঢ়পদ থাকে।

নয়.

মিথ্যার শক্তি যত বিশালই হোক এবং যতই প্রতাব ও পরাক্রমশালী হোক, চূড়ান্ত বিচারে তাকে ব্যর্থকাম হতেই হবে, বিফলতার মুখ

দেখতেই হবে। পরিণামে সাফল্যের মুকুট তাদের জন্যই নিশ্চিত যারা সৎকর্মপরায়ণ ও সাহসী। কারণ—

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ

'পরিণামে সাফল্য মুত্তাকিদের জন্যই অবধারিত।'

দশ.

এটা আল্লাহ তাআলার চিরন্তর রীতি—অত্যাচারী ও উৎপীড়ক জাতিগুলো যেসব সম্প্রদায়কে হীন ও নীচ মনে করে, এমন এক দিন আসে, যখন ওই উৎপীড়িত ও নির্যাতিত জাতিগুলো আল্লাহ তাআলার জমিনের উত্তরাধিকারী এবং ক্ষমতা ও শাসনের অধিকারী হয়। অত্যাচারী জাতিগুলোর ক্ষমতা মাটির সঙ্গে মিশে যায়। হযরত মুসা আ. ও ফেরআউনের কাহিনি তারই জ্বলন্ত প্রমাণ।

نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ () وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ (سورة القصص)

'আমি ইচ্ছা করলাম সে-দেশে যাদেরকে হীনবল করা হয়েছিলো তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে, তাদেরকে নেতৃত্ব দান করতে এবং উত্তরাধিকারী করতে; এবং তাদেরকে দেশে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করতে, আর ফেরআউন, হামান ও তাদের বাহিনীকে তা দেখিয়ে দিতে, যা তাদের (বনি ইসরাইলের) কাছে তারা আশঙ্কা[১৫২] করতো।' [সূরা কাসাস : আয়াত ৫-৬]

এগারো.

শক্তি ও শাসনক্ষমতা এবং ধন ও ঐশ্বর্যের মদে মত্ত জাতিগুলোর রীতি সবসময় এই ছিলো যে, তারাই সবার আগে সত্যের আহ্বান ও সত্যপ্রচারের বিরোধিতা করেছে। কিন্তু জাতিগুলোর ইতিহাস সাক্ষ্য প্রদান করে যে, সবসময় সত্যের মোকাবিলায় তাদেরই পরাজয় ঘটেছে এবং পরিণামে তাদেরকেই বিফলতার মুখ দেখতে হয়েছে, ব্যর্থকাম হতে হয়েছে। এ-বিষয়ের সাক্ষী কেবল হযরত মুসা আ.-এর ঘটনাই নয়, বরং

সকল নবী ও রাসুলের সত্যের আহ্বান ও সত্যপ্রচার এবং বিরুদ্ধ জাতিগুলোর বিরোধিতার পরিণাম ঐতিহাসিক প্রমাণ হিসেবে বাস্তবদর্শী মানুষের জন্য শিক্ষামূলক উপদেশ প্রদান করছে।

বারো. যে-ব্যক্তি বা যে-জাতি দেখে-শুনে ও জেনে সত্য সত্যরূপে উপলব্ধি করেও তার বিরোধিতা করে, আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত নিদর্শনসমূহের অস্বীকারকারী ও অমান্যকারী হয়, তার জন্য আল্লাহ তাআলার বিধান এই যে, তিনি তাদের সত্য গ্রহণের যোগ্যতা নিঃশেষ করে দেন। কেননা এটাই তাদের সার্বক্ষণিক অবাধ্যাচরণের স্বাভাবিক পরিণতি। যেমন—

سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

'পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে দম্ভ করে বেড়ায় তাদের দৃষ্টি আমার নিদর্শন থেকে ফিরিয়ে দেবো।' [সুরা আ'রাফ : আয়াত ১৪৬]

এই আয়াতের এবং একই অর্থবোধক অন্যান্য আয়াতের অভিপ্রায় এটাই যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ তাআলা কাউকে নির্বুদ্ধিতা ও পথভ্রষ্টতার জন্য বাধ্য করেন।

তেরো.

এটা অত্যন্ত মারাত্মক ভ্রষ্টতা যে, সত্যের বদৌলতে মানুষ সফলতা লাভ ও কৃতকার্য হওয়ার পর আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা, আনুগত্য, মিনতি ও বিনয়ের পরিবর্তে সত্যের বিরোধীদের মতো গাফলত ও অবাধ্যাচরণে লিপ্ত হয়ে পড়ে। আফসোস! ফেরআউনের কবল থেকে মুক্তি লাভ করে লোহিত সাগর অতিক্রম করার পর থেকে বনি ইসরাইলের কাহিনির যে-অংশ শুরু হয়েছে তা উল্লিখিত ভ্রষ্টতা ও ভ্রান্তিতে ভরপুর।

চৌদ্দ.

ধর্মীয় ব্যাপারে আরো একটি বড় ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতা হলো মানুষের সততা ও সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে ধর্মীয় বিধান না মানা এবং সেভাবে না চলা। আপন কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করে আল্লাহর বিধি-বিধানসমূহে ইচ্ছেমতো টালবাহানা করা। আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত হয়ে এমন মনে করে বসা যে, মনস্কামও পূর্ণ হয়ে গেলো এবং ধর্মীয় বিধানও পালিত হলো। খারাপকে খারাপ মনে করে তাতে লিপ্ত হওয়া ততটা মন্দ ও নিন্দনীয় নয়, যতটা মন্দ ও

নিন্দনীয় হলো খারাপকে ভালোরূপ দান করা এবং নিষিদ্ধ কার্যাবলিতে টালবাহানা করে তাকে জায়েয বানিয়ে নেয়া। এমন ঘৃণ্য কর্মকাণ্ডের কাণেই অধিকাংশ জাতির ওপর আল্লাহপাকের আযাব নাযিল হয়েছে। ইহুদিরাও শনিবারের ব্যাপারে এই পন্থা অবলম্বন করেছিলো এবং আল্লাহ তাআলার শাস্তির উপযুক্ত হয়েছিলো। শনিবারে বনি ইসরাইলিদের জন্য শিকার করা নিষিদ্ধ ছিলো এবং গোটা দিনটি ইবাদতের জন্য নির্ধারিত ছিলো। তারা কিছুকাল ধৈর্যের সঙ্গে এই আদেশ মেনে চললো; কিন্তু বেশি দিন তারা তাদের ধৈর্যের ওপর অটল থাকতে পারলো না। তারা একটি বাহানা বের করলো ও ফন্দি আঁটলো। শনিবারের আগের রাতে নদীর ধারে গর্ত খনন করে নদীর সঙ্গে তার নালা যুক্ত করে দিতো। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ এসে তাদের গর্তে পড়তো। শনিবারের দিবস অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বনি ইসরাইলিরা ওই মাছগুলো ধরে ফেলতো। আল্লাহ তাআলার সৎকর্মপরায়ণ বান্দারা তাদের এই ঘৃণ্য কৌশলের প্রতিবাদ করলে তারা গর্বের সঙ্গে বলতো, আমরা শনিবারের মর্যাদা কখন ক্ষুণ্ন করলাম যে তোমরা এসব প্রশ্ন উত্থাপন করছো? কিন্তু আল্লাহ তাআলার শাস্তি এসে যখন তাদেরকে পাকড়াও করলো, তারা বুঝতে পারলো ধর্মীয় ব্যাপারে টালবাহানা করা এবং নিকৃষ্ট কৌশল অবলম্বন করা কত বড় মারাত্মক অপরাধ।

পনেরো.

সত্যকে কেউ গ্রহণ করুক বা না করুক—সত্যের প্রতি আহ্বানকারীর কর্তব্য হলো সত্যের উপদেশ প্রদান ও সত্যপ্রচারে বিরত না হওয়া। যেমন : শনিবারের মর্যাদা নষ্ট করায় তাদের মধ্য থেকে কয়েকজন সৎ ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি তাদেরকে বুঝালো। তাদের কয়েজন লোক এটাও বলেছিলো যে, এদেরকে বুঝানো নিষ্ফল। কিন্তু সত্যের প্রতি একনিষ্ঠ আহ্বানকারীরা জবাব দিলেন—

مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

কিয়ামতের দিন আমরা আল্লাহর কাছে এই ওজর তো পেশ করতে পারবো যে, আমরা অবিরাম সত্যের আহ্বান ও সত্যপ্রচারে লিপ্ত ছিলাম। অদৃশ্য জগতে কী রয়েছে সে-সম্পর্কে তো আমাদের কোনো জ্ঞান নেই। আশ্চর্যের কী আছে যে তারা মুত্তাকি ও পরহেযগার হয়ে যাবে।

ষোলো.

কোনো জাতির ওপর অত্যাচারী ও জালেম শাসক ক্ষমতাশীল হয়ে বসলে এটা প্রমাণিত হয় না যে, ওই অত্যাচারী শাসক আল্লাহ তাআলার কাছে প্রিয় ও সম্মানিত। অত্যচারী এবং দমন- ও নিপীড়নকারী শাসক মূলত আল্লাহ তাআলা আযাব ও শাস্তিবিশেষ; শাসিত জাতির কার্যকলাপের ফল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। অত্যাচারী শক্তির প্রভাব শাসিত জাতির মস্তিষ্ককে এমনভাবে আচ্ছন্ন ও মোহগ্রস্ত করে ফেলে যে, তারা উৎপীড়ক শাসকের প্রতাপ ও প্রতিপত্তিকে তাদের ওপর আল্লাহ তাআলার রহমত এবং নিজেদের কৃতকর্মের পুরস্কার বলে বিশ্বাস করে। যেমন : ফেরআউন ও বনি ইসরাইলের ইতিহাসের এই অংশ—যেখানে হযরত মুসা আ. বনি ইসরালিদেরকে ফেরআউনের শোষণের নিগড় থেকে মুক্ত করার জন্য তাদেরকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করলেন আর তারা পদে পদে মুসা আ.-এর কাছে বার বার তাদের অভিযোগসমূহ উত্থাপন করলো এবং দাসত্বজর্জরিত সচ্ছল জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করলো—উপরিউক্ত বক্তব্যের জ্বলন্ত প্রমাণ।

কুরআন মাজিদ এ-বিয়ষটিকে নিম্নলিখিত অলৌকিক ভাষায় প্রকাশ করেছে—

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (سورة الأعراف)

'স্মরণ করো, তোমার প্রতিপালক ঘোষণা করেন যে, তিনি তো কিয়ামত পর্যন্ত তাদের ওপর এমন লোকদেরকে প্রেরণ করবেন যারা তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিতে থাকবে, আর তোমার প্রতিপালক তো শাস্তিদানে তৎপর এবং তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।' [সুরা আ'রাফ : আয়াত ১৬৭]

সতেরো.

ফেরআউন ও তার কওমের অবাধ্যাচরণ যখন বাড়াবাড়ি পর্যায়ে পৌঁছে গেলো এবং সীমা লঙ্ঘন করলো, তখন হযরত মুসা আ. আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ, এই পাপিষ্ঠদেরকে তাদের আবাধ্যাচরণ ও নিকৃষ্ট কার্যকলাপের কারণে শাস্তি প্রদান করুন। কোনোভাবেই তারা সৎপথে আসছে না। কিন্তু যখনই হযরত মুসা আ.-এর দোয়া কবুল হওয়ার সময় আসতো এবং আল্লাহ তাআলার শাস্তির

লক্ষণসমূহ প্রকাশ পেতে শুরু করতো, তৎক্ষণাৎ ফেরআউন ও তার সম্প্রদায়ের লোকেরা হযরত মুসা আ.-এর কাছে আবদার করতো, যদি এবার আমাদের ওপর থেকে এই শাস্তি দূর হয়ে যায়, তবে আমরা অবশ্যই তোমার কথা মেনে নিবো। এরপর যখন ওই শাস্তি দূর হয়ে যেতো, তারা যথারীতি আগের মতোই অবাধ্যাচরণ করতে শুরু করতো। এভাবে দীর্ঘকাল পর্যন্ত তারা অবকাশ লাভ করলো। কোনোক্রমেই তারা তাদের নাফরমানি, বক্রতা ও অবাধ্যাচরণ থেকে বিরত হলো না। অবশেষে অকস্মাৎ আল্লাহ তাআলার শাস্তি এসে তাদেরকে পাকড়াও করলো এবং চিরকালের জন্য বিলীন করে দিলো। এভাবে শনিবারের মর্যাদা ক্ষুণ্নকারীদেরও বার বার অবকাশ দেয়া হয়েছিলো; কিন্তু যখন তারা কোনোক্রমেই বিরত হলো না, আল্লাহ তাআলার শাস্তি এসে তাদেরকে ধ্বংস করে দিলো।

এই ঘটনা এবং প্রচীনকালের উম্মতদের এ-জাতীয় ঘটনাবলি এ-কথার প্রমাণ যে, কোনো জাতি বা সম্প্রদায় অসৎ কাজ ও আবাধ্যাচরণে লিপ্ত হলে আল্লাহ তাআলার নীতি এই যে, সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে পাকড়াও করা হয় না, শাস্তি দেয়া হয় না। তারা ক্রমশ অবকাশ লাভ করে। যাতে তারা নিজেদের অপরাধ বুঝতে পেরে তা থেকে বিরত হয় এবং নিজেদের অবস্থা সংশোধন করে নেয়। কিন্তু তারা যখন অপকর্ম থেকে বিরত হয় না, নিজেদের অবস্থা সংশোধনে তৎপর হয় না, আল্লাহ তাআলার পাকড়াও করার কঠিন হাত তাদেরকে পাকড়াও করে এবং তারা অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

আঠারো.

কোনো মানুষের পক্ষেই—তিনি নবীই হোন আর রাসুলই হোন—এমন দাবি করা সঙ্গত নয় যে, গোটা জগতে তাঁর মতো জ্ঞানী বা বড় আলেম আর কেউই নেই। বরং, সবকিছু আল্লাহ তাআলার জ্ঞানের ওপরই সোপর্দ করে দেয়া উচিত। কেননা, আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন—

وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ

'প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তির ওপরই একজন অধিক জ্ঞানী রয়েছেন।'

হযরত মুসা আ. উচ্চমর্যাদাশীল নবী ও রাসুল এবং নবুওতের যাবতীয় পূর্ণতাসূচক গুণের অধিকারী হওয়ার পর এই উক্তি করলেন যে, আমি বর্তমানে সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম ও জ্ঞানী। তখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে সতর্ক করে দিলেন এবং হযরত খিযির আ.-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দিলেন। আল্লাহ তাঁকে এই শিক্ষা প্রদান করলেন যে, সমস্ত পূর্ণতাসূচক গুণ থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলার জ্ঞানের রহস্যসমূহ অসীম ও ব্যাপক। রহস্যময় কয়েকটি বিষয়ের জ্ঞান তিনি একজন বুযুর্গ ব্যক্তির কাছে প্রকাশ করেছেন। আর হযরত মুসা আ. সেই রহস্য বুঝতে অক্ষম হলেন।

উনিশ.

ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের জন্য দাসত্ব মারাত্মক লানত ও অভিশাপ; আল্লাহ তাআলার একটি বড় শাস্তি। আর দাসত্বে তৃপ্তি ও মনোতুষ্টি লাভ করা আল্লাহ তাআলার আযাব ও গযবরে প্রতি সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত হওয়ার শামিল। এ-কারণেই হযরত মুসা আ. ফেরআউনকে সত্যের প্রতি আহ্বান জানিয়ে প্রথমেই দাবি করলেন—বনি ইসরাইলকে তোমার দাসত্ব ও গোলামি থেকে মুক্ত করে দাও। যাতে তারা আমার সঙ্গে থেকে স্বাধীনভাবে আল্লাহ তাআলার একত্বের অনুসারী ও তাঁর ইবাদতকারী হয়ে থাকতে পারে এবং তাদের ধর্মীয় জীবনের কোনো শাখাতেই যেনো অত্যাচারী ও কুফরি শক্তি প্রতিবন্ধক না হয়ে দাঁড়ায়।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বিষয়টিকে ব্যক্ত করেছেন এভাবে—

وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ () حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (سورة الأعراف)

‘এবং মুসা বললো, “হে ফেরআউন, আমি তো জগৎসমূহের প্রতিপালকের কাছ থেকে প্রেরিত। এটা স্থির নিশ্চিত যে, আমি আল্লাহ সম্পর্কে সত্য ব্যতীত বলবো না। (আমার জন্য এটা কখনোই শোভনীয় নয় যে, আমি আল্লাহ তাআলার সম্পর্কে সত্য ব্যতীত অন্যকিছু বলি।) আমি তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ এনেছি, সুতরাং বনি ইসরাইলকে তুমি আমার সঙ্গে যেতে দাও।” [সুরা আ'রাফ : আয়াত ১০৪-১০৫]

فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ () أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ

"অতএব, তোমরা উভয়ে ফেরআউনের কাছে যাও এবং বলো, আমরা তো জগৎসমূহের প্রতিপালকের রাসুল। বনি ইসরাইলকে তুমি আমাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দাও।" [সুরা শুআরা : আয়াত ১৬-১৭]

সুরা শুআরার এই আয়াত এ-বিষয়টির গুরুত্ব এত উঁচুতে তুলে ধরেছে যে, হযরত মুসা আ.-এর মতো উচ্চ মর্যাদাশীল ও উলুল আযম (দৃঢ়প্রতিজ্ঞ) নবীর নবুওতের উদ্দেশ্যই যেনো ছিলো আম্বিয়ায়ে কেরামের বিখ্যাত বংশ বনি ইসরাইলকে ফেরআউনের অত্যাচারী ও কুফরি শক্তির নিগড় থেকে মুক্ত করা এবং তাদেরকে স্বাধীনতা উপহার দেয়া।

তা ছাড়া সুরা আ'রাফের আয়াতগুলো যদি গভীর দৃষ্টি ও মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করা হয়, তবে তাতেও এ-বিষয়টিই স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। হযরত মুসা আ. ফেরআউনের দরবারে প্রথমে তাঁর নবুওতের ঘোষণা দেন। তারপর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হেয়ায়েতের দাওয়াত দেন। মুজেযা ও নিদর্শনসমূহের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেন। এরপর তিনি তাঁর নবুওত ও রিসালাতের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন : 'বনি ইসরাইলকে তোমার দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আমার সঙ্গে যেতে দাও।'

আবার এ-বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, নবুওত ও রিসালাতের দাবি পেশ করার পর হযরত মুসা আ. এক দীর্ঘকাল মিসরে অবস্থান করেছেন। তারপরও ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের ওপর হেদায়েতের বিধান (তাওরাত) নাযিল হয় নি যতক্ষণ না তারা ফেরআউনের দাসত্ব ও গোলামি থেকে স্বাধীনতা লাভ করেছে এবং অত্যাচারী শক্তির কবল থেকে মুক্তি লাভ করে পবিত্র ভূমিতে ফিরে এসেছে।

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ

'সুতরাং, হে বুদ্ধিমান ও জ্ঞানীগণ, তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।'